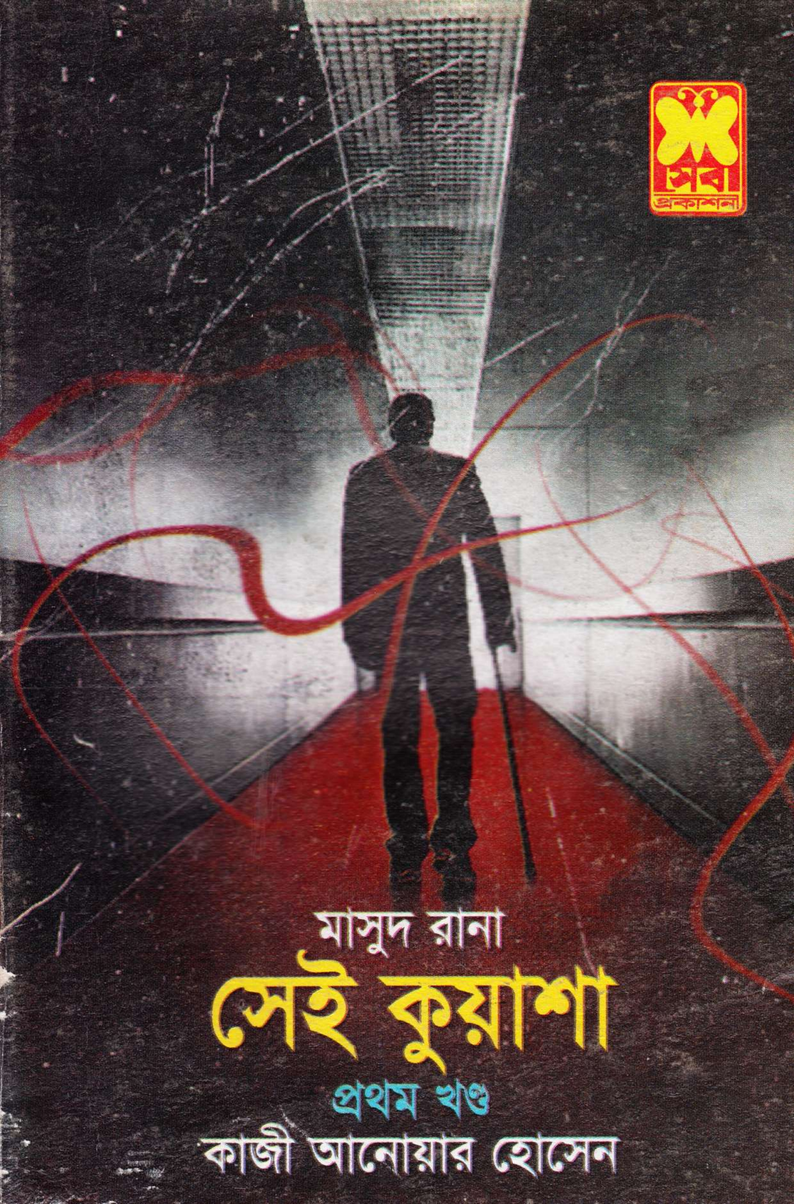
সেবা
প্রকাশনী
মাসুদ রানা
সেই কুয়াশা
প্রথম খণ্ড
কাজী আনোয়ার হোসেন

এই বইটি বাংলাপিডিএফবই এর সৌজন্যে নির্মিত। বইটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই এর একটি কপি আপনার নিকটতম বুকস্টল থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হল। লেখক কিংবা প্রকাশকের কোন প্রকার আর্থিক ক্ষতি আমাদের কাম্য নয়।

বাংলাপিডিএফবই ওয়াটারমার্ক বিহীন বই প্রকাশ করে থাকে। এই পদ্ধতি অবলম্বনের কারনে আমাদের ওয়েবসাইটটির প্রসারে ও প্রচারে বাধা আসছে। কাজেই সবার কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে যে আপনি এই ওয়েবসাইটটি থেকে বই ডাউনলোড করে উপকৃত হলে, অবশ্যই আপনার পরিচিতজনদের কাছে আমাদের সাইটটি শেয়ার করবেন।

বাংলাপিডিএফবই কর্তৃপক্ষ

Coming Soon

মাসুদ রানা ৪১২

সেই কুয়াশা

(প্রথম খণ্ড)

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7412-2

এক

রাস্তার মোড়ে সমবেত হয়ে বড়দিনের ভক্তিগীতি গাইছে একদল গায়ক। হাত-পা নাড়ছে সঙ্গীতের তালে। রাস্তার গাড়িঘোড়ার আওয়াজ, পুলিশের সাইরেন আর দোকানপাট থেকে ভেসে আসা নানা ধরনের কোলাহল চাপা পড়ে যাচ্ছে তাদের সম্মিলিত কণ্ঠের তলায়। ভারী তুষারপাত হচ্ছে, তা অগ্রাহ্য করে শেষ মুহূর্তের কেনাকাটায় বেরিয়েছে ব্যস্ত কর্মজীবীরা। ফুটপাতে ঠেলাঠেলি, রাস্তায় যানজট, দোকানে-দোকানে আলোকসজ্জা—বড়দিনের চিরাচরিত দৃশ্য।

গাঢ় রঙের একটা ক্যাডিলাক রাস্তার মোড় ঘুরল, ধীরে ধীরে পেরুতে শুরু করল সমবেত সঙ্গীতশিল্পীদেরকে। শতচ্ছিন্ন পোশাক পরা একজন গায়ক এগিয়ে গেল গাড়ির দিকে। ছেঁড়া গ্লাভে ঢাকা একটা হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সামনে, সাহায্যের আশায় গলা চড়িয়ে গাইছে গান।

রাগী ভঙ্গিতে হর্ন বাজাল ড্রাইভার, হাতের ইশারায় সরে যেতে বলল ভিখিরি-গায়ককে। কিন্তু পিছনের প্যাসেঞ্জার সিটে বসা মাঝবয়েসী মানুষটা কেন যেন এতটা নির্দয় হতে পারল না। বোতাম টিপে রিয়ার-উইণ্ডোর কাঁচ নামাল সে, খুচরো কিছু টাকা গুঁজে দিল বাড়িয়ে ধরা হাতটাতে।

'ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন, স্যর!' চেঁচিয়ে বলে উঠল গায়ক। 'ইস্ট ফিফটিনথ্ স্ট্রিটের বয়েজ ক্লাবের পক্ষ থেকে

কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আপনাকে। ধন্যবাদ! মেরি ক্রিসমাস, স্যর!'

আশীর্বাদের পাশাপাশি খোলা মুখ থেকে ভকভক করে ভেসে এল সস্তা মদের গন্ধ। বিরক্তিতে ঠোঁট বাঁকাল মাঝবয়েসী আরোহী।

'জাহান্নামে যাক ক্রিসমাস!' বিড়বিড় করল সে। তাড়াতাড়ি আবার উঠিয়ে দিল জানালার কাঁচ।

যানজটের মাঝখানে একটুখানি ফাঁকের সৃষ্টি হয়েছে দেখে তাড়াতাড়ি গাড়ি আগে বাড়াল ড্রাইভার। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই আবার ব্রেক কষতে বাধ্য হলো। বিশাল এক ভ্যান আচমকা বন্ধ করে দিয়েছে রাস্তা। সখেদে স্টিয়ারিং হুইলের উপর একটা ঘুসি বসাল ড্রাইভার।

'টেক ইট ইজি, মেজর,' শান্ত গলায় বলল মাঝবয়েসী আরোহী। 'উত্তেজিত হয়ে লাভ নেই কোনও। এমন তো নয় যে রেগে গেলেই দ্রুত পৌঁছুতে পারছ গন্তব্যে।'

'জী, জেনারেল,' সসম্ভ্রমে বলল ড্রাইভার, যদিও এ-মুহূর্তে শ্রদ্ধা অনুভব করছে না সে মানুষটির প্রতি।

না, জেনারেলকে এমনিতে অশ্রদ্ধা করে না মেজর কলিন ডেনমোর, কিন্তু আজ রাতের ব্যাপার ভিন্ন। খামখেয়ালির একটা সীমা থাকা উচিত। হতে পারে সে জেনারেলের এইড, কিন্তু ক্রিসমাসের সন্ধ্যায় কাউকে ডিউটির জন্য ডেকে পাঠানো মোটেই মেনে নেয়া যায় না। তাও যদি সেটা কোনও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হতো! ভাড়া করা একটা সিভিল গাড়ি চালাবার জন্য আর কাউকে বুঝি খুঁজে পায়নি লোকটা? পাবে কী করে, যাচ্ছে তো গোপনে ফুর্তি করতে! বিশ্বস্ত এইড ছাড়া আর কাউকে কি সেটা জানতে দেয়া যায়?

না, যায় না। কারণ, জেনারেল যাচ্ছে পতিতালয়ে।

ক্রিসমাসের সন্ধ্যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ারম্যান অভ জয়েন্ট চিফ অভ স্টাফ যাচ্ছে দেহপসারিণীদের সঙ্গে ফুর্তি করতে! ব্যাপারটা জানাজানি হলে বিরাট কেলেঙ্কারি বেধে যাবে। মেজরকে তাই যেতে হচ্ছে গোপনীয়তা নিশ্চিত করবার জন্য... গোলমাল দেখা দিলে সেটা সামাল দেবার জন্য। রাতভর আমোদ-ফুর্তি করার পর পাঁড় মাতাল হয়ে যাবে জেনারেল, তখন ওকেই দায়িত্ব নিতে হবে তাকে বাড়ি পৌঁছানোর; দেখতে হবে টাকা-পয়সার দিকটা... পতিতালয়ের কেউ যেন মুখ না খোলে।

গত তিন বছরে বহুবার এভাবে জেনারেলের সঙ্গী হতে হয়েছে মেজর ডেনমোরকে। বিশ্বাস করা কঠিন, জাতির ভয়াবহ মুহূর্তগুলোতে এই মানুষটিই কীভাবে বদলে যায়... হয়ে ওঠে রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে পদস্থ সবার নির্ভরতার প্রতীক। অথচ আজ রাতে তার ছিটেফোঁটাও অবশিষ্ট নেই লোকটার ভিতর। সত্যি বলতে কী, মানুষটা গ্রেগরি ওয়ার্নার না হয়ে অন্য কেউ হলে মেজর ডেনমোর রীতিমত প্রতিবাদই করে বসত। হাজার হোক, ছোট পদের অফিসারদেরও পরিবারের সঙ্গে বড়দিন উদ্‌যাপনের অধিকার আছে।

কিন্তু জেনারেলের কোনও আদেশ... তা যত উদ্ভটই হোক না কেন... অমান্য করতে পারবে না মেজর ডেনমোর। পারবে না অকৃতজ্ঞ হতে। কারণ বহু বছর আগে, উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় গুলিবিদ্ধ হবার পর এই জেনারেলই তাকে কাঁধে করে বয়ে আমেরিকান লাইনে ফিরিয়ে এনেছিল। তখন ডেনমোর ছিল তরুণ এক লেফটেন্যান্ট, আর ওয়ার্নার ছিল কর্নেল। এই লোকটার কারণেই আজও পৃথিবীতে শ্বাস ফেলছে মেজর ডেনমোর। কিছুতেই সে-উপকারের প্রতিদান দেয়া সম্ভব নয়। জেনারেল যা-ই করুক না কেন, সব মুখ বুজে মেনে নিতে হবে তাকে।

পার্ক অ্যাভিনিউ-এ পৌঁছে উত্তরমুখী পথ ধরল ক্যাডিলাক। এদিককার রাস্তা মোটামুটি ফাঁকা। ক্লাচ থেকে পা সরিয়ে অ্যাকসেলারেটরে চাপ বাড়াল মেজর। হু হু করে গতি বেড়ে গেল গাড়ির। অল্প সময়ে পেরিয়ে এল পনেরো ব্লক দূরত্ব। পার্ক আর লেক্সিংটনের মাঝামাঝি, সেভেণ্টি ফার্স্ট স্ট্রিটের একটা ব্রাউনস্টোনের বিল্ডিঙের সামনে পৌঁছে গেল একটু পর।

রাস্তার পাশে ফাঁকা একটা জায়গায় গাড়ি পার্ক করল মেজর। তার সঙ্গে কোনও কথা বলল না জেনারেল। দরজা খুলে শান্ত ভঙ্গিতে নেমে গেল গাড়ি থেকে। বিল্ডিঙের সামনের চওড়া সিঁড়ি ধরে উঠে গেল সদর দরজার দিকে। পাল্লার উপরে পুরনো আমলের একটা ভারী কড়া ঝুলছে। ওটা নাড়তেই একহারা, দীর্ঘদেহী এক মহিলা দরজা খুলল। টকটকে লাল রঙা সিল্কের একটা গাউন পরে আছে, গলায় দামি ডায়মণ্ড নেকলেস। ড্রাইভিং সিটে বসে জেনারেলকে মহিলাটির সঙ্গে ভিতরে ঢুকে যেতে দেখল মেজর। মৃদু দীর্ঘশ্বাস ফেলল। রাতের ঠাণ্ডা বাতাস খাওয়া ছাড়া আর কিছু করার নেই এখন। কপাল ভাল হলে হয়তো ঘণ্টাতিনেক পর আবার খুলে যাবে দরজাটা, নেশাতুর জেনারেলকে নিয়ে আসার সঙ্কেত দেয়া হবে তাকে। কপাল খারাপ হলে রাতভরও অপেক্ষা করতে হতে পারে।

পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করে স্ত্রী-র নাম্বারে ডায়াল করল ডেনমোর। আরেক দফা ক্ষমা চাইতে হবে ক্যারোলিনের কাছে... ক্রিসমাসের সন্ধ্যায় ওকে এভাবে একা ফেলে আসার জন্য। শালার জেনারেল, বিড়বিড় করল মেজর, তার জন্য কোন্‌দিন না জানি ওর নিজের সংসারই তছনছ হয়ে যায়!

পিছনে দরজা বন্ধ হয়ে যেতেই হলওয়ের আলো-ছায়ার মাঝে

জেনারেলকে জড়িয়ে ধরল দীর্ঘাঙ্গী মহিলা। গালে চুমু খেয়ে মদির গলায় বলল, 'হাই গ্রেগ! ডার্লিং... তোমাকে খুব মিস করেছি আমরা। এতদিন আসোনি কেন?'

'এতদিন কোথায়?' বলল জেনারেল। 'মাত্র তো দু'সপ্তাহ।'

ইউনিফর্ম-পরা একজন কমবয়েসী মেইড এগিয়ে এল, ওভারকোট খুলতে সাহায্য করল তাকে। ঘাড় ঘুরিয়ে মেয়েটাকে দেখল জেনারেল—আগে দেখেনি, নতুন এসেছে নিশ্চয়ই। দেখতে-শুনতে চমৎকার। জেনারেলের চোখে লোভী দৃষ্টি ফুটল।

ব্যাপারটা লক্ষ করে হেসে উঠল দীর্ঘাঙ্গী মহিলা। বলল, 'ও এখনও তোমার জন্য তৈরি নয়, ডার্লিং। দু-এক মাস সময় দরকার সবকিছু শিখে নেবার জন্য।' জেনারেলের হাতের ভাঁজে হাত ঢুকিয়ে দিল। 'এসো, তোমার জন্য আলাদা ব্যবস্থা রেখেছি আমি।'

দোতলার বিশাল একটা কামরায় অতিথিকে নিয়ে গেল মহিলা। ভিতরটা রঙিন, মোলায়েম আলোয় আলোকিত। জানালায় ভারী পর্দা, মেঝেতে পুরু গালিচা। দামি আসবাবপত্র শোভা পাচ্ছে ঘর জুড়ে। ঠিক মাঝখানে রয়েছে বড়-সড় একটা বিছানা, তার পাশে নতমুখে দাঁড়িয়ে সুন্দরী দুটি মেয়ে।

ভুরু কোঁচকাল জেনারেল। ডানদিকের আমেরিকান মেয়েটি পরিচিত, আগেও বেশ ক'বার তার শয্যাসঙ্গিনী হয়েছে। কিন্তু অন্য মেয়েটাকে এই প্রথম দেখছে। বিদেশি নিঃসন্দেহে, গায়ের চামড়া ল্যাটিনোদের মত বাদামি। মাথায় কুচকুচে কালো কেশ... খোঁপা করে রাখা হয়েছে। পরনে সাদা লিনেনের ফিনফিনে আলখাল্লা... প্রায় স্বচ্ছ-ই বলা চলে; তলায় সুগঠিত শরীরের প্রতিটি আঁক-বাঁক প্রকট হয়ে উঠেছে।

দীর্ঘাঙ্গী মহিলার দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল জেনারেল।

'নতুন মেয়ে... গ্রিক,' ফিসফিসিয়ে বলল মহিলা। 'সপ্তাহখানেক হলো যোগ দিয়েছে আমার এখানে, কিন্তু কাজের বাহার দেখে চমকে গেছি। এনজয় করবে তুমি, প্রমিজ!'

নিঃশব্দ হাসি ফুটল জেনারেলের ঠোঁটে। মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল নতুন মেয়েটির ব্যাপারে।

দীর্ঘাঙ্গী মহিলাটিও হাসল। পায়ে পায়ে পিছিয়ে গেল সে, বেরিয়ে গেল কামরা থেকে। দরজা টেনে দিল।

আধঘণ্টার মধ্যেই অন্য এক জগতে চলে গেল জেনারেল। পুরো কামরা ভরে গেল আফিমের মেঘ আর দামি মদের গন্ধে। সম্পূর্ণ উদোম হয়ে বিছানায় শুয়ে গোঙাতে থাকল সে। মেয়েদুটিও বিবস্ত্র হয়ে গেছে, প্রজাপতির মত তাদের হাতগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে জেনারেলের সারা শরীরে, ছড়িয়ে দিচ্ছে সুখের আবেশ। ঘোর লাগা অবস্থাতেও মনে মনে গ্রিক মেয়েটির প্রশংসা করল জেনারেল। সত্যি, কাজ জানে বটে! ক্ষণে ক্ষণে চরম পুলক এনে দিচ্ছে, কানের কাছে ফিসফিসিয়ে অবিরাম কী যেন বলছে গ্রিক ভাষায়। অর্থ বোঝা না গেলেও শরীরে শিহরণ তুলছে তার মদির কণ্ঠ।

হঠাৎ সোজা হয়ে বসল গ্রিক মেয়েটি, বিছানা থেকে নামতে নামতে ইশারায় বাথরুম দেখাল সঙ্গিনীকে। মাথা ঝাঁকিয়ে তাকে যেতে ইশারা করল আমেরিকান মেয়েটি। দ্বিতীয়জনের অভাব পূরণ করার জন্য উঠে পড়ল জেনারেলের শরীরের উপর, ঠোঁট ডুবিয়ে দিল তার ঠোঁটে, চুমু খেতে শুরু করল ক্ষুধার্ত ভঙ্গিতে।

দু'জনে এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়ল, খেয়াল করল না—মাত্র এক মিনিট পরেই আবার বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসেছে গ্রিক মেয়েটি। এখন আর নগ্ন নয় সে, গাঢ় রঙের একটা টুইডের কোট পরে নিয়েছে, উঁচু হুড দিয়ে ঢেকে ফেলেছে মাথা। ছায়ার মাঝে

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল মেয়েটা, তারপর সন্তর্পণে এগিয়ে গেল জানালার দিকে। কাছাকাছি পৌঁছে একহাতে একটা পর্দার কিনার মুঠো করে ধরল, বড় করে শ্বাস নিয়ে এক ঝটকায় সরিয়ে দিল পর্দাটা।

সঙ্গে সঙ্গে জানালায় বিকট শব্দ হলো। কাঁচ আর পাল্লা ভেঙে ভিতরে ঢুকে পড়ল লম্বা একজন মানুষ, র‍্যাপলিং করে ছাদের উপর থেকে নেমে এসেছে সে। পরনে কুচকুচে কালো পোশাক, মুখ ঢেকে রেখেছে স্কি-মাস্ক দিয়ে। হাতে ভয়ঙ্করদর্শন একটা পিস্তল। সাইলেন্সার লাগানো।

চমকে উঠে জেনারেলের উপর থেকে বিছানায় চিৎ হয়ে পড়ল আমেরিকান মেয়েটি, লোকটাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল আতঙ্কে। কিন্তু চিৎকারটা হলো ক্ষণস্থায়ী। আততায়ীর পিস্তলের এক গুলিতে নিথর হয়ে গেল সে।

হতভম্বের মত খুনির দিকে তাকাল জেনারেল। মাদকের নেশায় ঠিকমত কাজ করছে না মাথা। ফিসফিসিয়ে জানতে চাইল, 'হু দ্য হেল আর ইউ?'

জবাব না দিয়ে [illegible] ট্রিগার চাপল আততায়ী... পর পর তিনবার মৃদু শব্দের সঙ্গে জেনারেলের বুক, পেট আর মাথা ফুটো হয়ে গেল। রক্তে ভেসে যেতে শুরু করল বিছানা।

নির্বিকার ভঙ্গিতে গ্রিক মেয়েটার দিকে ফিরল খুনি। 'মক্ষীরানী কোথায়?'

এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে ধরল মেয়েটা। জানাল, 'নীচতলায়, ডানদিকের অফিস কামরায় পাবে ওকে। লাল ড্রেস পরেছে, গলায় ডায়মণ্ডের নেকলেস।'

মাথা ঝাঁকিয়ে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল খুনি। পিছু পিছু গ্রিক মেয়েটা।

অপ্রত্যাশিত শব্দে সচকিত হয়ে উঠল মেজর ডেনমোর। চিন্তার সুতো ছিঁড়ে গেছে। ব্রাউনস্টোনের বাড়িটার দিকে তাকিয়ে কান পাতল সে। ভিতর থেকে চেঁচামেচির শব্দ ভেসে আসছে... না, চেঁচামেচি না। চিৎকার... আতঙ্কিত চিৎকার! বহুকণ্ঠের!!

কিংকর্তব্য ঠিক করার আগেই ঝট্ করে খুলে গেল সদর দরজা। ভিতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল দুটো ছায়ামূর্তি। একজন নারী, অন্যজন পুরুষ। পুরুষটির হাতে একটা পিস্তল, ঝড়ের বেগে সিঁড়ি টপকে নীচে নামতে নামতে কোমরের বেল্টে গুঁজে ফেলল অস্ত্রটা। পেভমেণ্টে নেমেই সঙ্গিনীকে নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করল।

খোলা দরজা দিয়ে এখন ভালমত ভেসে আসছে চিৎকার-চেঁচামেচির আওয়াজ। বুকের ভিতর সতর্কঘণ্টা বেজে উঠল মেজরের। হাত বাড়িয়ে গ্লাভ কম্পার্টমেণ্ট খুলে ফেলল সে। বের করে আনল নিজের সার্ভিস রিভলবার। ওটা হাতে নিয়ে গাড়ি থেকে নামল। ছুটল বাড়ির দিকে।

একেক লাফে দু'তিনটে করে ধাপ পেরুল মেজর, সিঁড়ি ভেঙে উঠে এল উপরে, সদর দরজা পেরিয়ে ঢুকে পড়ল বাড়ির ভিতর। স্বল্পবসনা একদল মেয়েকে দেখতে পেল সামনে। হলওয়েতে ছুটোছুটি করছে তারা। শেষপ্রান্তে উপুড় হয়ে পড়ে আছে দীর্ঘাঙ্গী মহিলাটি। পরনের লাল পোশাক আর রক্ত মিলেমিশে একাকার। মাথার পিছনে একটা বুলেটের গর্ত। সম্ভবত পালাবার চেষ্টা করেছিল, পিছন থেকে তাকে গুলি করেছে খুনি।

পাশ দিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছিল একটা মেয়ে, খপ্ করে তার হাত চেপে ধরল মেজর। কর্কশ গলায় জানতে চাইল, 'কোথায় উনি?'

'দ্... দোতলায়!' কাঁপতে কাঁপতে জানাল মেয়েটি।

ঝট্ করে ঘুরল মেজর। বাড়ির কারুকাজ করা সিঁড়ি ধরে ছুটল দোতলায়। ল্যাণ্ডিঙে পৌঁছে গেল কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে, গতি কমাল না। বাঁয়ে মোড় নিয়ে একটা করিডোরে ঢুকে পড়ল। কামরাটা চেনা আছে তার। প্রতিবার ওই একই কামরায় রাত কাটায় জেনারেল।

দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকেই থমকে গেল মেজর ডেনমোর। এই প্রথম মৃতদেহ দেখছে না সে। কিন্তু জেনারেলকে এ-অবস্থায় দেখবে আশা করেনি। বিবস্ত্র, রক্তে রঞ্জিত... পাশে নগ্ন এক পতিতার লাশ-সহ। চরম অসম্মানের মৃত্যু বোধহয় একেই বলে। বমি পেল তার।

মূর্তির মত কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল, তা বলতে পারবে না। কিন্তু সংবিৎ ফিরতেই নিজেকে সামলে নিল ডেনমোর। চোয়াল শক্ত করে বেরিয়ে এল কামরা থেকে। দরজা টেনে দিয়ে বাইরে থেকে ছিটকিনি আটকাল। করিডোরের ওপাশ থেকে কয়েকটা মেয়ে উঁকি দিচ্ছে। তাদের দিকে হুমকির ভঙ্গিতে রিভলবার তাক করল।

'চলে যাও এখান থেকে!' চেঁচিয়ে উঠল মেজর। 'খবরদার, এদিকে কাউকে দেখতে পেলেই গুলি করব আমি! নীচে গিয়ে সবাইকে জানিয়ে দাও কথাটা।'

পড়িমরি করে ছুটে পালাল মেয়েগুলো।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে পকেট থেকে মোবাইল ফোন বের করল ডেনমোর। মেমরিতে রাখা একটা নাম্বারে ডায়াল করল। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'হ্যালো...'

গম্ভীর মুখে ওভাল অফিসে এসে ঢুকলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

সেক্রেটারি অভ স্টেট আর সিআইএ ডিরেক্টর অপেক্ষা করছিলেন ভিতরে, তাঁকে দেখতে পেয়ে উঠে দাঁড়ালেন। চুপচাপ নিজের চেয়ারে বসলেন প্রেসিডেন্ট, কিছু বললেন না। অনুমতির অপেক্ষায় মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে থাকলেন দু'জনে, শেষ পর্যন্ত ইতস্তত করে বসে পড়লেন মুখোমুখি।

'মি. প্রেসিডেন্ট...' গলা খাঁকারি দিয়ে বলতে শুরু করলেন সেক্রেটারি অভ স্টেট, কিন্তু থেমে গেলেন প্রেসিডেন্টের বাধা পেয়ে।

'কী ঘটেছে, তার রিপোর্ট দেবার প্রয়োজন নেই,' থমথমে গলায় বললেন তিনি। 'অলরেডি সব জানতে পেরেছি আমি। আপনারা ব্যাপারটা কীভাবে ট্যাকেল করছেন, তা বলুন।'

'নিউ ইয়র্ক পুলিশ কো-অপারেট করছে,' বললেন সিআইএ ডিরেক্টর। 'আমাদের কপাল ভাল, জেনারেলের এইড দরজা আটকে পাহারা দিচ্ছিল: আমাদের লোক পৌঁছুবার আগে কাউকে ভিতরে ঢুকতে দেয়নি। পুলিশ আর প্রেসের লোক ঢোকাবার আগে ক্রাইম সিন ক্লিনআপ করে নিতে পেরেছি আমরা।'

'এ তো ড্যামেজ কন্ট্রোল!' অধৈর্য গলায় বললেন প্রেসিডেন্ট। 'ও-ব্যাপারে আমার কোনও আগ্রহ নেই। আমি জানতে চাইছি আপনাদের আইডিয়ার কথা। কী ঘটেছে আসলে? নিউ ইয়র্কের আরেকটা সাধারণ হোমিসাইড এটা, নাকি অন্য কিছু?'

'অন্য কিছু,' বললেন সিআইএ ডিরেক্টর। 'নিঃসন্দেহে। এফবিআই ডিরেক্টরের সঙ্গে আলাপ হয়েছে আমার। সবকিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেছে ওরা। পুরোটাই নিখুঁতভাবে প্ল্যান করা, প্রফেশনাল হিট। চমৎকারভাবে সারা হয়েছে কাজটা, একটা সূত্রও রেখে যাওয়া হয়নি পিছনে। এমনকী পতিতালয়ের মালিক মহিলাকেও খুন করা হয়েছে, যাতে তার কাছ থেকে কোনও তথ্য

না পাই আমরা।'

'কে দায়ী?' জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট।

'বলা কঠিন। বুলেটগুলো পরীক্ষা করা হয়েছে। *গ্রাজ-বুরিয়া* অটোমেটিক থেকে ফায়ার করা হয়েছে। ওটা রাশান পিস্তল, রাশান ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করে। কাজেই কাজটা ওদের হতে পারে...'

'অসম্ভব!' প্রতিবাদ করলেন সেক্রেটারি অভ স্টেট। 'ইতোমধ্যে রাশান অ্যাম্বাস্যাডরের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। ব্যাপারটার আভাস দিতেই কসম কেটে বলেছেন, এর মধ্যে তাঁদের কোনও হাত নেই। কথাটা বিশ্বাস করেছি আমি। জেনারেল ওয়ার্নার রাশান ইস্যুতে বহুবার ওদের পক্ষ নিয়েছেন। ওঁকে খুন করলে ওদেরই ক্ষতি। তা ছাড়া ওই পিস্তল ইয়োরোপের যে-কোনও জায়গায় কিনতে পাওয়া যায়।'

'সেক্ষেত্রে আর কোনও সাসপেক্ট আছে আপনার হাতে?' সিআইএ ডিরেক্টরের দিকে ফিরলেন প্রেসিডেন্ট।

'বহু। আল-কায়েদা, চাইনিজ ইন্টেলিজেন্স, নর্থ কোরিয়ান... লিস্ট অনেক লম্বা।' কাঁধ ঝাঁকালেন ডিরেক্টর। 'কিন্তু আমাদের হাতে কোনও প্রমাণ নেই। টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশন হলে এতক্ষণে কৃতিত্ব দাবি করত, কিন্তু করেনি। আর ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটি এসব ব্যাপারে কখনও ঢাকঢোল পেটায় না। আমরা এ-মুহূর্তে সম্পূর্ণ অন্ধকারে, মি. প্রেসিডেন্ট।'

'তা হলে আলোয় আসার ব্যবস্থা নিন!' রাগী গলায় বললেন প্রেসিডেন্ট। 'আমাদের জয়েন্ট চিফ অভ স্টাফকে খুন করা হয়েছে! ব্যক্তিগত জীবনে ওর কী বদভ্যাস ছিল, সেটা বড় কথা নয়। বড় কথা হলো, দেশের জন্য জেনারেল ওয়ার্নার ছিল এক অমূল্য সম্পদ... সত্যিকার বীর। যে-ই এর পিছনে জড়িত থাকুক,

তাকে কিছুতেই পার পেতে দেয়া যায় না। যা খুশি করুন, বাট আই ওয়াণ্ট দ্যাট সান অভ বিচ!'

'ইয়েস, মি. প্রেসিডেন্ট!' সমস্বরে বলে উঠলেন সেক্রেটারি অভ স্টেট আর সিআইএ ডিরেক্টর। তারপর বেরিয়ে এলেন ওভাল অফিস থেকে।

দুই

'ইলিয়া ইভানোভিচ!' বিছানার পাশ থেকে তীক্ষ্ণকণ্ঠে ডেকে উঠলেন বৃদ্ধা মহিলাটি, হাতে একটা ব্রেকফাস্ট ট্রে ধরে রেখেছেন। 'তুমি এখনও ঘুমাচ্ছ? সেই কখন থেকে ডাকছি... ওঠো বলছি! নইলে কিন্তু মাথায় পানি ঢেলে দেব!'

বালিশে মুখ গুঁজে রেখেছিলেন ড. ইভানোভিচ, স্ত্রী-র ধমকে চিৎ হলেন। আস্তে আস্তে খুললেন চোখ। গোঙানির মত শব্দ করে বললেন, 'সাতসকালে যন্ত্রণা না করলে হয় না? ছুটি কাটাতে এসেছি এখানে, তোমার রুটিন ফলো করবার জন্য না। ওফ্, মাথাটা ঝিমঝিম করছে।'

'মাথা ঝিমঝিম করছে নিজেরই দোষে, কাল রাতে অত মদ গিলতে কে বলেছিল? আরেকটু হলে তো লাইটার দিয়ে সিগারেটের বদলে নিজের দাড়িই জ্বালিয়ে দিচ্ছিলে!'

'হুম! মনে পড়েছে, ইউরি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আমার উপর।' দাড়িতে হাত বোলালেন ইভানোভিচ। একটু উঁচু হয়ে খাটের

ব্যাকরেস্টে হেলান দিয়ে বসলেন।

বেডসাইড টেবিলে ট্রে নামিয়ে রাখলেন মিসেস ইভানোভিচ। স্বামীর পাশে বসে বললেন, 'কপাল ভাল, আমাদের ছেলে তোমার মত কৌতূহলী স্বভাবের হয়নি। তা হলে গালে হাত দিয়ে দেখতে বসে যেত, দাড়িতে আগুন লাগলে কী হয়।'

হেসে ফেললেন ইভানোভিচ। 'হ্যাঁ, কপাল ভাল বটে। বিজ্ঞানী না হয়ে আমাদের ছেলে সৈনিক হয়েছে।'

'ওঠো এখন। বাইরে কী সুন্দর রোদ উঠেছে... এমন সকালে কম্বলমুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকার কোনও মানে হয় না। নাশতা করে নাও, তারপর আমরা একটু বারান্দায় বসব।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন ইভানোভিচ। হ্যাঁ, সকালটা সত্যিই সুন্দর। বাড়ির গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা গাছপালার মাথায় জমে থাকা বরফের মুকুট গলে গলে পড়ছে। দেখতে ভারি ভাল লাগছে।

'একটা সিগারেট দেবে?' বললেন তিনি।

'জুস খাবার আগে না,' হাত বাড়িয়ে ট্রে থেকে একটা গ্লাস তুলে নিলেন মিসেস ইভানোভিচ। 'ফ্রিজ-ভর্তি ফলের জুস... কে খাবে ওসব? ইউরি তো ঠাট্টা করছে; বলছে ওগুলো নাকি তোমার দাড়ির আগুন নেভানোর জন্য জমা করেছি।'

'ছেলে তোমার ভালই রসিক হয়েছে,' বললেন ইভানোভিচ। তারপর অনুনয় করলেন, 'প্লিজ, ডার্লিং। একটা সিগারেট... তুমিই নাহয় ধরিয়ে দাও! কথা দিচ্ছি, লাঞ্চের আগে আর চাইব না।'

'তোমাকে নিয়ে আর পারি না!' বিরক্ত গলায় বললেন মিসেস ইভানোভিচ। তবে ঝুঁকে বেডসাইড টেবিলের ড্রয়ার থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করলেন। একটা সিগারেট গুঁজে দিলেন স্বামীর ঠোঁটে। লাইটার উঁচু করে বললেন, 'আগুন জ্বালার সময়

আবার শ্বাস ছেড়ো না, কাল রাতের অ্যালকোহল তোমার ফুসফুসেও পৌঁছে গেছে বলে আমার ধারণা। শেষে জ্বলেপুড়ে মরবে। রাশার শ্রেষ্ঠ নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্টকে খুন করার অভিযোগে জেলে যেতে হবে আমাকে।'

স্ত্রী-র টিটকিরি শুনে মুখ বাঁকালেন ইভানোভিচ। 'আমি মরলেও আমার কাজ থেমে থাকবে না। নাহয় পুড়লামই সিগারেটের আগুনে।' লাইটার জ্বলে উঠলে সিগারেট ধরালেন। আয়েশ করে তাতে টান দিয়ে ভক ভক করে ধোঁয়া ছাড়লেন। বললেন, 'তোমার ছেলে কোথায়?'

'রাইফেল পরিষ্কার করছে। অতিথিরা ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এসে যাবে বলে শুনেছি। দুপুরে শিকারে যাবার কথা।'

'ওফ্ফো, আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম,' ঝট্ করে পিঠ খাড়া করলেন ইভানোভিচ। একটু করুণ মুখভঙ্গি ফুটল তাঁর চেহারায়। 'আচ্ছা, আমাকে কি যেতেই হবে?'

'ছেলের পার্টনার হয়েছ, না গেলে চলবে কেমন করে? সেদিন ডিনারের সময় সবার সামনে তো খুব বড়াই করলে, বাপ-ব্যাটা মিলে সবচেয়ে বড় শিকারটা ঘরে আনবে। এখন কথা ঘোরাতে পারবে?'

'বড়াই না, আসলে কথাটা বলেছি বিবেকের দংশনে... ইউরিকে খুশি করবার জন্য। ছেলেটা বড় হবার সময় আমাকে একেবারেই কাছে পায়নি। সারাজীবন তো আমাকে ল্যাবরেটরিতে মুখ গোঁজা অবস্থায় দেখেছে।'

একটু হাসলেন মিসেস ইভানোভিচ। 'এখন সময় তার প্রায়শ্চিত্ত করবার। তা ছাড়া... খোলা বাতাসে একটু ঘোরাঘুরি করলে সেটা তোমার শরীরের জন্যও ভাল হবে। তাড়াতাড়ি সিগারেট আর নাশতা সেরে নাও। তারপর তৈরি হও শিকারে

যাবার জন্য।'

স্ত্রীর হাতে হাত রাখলেন বৃদ্ধ বিজ্ঞানী। 'হ্যাঁ, এখন মনে হচ্ছে সত্যিই ছুটিতে এসেছি। শেষ কবে তোমাদেরকে নিয়ে কোথাও গেছি, তা মনে পড়ে না।'

'পড়ে না, তার কারণ যাওনি কখনও। তবে তা নিয়ে আমার কোনও অভিযোগ নেই। তোমার মত কর্মঠ মানুষ আমি আর কোথাও দেখিনি।'

কাঁধ ঝাঁকালেন ইভানোভিচ। 'রাশান আর্মিকে ধন্যবাদ, আমার ছেলেকে শেষ পর্যন্ত ছুটি দিয়েছে।'

'ও-ই তো ছুটির দরখাস্ত করেছে। তোমার সঙ্গে কয়েকটা দিন কাটাবার ইচ্ছে ওর।'

'খুব ভাল। ইউরিকে আমি ভালবাসি। কিন্তু... ওর সম্পর্কে বলতে গেলে কিছুই জানি না আমি।'

'খুব ভাল অফিসার... সবার মুখে তা-ই শুনেছি। ওকে নিয়ে তোমার গর্ববোধ করা উচিত।'

'করি না কে বলল? সমস্যা হলো, তেমন কোনও মিল নেই আমাদের মধ্যে। কী নিয়ে ওর সঙ্গে কথা বলব, তা বুঝি না।'

'অবাক হচ্ছি না। গত দু'বছরে তোমাদের তো বলতে গেলে দেখাই হয়নি।'

'ব্যস্ত ছিলাম আমি। কাজে ডুবে গেলে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই... এ-কথা সবাই জানে।'

'সেসব পুরনো কথা,' স্বামীর কাঁধে হাত রাখলেন মিসেস ইভানোভিচ। 'কিন্তু এখন কোনও কাজ নেই তোমার, আগামী তিন সপ্তাহের জন্য তুমি স্রেফ একজন বাবা এবং স্বামী। পরিবারকে সময় দেবে। প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে যেয়ো না। তাড়াতাড়ি বিছানা ছাড়ো। শিকারে গিয়ে ছেলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা

গড়ে তুলবে তুমি।'

'হাহ্, শিকার! ছেলে আবার ফায়ারিং দেখে খেপে যায় কিনা ভাবছি। গত বিশ বছরে বন্দুক ছুঁয়ে দেখিনি।'

'যা-ই করো, ইউরি কিছুই মনে করবে না,' নরম গলায় বললেন মিসেস ইভানোভিচ। 'তোমাকে এতদিন পর কাছে পাচ্ছে, এটাই ওর জন্য সবচেয়ে বড় ব্যাপার।'

পুরু তুষার মাড়িয়ে পুরনো আস্তাবলের কাছে পৌঁছুল লেফটেন্যান্ট ইউরি ইভানোভিচ। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল তিনতলা উঁচু মূল খামারবাড়ির দিকে। সকালের উজ্জ্বল রোদে ঝলমল করছে অ্যাল্যাব্যাস্টারের তৈরি প্রাচীন প্রাসাদোপম বাড়িটা। ঘন গাছপালা আর তুষারের চাদরের মাঝে মাথা উঁচু করে সদম্ভে দাঁড়িয়ে আছে ওটা—এমন একটা সময়ের প্রতীক হয়ে, যা বহু আগেই পেরিয়ে গেছে।

বিখ্যাত পিতার সন্তান সে। দ্য গ্রেট ইলিয়া ইভানোভিচ বলে সবাই চেনে ওর বাবাকে। পশ্চিমা দুনিয়ার বড় বড় নেতারা এই দুর্দান্ত মেধাবী মানুষটিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখেন, তাঁকে ভয় করেন। বলা হয়ে থাকে, মাথার ভিতর সবসময় অন্তত দশ রকম নিউক্লিয়ার ওয়েপনের ডিজাইন নিয়ে ঘোরেন তিনি। একটা মিউনিশন ডিপোতে কয়েক ঘণ্টা কাটাতে দিলেই ইভানোভিচ এমন যে-কোনও বোমা তৈরি করে ফেলতে পারবেন, যা দিয়ে গোটা লণ্ডন, কিংবা ওয়াশিংটনকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়া যাবে।

এমনই মানুষ ইলিয়া ইভানোভিচ। সমালোচনা, কিংবা সাধারণ আইনকানুনের ঊর্ধ্বে। আমলাতন্ত্র এবং সনাতন রাজনীতির ঘোর বিরোধী, প্রকাশ্যে এমন সব বক্তব্য দেন, যাতে ঝড় ওঠে পুরো দেশে। কিন্তু তারপরেও তাঁর বিরুদ্ধে কোনও

ব্যবস্থা নেবার সাহস পায় না সরকার। এমন জিনিয়াসকে খেপিয়ে দিলে তাতে গোটা রাশার পায়েই কুড়াল মারা হবে।

এ-কারণে সবাই ড. ইভানোভিচের সঙ্গে সখ্য গড়তে চায়। তাঁর সঙ্গে পরিচয় কিংবা ঘনিষ্ঠতা গড়ে আইনের হাত থেকে কিছুটা বাঁচার জন্য একটা ঢাল পাবার চেষ্টা আর কী। এমনিতে এসব সুযোগসন্ধানীদেরকে খুব একটা পাত্তা দেন না ইভানোভিচ, কিন্তু মাঝে মাঝে তার ব্যতিক্রম না ঘটিয়ে উপায়ও থাকে না।

আজ তেমনই একটা দিন। যে-দুই অতিথি ড. ইভানোভিচের খামারবাড়িতে আসছেন, তাঁরা বলতে গেলে জোর করেই নিমন্ত্রণ আদায় করেছেন। একজন হলেন ভিলনিয়াসে ইউরির ব্যাটালিয়নের কমাণ্ডার, অন্যজনের পরিচয় জানা নেই ওর। শুধু শুনেছে, কমাণ্ডারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু তিনি, মস্কো থেকে আসছেন। ইউরির ক্যারিয়ারকে তুঙ্গে নিয়ে যাবার ক্ষমতা নাকি তাঁর আছে। কথাটা ভাল লাগেনি তরুণ লেফটেন্যান্টের। পিতার পরিচয়ে, কিংবা প্রভাবের জোরে নয়, নিজের যোগ্যতায় জীবনের প্রতিটি ধাপ অতিক্রম করতে চায় ও। সন্দেহ নেই, ওর ক্যারিয়ারের কথা ভেবে দুই অতিথিকে আপ্যায়ন করতে রাজি হয়েছেন ড. ইভানোভিচ—সেটা ইউরির জন্য আরও বিব্রতকর ব্যাপার। ইচ্ছে হয়েছিল মানা করে দেবার জন্য বাবাকে বলতে। কিন্তু পারেনি ওর কমাণ্ডারের প্রতি শ্রদ্ধার কারণে। পুরো রাশান আর্মিতে যদি একজন মানুষেরও ড. ইভানোভিচের ঢাল পাবার দাবি থাকে, সেটা কর্নেল ভ্যাসিলি রোমানভের।

আর্মির ভিতরে চলতে থাকা দুর্নীতির প্রতিবাদে সোচ্চার কর্নেল। কিছুদিন আগে প্রকাশ্যে উচ্চপদস্থ বেশ কিছু কর্মকর্তার সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছিলেন। সরকারি অর্থের অপব্যবহার, সাধারণ সৈনিকদের কল্যাণের টাকায় সিনিয়রদের পকেট ভরা

নিয়ে মোটামুটি হৈচৈ শুরু করে দিয়েছিলেন তিনি। ফলাফল হিসেবে ক্যারিয়ার থমকে গেছে কর্নেল রোমানভের; সভ্যজগৎ থেকে বহুদূরে, ভিলনিয়াসের দুর্গম এলাকায় ব্যাটালিয়ন কমাণ্ডার হিসেবে অলিখিত নির্বাসন দেয়া হয়েছে তাঁকে। গত ছ'মাস থেকে ওখানেই কাজ করছে ইউরি। খুব কাছ থেকে দেখেছে কর্নেলকে, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় ভরে উঠেছে অন্তর। পরিণতির তোয়াক্কা না করে যে-মানুষ নীতির প্রশ্নে অবিচল থাকে, তাকে শ্রদ্ধা না করে উপায় কী? এমন একজন মানুষ ওর বাবার সঙ্গে একটা দিন কাটাতে চাইলে তাতে আপত্তি জানানো যায় না। নিজের প্রভাব খাটিয়ে কর্নেল রোমানভকে যদি সাহায্য করেন ড. ইভানোভিচ, ক্ষতি কোথায়? ইউরির মন খুঁতখুঁত করছে শুধু দ্বিতীয় অতিথির কথা ভেবে। কে সে? কোত্থেকে আসছে? কী চায় ওর বাবার কাছে?

আস্তাবলের কাছে পৌঁছে গেছে ইউরি, দরজা খুলে ভিতরে পা রাখল। মাঝখান দিয়ে চলে গেছে দীর্ঘ করিডোর, দু'পাশে সারি বেঁধে তৈরি করা ঘোড়া রাখার স্টল। এখন অবশ্য সবগুলো খালি। অযত্নে-অবহেলায় কাঠের দেয়াল ভগ্নপ্রায়, সবখানে ঘুণপোকার বাসা। কিন্তু এককালে তেজি, চমৎকার সব ঘোড়া থাকত এখানে। বাতাসে এখনও যেন ভেসে বেড়াচ্ছে সেসব ঘোড়ার হ্রেষারব, খুরের খটখটানি। এখন সব বদলে গেছে—এই খামার... সেইসঙ্গে গোটা দেশ। মহাপরাক্রমশালী সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে, নিজের ছায়া হয়ে কোনোমতে টিকে আছে রাশা। দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তরুণ লেফটেন্যান্টের বুক চিরে।

করিডোর পেরিয়ে আস্তাবলের শেষপ্রান্তে গেল ইউরি, ওখানে আরেকটা বড় দরজা আছে। সেটা খুলে বেরিয়ে এল আস্তাবলের তুষারাবৃত পিছনদিকটায়।

দূরে কী যেন দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওর। চোখ পিটপিট করে তাকাল ওদিকে। বনভূমির কিনারে ট্র্যাক দেখা যাচ্ছে। পায়ের ছাপ... কিন্তু এল কোত্থেকে! মস্কো থেকে নিয়োগ পাওয়া দুই ভৃত্য এখনও বাড়ির ভিতরে, গেমকিপার-রা থাকছে খামারবাড়ি থেকে বেশ কিছুটা দূরে আলাদা ব্যারাকে। তা হলে এদিকে এল কে?

আনমনে মাথা নাড়ল ইউরি। নাহ্, নিশ্চয়ই ভুল হচ্ছে ওর। পায়ের ছাপগুলো যে মানুষেরই, তা ভাবছে কেন? এদিকটায় বুনো প্রাণীর অভাব নেই। ভালুক বা হরিণ, যে-কোনও জানোয়ার হতে পারে। সকালের রোদে বরফ গলতে শুরু করেছে। কিনার গলে যাওয়ায় হয়তো বা ওসব ছাপই মানুষের ছাপের মত লাগছে।

ব্যাপারটা নিয়ে আর বেশি মাথা ঘামাল না ইউরি। যথেষ্ট প্রাতঃভ্রমণ করেছে। বাড়িতে ফিরে গিয়ে তৈরি হওয়া দরকার। অতিথিরা এসে পড়বেন খুব শীঘ্রি। উল্টো ঘুরে আবার হাঁটতে শুরু করল ও।

ঘণ্টাখানেক পর হাজির হলেন কর্নেল রোমানভ আর তাঁর সঙ্গী। অযাচিত অতিথি... তাই অস্বস্তিকর পরিস্থিতি দেখা দেবে, এমন ধারণা করেছিল ইউরি, তবে সেসবের কিছুই ঘটল না। বিখ্যাত বিজ্ঞানীর সামনে কর্নেল রোমানভ শুরুতে কিছুটা আড়ষ্ট হয়ে ছিলেন, কিন্তু হাসি-ঠাট্টার মাধ্যমে তাঁকে সহজ করে দিলেন ড. ইভানোভিচ। ছেলের ক্যারিয়ার নিয়ে নানা ধরনের প্রশ্ন করতে শুরু করলেন, ব্যাপারটা কিছুটা বিব্রত করে তুলল ইউরিকে। জুস আর কফি পরিবেশন করা হলো, তাতে চুমুক দিতে দিতে গল্পে মেতে উঠলেন তিনজনে।

অল্প সময়ের মধ্যে মস্কো থেকে আসা কর্নেল রোমানভের

সঙ্গীটি আসরের প্রাণ হয়ে উঠলেন। ভদ্রলোকের নাম নিকোলাই প্রুশিন, ক্ষমতাসীন পার্টির লোক, মিলিটারি-ইণ্ডাস্ট্রিয়াল প্ল্যানিঙের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত। একই সার্কেলের বেশ কিছু পরিচিত বন্ধুবান্ধব বেরিয়ে পড়ল ড. ইভানোভিচের সঙ্গে আলাপে। তা ছাড়া জানা গেল, বিখ্যাত বিজ্ঞানীটির মত তিনিও মস্কোর আমলাতন্ত্রের ব্যাপারে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন। খুব শীঘ্রি ড. ইভানোভিচ তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন, খানিক পর দেখা গেল, প্রুশিনকে *তুমি* বলে সম্বোধন করছেন। ড্রয়িংরুমে রাজনৈতিক আলোচনার ঝড় উঠল।

'তুমি একটা জিনিস বটে, নিকোলাই!' প্রুশিনের একটা মন্তব্য শুনে হাসতে হাসতে বললেন ইভানোভিচ।

'আপনিও কম যান না,' পাল্টা হাসি ফুটল প্রুশিনের ঠোঁটে। 'আমাদের মধ্যে অনেক মিল!'

'বুঝে-শুনে কথা বলো,' ইশারায় কর্নেল রোমানভ আর ইউরিকে দেখালেন ইভানোভিচ। 'আর্মির লোক... আমাদের নামে না রিপোর্ট করে দেয়!'

'তা হলে ওদের বেতন আটকে দেব আমি। আপনিও একটা ব্যাকফায়ার করবার মত বোমা বানিয়ে দিতে পারবেন।'

হাসিতে ছেদ পড়ল ড. ইভানোভিচের। 'সত্যি বলতে কী, অমন বোমার কথা বহুবার ভেবেছি আমি। মানে... দেশটা যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল... যখন ধ্বংসের পথে হাঁটছিল সবাই।'

'ঠিকই বলেছেন,' সায় দিলেন প্রুশিন। 'বহু অপচয় করেছি আমরা। টাকাগুলো যদি দেশের কল্যাণে ব্যবহার করা হতো, হয়তো বা মাদার রাশা এভাবে টুকরো টুকরো হয়ে যেত না।'

ক্ষণিকের জন্য নীরবতা নেমে এল ড্রয়িংরুমে। পরিবেশটা ভারী হয়ে উঠেছে।

খানিক পরে গলা খাঁকারি দিয়ে ড. ইভানোভিচ বললেন, 'থাক, এসব নিয়ে এখন আর কথা না বলাই ভাল। চলো, শিকারে যাই। গেমকিপার-রা অপেক্ষা করছে। বছরের এ-সময়টা নাকি শিকারের জন্য খুবই ভাল। আমার ছেলেকে কথা দিয়েছি, সবচেয়ে বড় শিকারটা উপহার দেব ওকে। প্রস্তুতি নিয়ে এসেছ তো তোমরা?'

'অবশ্যই,' বললেন প্রুশিন।

'কোনও কিছুর অভাব থাকলে আমার কাছ থেকে নিতে পারো—বুট, কোট... কিংবা ভদকা!'

'খবরদার, বাবা!' বলে উঠল ইউরি। 'শিকারে যাবার আগে ড্রিঙ্ক চলবে না।'

রোমানভের দিকে তাকিয়ে হাসলেন ইভানোভিচ। 'ওকে ভালই ট্রেইনিং দিয়েছেন আপনারা, কর্নেল।'

একটু লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসলেন রোমানভ।

'আপনারা কিন্তু আজ এখানেই থাকছেন,' বললেন ইভানোভিচ। 'যাবার কথা শুনতে চাই না। মস্কোর আবহাওয়া ভাল, কিন্তু ওখানে এখানকার মত তাজা খাবার পাবেন না।'

'শুধু খাবার?' ভুরু নাচালেন প্রুশিন। 'ভদকা পাওয়া যাবে না?'

'সে আর বলতে!' হাসলেন ইভানোভিচ। 'থাকছ তো?'

'থাকছি, ডক্টর। আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে আমার।'

রাইফেলের অকস্মাৎ গর্জনে খান খান হয়ে গেল বনভূমির নির্জনতা। দুপুরের গরম রোদ, আর থমকে থাকা বাতাসের মাঝে কেমন ভোঁতা শোনাল আওয়াজটা। আকাশে, আতঙ্কিত ভঙ্গিতে ডানা ঝাপটাতে থাকা বেশ কিছু পাখি নজরে পড়ল, পালাবার

চেষ্টা করছে শিকারীদের নাগাল থেকে। উত্তেজিত কণ্ঠও শুনতে পেল ইউরি, তবে দূরত্বের কারণে কথাগুলো বোঝা গেল না। পিতার দিকে তাকাল ও।

'ষাট সেকেণ্ডের মধ্যে যদি হুইসেল শোনা যায়, তা হলে বুঝতে হবে, ওরা শিকারের গায়ে গুলি লাগাতে পেরেছে,' বলল ও।

'ধ্যাত্তেরি!' বিরক্ত গলায় বললেন ড. ইভানোভিচ। 'গেমকিপারগুলো তো দেখি কিছুই জানে না। আমাকে কসম কেটে বলেছে, বনের এ-অংশে... লেকের ধারে সমস্ত শিকার মেলে। সেজন্যেই তো নিজে এদিকে এলাম, আর প্রুশিনদেরকে পাঠালাম অন্যদিকে। আমাদের আগে ওরা শিকার পায় কীভাবে?'

'সে কী!' বিস্মিত গলায় বলল ইউরি। 'এভাবে বুঝি হারাবার প্ল্যান করেছ ওঁদেরকে?'

'অল'স ফেয়ার ইন লাভ অ্যাণ্ড ওঅর,' দার্শনিকের ভঙ্গিতে বললেন ইভানোভিচ।

'শিকারে এসেছি আমরা, যুদ্ধে নয়,' বলল ইউরি। ভুরু কুঁচকে তাকাল পিতার রাইফেলের দিকে। 'সেফটি রিলিজ করে রেখেছ কেন, বাবা?'

'পিছনদিকে খসখসানির মত কী যেন শুনলাম একটু আগে,' বললেন ইভানোভিচ। 'তাই রেডি থাকতে চাই।'

'কিছু মনে কোরো না, বাবা, টার্গেটের দিকে অস্ত্র তাক করার আগে সেফটি রিলিজ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। এতে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। প্লিজ, অন্ করো ওটা।'

'হুম,' কাঁধ ঝাঁকালেন ইভানোভিচ। 'তা অবশ্য ঠিক বলেছ। হোঁচট খেয়ে অ্যাকসিডেন্ট ঘটিয়ে ফেলতে পারি। ঠিক আছে...' সেফটি ক্যাচের লিভার অন্ পজিশনে নিয়ে এলেন তিনি।

'থ্যাঙ্কস্, বাবা...' বলতে বলতে পাঁই করে ঘুরল ইউরি। বৃদ্ধ বিজ্ঞানী ভুল বলেননি। পিছনে সত্যিই আবার শব্দ হয়েছে। মট্ করে শুকনো ডাল ভাঙার আওয়াজ। নিজের রাইফেলটা একটু উঁচু করে সেফটি রিলিজ করল ও।

'কী হয়েছে?' জানতে চাইলেন ইভানোভিচ, উত্তেজনায় দু'চোখ জ্বলজ্বল করছে।

'শ্‌শ্‌...' ঠোঁটের কাছে আঙুল তুলল ইউরি। গাছপালার ফাঁকফোকরের মাঝ দিয়ে তীক্ষ্ণ নজর বোলাল।

'তা হলে তুমিও শুনেছ ওটা?' বললেন ইভানোভিচ। 'মতিভ্রম হয়নি আমার।'

অনেকক্ষণ চেষ্টা করার পরও শব্দের উৎস সনাক্ত করতে পারল না ইউরি। তাই সোজা হয়ে দাঁড়াল। লক্ পজিশনে নিয়ে এল রাইফেলের সেফটি লিভার।

'কী বুঝলে?' জানতে চাইলেন বৃদ্ধ বিজ্ঞানী।

'গাছের মাথায় প্রচুর তুষার জমেছে,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল ইউরি। 'সে-ওজনেই হয়তো পাতলা কোনও ডাল ভেঙে পড়েছে। ওই আওয়াজ শুনেছি আমরা।'

'হতে পারে। কিন্তু একটা আওয়াজ এখনও শুনিনি আমরা... হুইসেলের আওয়াজ। তারমানে প্রুশিন আর তোমার কর্নেল এখনও কিছুতে গুলি লাগাতে পারেনি।'

ইভানোভিচের কথা শেষ হতেই আবার রাইফেলের আওয়াজ শোনা গেল। পরপর কয়েকবার।

'আবার চেষ্টা করছে ওরা,' বলল ইউরি। 'দেখা যাক, এবার হুইসেল বাজে কি না।'

বাজল না বাঁশি, তার পরিবর্তে হঠাৎ ভেসে এল আর্তচিৎকার। প্রথমে একটা কণ্ঠের, তারপর আরেকটা। যেন মৃত্যুযন্ত্রণায়

ছটফট করছে কেউ। কেঁপে উঠল পিতা-পুত্র।

'হা ঈশ্বর! কী ঘটছে ওখানে?' হতভম্ব গলায় বললেন ইভানোভিচ।

'কী জানি...'

বাক্যটা শেষ করতে পারল না ইউরি, তার আগেই তৃতীয় চিৎকার শোনা গেল দূরে। দূরত্বের কারণে পুরোপুরি স্পষ্ট নয়, তারপরেও ভয়াল সে-আর্তনাদ আত্মা কাঁপিয়ে দেয়।

চঞ্চল হয়ে উঠল তরুণ লেফটেন্যান্ট। পিতাকে বলল, 'এখানেই থাকো। আমি দেখে আসছি ব্যাপারটা কী।'

'যাও,' বললেন ইভানোভিচ। 'আমিও আস্তে-ধীরে পিছন পিছন আসছি। সাবধানে যেয়ো!'

তুষার মাড়িয়ে ছুটতে শুরু করল তরুণ লেফটেন্যান্ট। আর্তনাদের আওয়াজে ভারী হয়ে উঠেছে বনভূমি, তবে এখন তাতে আগের মত জোর নেই। যে বা যারাই চেঁচিয়ে উঠুক, তাদের শক্তি ফুরিয়ে এসেছে। ঘন ঝোপঝাড়ের মাঝ দিয়ে পথ তৈরি করার জন্য রাইফেলের বাট ব্যবহার করল ইউরি। তবে কাজটা পরিশ্রমের। অল্পক্ষণের মধ্যেই ক্লান্তি ভর করল ওর শরীরে। পা ব্যথা করছে, ঠাণ্ডা বাতাস টানার সময় খচ্ করে কী যেন বিঁধছে ফুসফুসে। দৃষ্টিসীমাও কমে এসেছে শ্রান্তির কারণে।

হঠাৎ করে বনের মাঝখানে ছোট্ট একটা ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে এল ও। সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেল মূর্তিমান বিপদকে। বিশাল এক কালো ভালুক, দু'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, মুখ-হাত রক্তে রঞ্জিত, হাঁ করে ভয়ানক গর্জন করছে প্রবল আক্রোশে। প্রাণীটার গায়ে গুলির আঘাত লক্ষ করল ইউরি, সে-কারণেই ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে গেছে ওটা। কয়েক গজ তফাতে তুষারে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে দুটো মানবদেহ, নিঃসন্দেহে

এতক্ষণ তাণ্ডব চালাচ্ছিল ওগুলোর উপরে।

লেফটেন্যান্টের উপস্থিতি টের পেয়েই ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল ভালুক। আক্রমণের ভঙ্গিতে কুঁজো হলো একটু। দেরি করার কোনও মানে হয় না, রাইফেল উঁচু করে গুলি করতে শুরু করল ইউরি, খালি করে ফেলল ম্যাগাজিন। ভারী বুলেটের উপর্যুপরি আঘাতে মাটিছাড়া হলো কালো ভালুক। ধড়াম করে আছড়ে পড়ল কয়েক গজ দূরে। প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেল দেহ থেকে।

হাঁপাতে হাঁপাতে পড়ে থাকা দেহদুটোর দিকে এগোল ইউরি। কর্নেল রোমানভ আর প্রুশিন... কোনও সন্দেহ নেই। পোশাক চিনতে পারছে। কাছে যেতেই বমি পেল দৃশ্যটা দেখে।

প্রুশিন মৃত। গলা ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে ভালুক, মাথাটা কোনোমতে আটকে আছে ধড়ের সঙ্গে। কর্নেল এখনও বেঁচে আছেন, কিন্তু তা না থাকার মতই। যে-কোনও মুহূর্তে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবেন। ভালুকের থাবায় মুখমণ্ডল অদৃশ্য হয়েছে তাঁর, প্রচণ্ড কষ্টে ছটফট করছেন। একটাই করণীয় এ-মুহূর্তে—রাইফেল রিলোড করে বেচারাকে এই অবর্ণনীয় কষ্ট থেকে মুক্তি দেয়া। এভাবে কষ্ট পেয়ে মরা উচিত নয় কারও।

কিন্তু কীভাবে... কীভাবে এই ভয়ানক ঘটনা ঘটল? কিছুই বুঝতে পারছে না ইউরি। রাইফেলের ম্যাগাজিন খুলতে খুলতে তাকাল কর্নেলের দিকে, পরমুহূর্তে চমকে উঠল।

রোমানভের ডান হাত... সেটা কনুইয়ের নীচ থেকে গায়েব হয়ে গেছে! কীভাবে বিচ্ছিন্ন হয়েছে, তাও পরিষ্কার। হেভি ক্যালিবার বুলেট!

গুলির সাহায্যে কর্নেলের ফায়ারিং আর্ম অচল করে দিয়েছে কেউ। ওই হাতেই রাইফেল চালান তিনি।

তাড়াতাড়ি প্রুশিনের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল ইউরি। ডান হাত

অক্ষত ভদ্রলোকের। কিন্তু বাঁ হাতের তালুটা গুলির আঘাতে চুরমার হয়ে গেছে। সকালের কথা ভাবল লেফটেন্যান্ট—কফি, ফলের জুস, আর চুরুট। সব বাঁ হাতে ধরেছিলেন গ্রুশিন। ভদ্রলোক বাঁহাতি!

থমকে গেল ইউরি। মানেটা পরিষ্কার, অচল করে দেয়া হয়েছিল দু'জনকে—অরক্ষিত, অসহায় করে দেয়া হয়েছিল। তারপর গুলি করে আহত করা হয়েছে হিংস্র ভালুককে... লেলিয়ে দেয়া হয়েছে ওঁদের উপর।

সৈনিক-সত্তা জেগে উঠেছে ইউরির ভিতর। সাবধানে উঠে দাঁড়াল। রাইফেল রিলোড করে ফেলেছে ইতোমধ্যে, সতর্ক নজর বোলাল চারপাশে। ফাঁদের প্রকৃতি বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। নিখুঁত, নিশ্ছিদ্রভাবে আয়োজন করা হয়েছে পুরো ব্যাপারটার। সকালে আস্তাবলের পিছনে দেখা পায়ের ছাপগুলোর কথা মনে পড়ল। নিশ্চয়ই খুনির পায়ের ছাপ ছিল ওগুলো।

কে লোকটা? সবচেয়ে বড় কথা, কেন এসব ঘটিয়েছে?

আচমকা চোখের কোণে ঝিলিক দিয়ে উঠল কী যেন। সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়েছে ধাতব কিছুর গায়ে। মাটিতে ঝাঁপ দিল ইউরি, গড়ান দিয়ে চলে গেল একটা ওক গাছের পিছনে। সন্তর্পণে উঁকি দিল যে-দিকে ঝিলিক দেখেছে, সে-দিকে। একটা উঁচু পাইন গাছের উপর থেকে এসেছে ওটা।

আলোর সঙ্গে দৃষ্টি মানিয়ে আসতেই খুনিকে দেখতে পেল লেফটেন্যান্ট। মাটি থেকে পঞ্চাশ ফুট উপরে, পাইন গাছের দুটো ডালের মাঝখানে পজিশন নিয়েছে লোকটা। পরনে দুধ-সাদা স্নো-পারকা, হুড দিয়ে ঢেকে রেখেছে মাথা। চোখে কালো সানগ্লাস; হাতে রাইফেল, টেলিস্কোপিক সাইট লাগানো আছে ওতে।

তীব্র আক্রোশ আর ঘৃণায় চিৎকার করতে ইচ্ছে হলো ইউরির। লোকটা দাঁত বের করে হাসছে। ওকে উদ্দেশ করে একটা হাতও নাড়ল।

রাইফেল উঁচু করল ইউরি, কিন্তু ট্রিগার টেপার আগেই একরাশ বরফ ছিটকে উঠল ওর কয়েক হাত দূরে। চতুর খুনি গুলি করছে ওকে লক্ষ্য করে, যাতে ওর আড়াল নিতে হয়। দ্বিতীয় বুলেটটা ঠক্ করে বিঁধল ওক গাছের কাণ্ডে। তাড়াতাড়ি আড়ালে সরে আসতে বাধ্য হলো ইউরি। কী করবে বুঝতে পারছে না।

আরেকটা গুলির আওয়াজ হলো। খুব কাছে, তবে পাইন গাছের খুনি ছোঁড়েনি এ-গুলিটা।

'ইউরি!' তরুণ লেফটেন্যান্টের নাম ধরে আর্তনাদ করে উঠল কেউ।

চমকে উঠল ইউরি। এ-কণ্ঠ তো ওর বাবার! ভয় আর ক্রোধে অন্ধ হয়ে উঠল ও। হিতাহিত জ্ঞান রইল না।

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ও। পাইন গাছের দিকে একটা গুলি করে ছুটতে শুরু করল পিতাকে সাহায্য করার জন্য। পিছনে গর্জে উঠল আততায়ীর রাইফেল।

পিঠে একটা চিনচিনে ব্যথা অনুভব করল তরুণ লেফটেন্যান্ট, ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে পুরো দেহে। ছুটন্ত অবস্থায় হোঁচট খেল ও, আছড়ে পড়ল বরফের উপর। শরীরের নীচে রক্তে ভেসে যাচ্ছে তুষার।

'বাবা!'

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করবার আগে ফিসফিসিয়ে এই একটা শব্দই শুধু উচ্চারণ করল ইউরি ইভানোভিচ।

ডেস্কের উপর ছড়িয়ে রাখা ছবিগুলোর দিকে গম্ভীরভাবে তাকিয়ে

আছেন রাশান প্রাইম মিনিস্টার। আঙুলের ভাঁজে আঙুল, টেবিলের উপর দুই কনুই, এতক্ষণ চিবুকটা রাখা ছিল জোড়া মুঠির উপর; এবার আঙুলের ভাঁজ খুলে দু'হাত মেলে দিলেন ডেস্কের উপর। সামনে ঝুঁকে এসে শান্ত গলায় বললেন, 'দুঃখজনক। এমন ভয়ানক মৃত্যু কারও প্রাপ্য হতে পারে না। ড. ইভানোভিচের কপাল ভাল। প্রাণে বাঁচেননি হয়তো, কিন্তু এমন পরিণতি তো বরণ করতে হয়নি ওঁকে।'

কামরায় আরও তিনজন মানুষ আছে—দু'জন পুরুষ, একজন মহিলা। নার্ভাস ভঙ্গিতে প্রাইম মিনিস্টারের মুখভঙ্গি দেখছে তারা। প্রত্যেকের হাতে একটা করে খয়েরি রঙের ফোল্ডার। মুখ খোলার সাহস পাচ্ছে না কেউ। প্রাইম মিনিস্টারকে আশ্চর্য রকমের শান্ত দেখাচ্ছে; কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে ওরা জানে, এটা ঝড় আসার পূর্বাভাস।

কয়েক মিনিট নীরবতায় কাটল। তারপর উঠে দাঁড়ালেন প্রাইম মিনিস্টার। ডেস্কের পাশ ঘুরে একেবারে কাছে এসে থামলেন তিন দর্শনার্থীর।

'জানতে পারি, এমন ঘটনা কী করে ঘটল?' বললেন তিনি। 'দেশের সবচেয়ে প্রতিভাবান বিজ্ঞানী... তাঁকে খুন করতে পারল কীভাবে ওরা? আমরা কি বসে বসে আঙুল চুষছিলাম?'

'ইয়ে...' ইতস্তত করে বললেন একজন, তিনি রাশান ইন্টেলিজেন্সের প্রধান, 'ড. ইভানোভিচের জীবনের উপর কোনও ধরনের হুমকি আছে বলে জানা ছিল না আমাদের।'

'বোকার মত কথা বলছ তুমি, সারিনভ,' ধমকে উঠলেন প্রাইম মিনিস্টার। 'অমন লোকের জীবনের উপর সবসময়েই হুমকি থাকে। প্রোটেকশনের ব্যবস্থা করোনি কেন?'

'আমরা চেয়েছিলাম, মি. প্রাইম মিনিস্টার,' কাঁচুমাচু গলায় বললেন ইন্টেলিজেন্স চিফ। 'কিন্তু ড. ইভানোভিচ কিছুতেই দেহরক্ষী রাখতে রাজি হননি। উনি কেমন একগুঁয়ে স্বভাবের মানুষ ছিলেন, তা তো আপনি জানেন...'

'মানা করলেও কীভাবে গোপনে লোক রাখা যায়, তা কি আমার শিখিয়ে দিতে হবে? মনে হচ্ছে গতকাল ইন্টেলিজেন্সে যোগ দিয়েছ তুমি, সারিনভ।'

মাথা নিচু করে ফেললেন ইন্টেলিজেন্স চিফ।

'যা হবার, তা তো হয়েই গেছে,' বলে উঠলেন কামরায় উপস্থিত মহিলাটি। সরকারের উচ্চপদস্থ একজন কূটনীতিক তিনি, প্রাইম মিনিস্টারের ঘনিষ্ঠজন। 'কারা এ-কাজ করেছে, এবং কেন—সেটা বের করার পিছনে এখন আমাদের মনোযোগ দেয়া দরকার।'

'কোনও সূত্র পেয়েছেন আপনারা?' দ্বিতীয় পুরুষটির দিকে ফিরলেন প্রাইম মিনিস্টার, তিনি রাশার পুলিশ ফোর্সের চিফ।

'খুব সামান্য,' জানালেন ভদ্রলোক। 'দু'জন খুনি ছিল ওখানে। কোন্ পথে কীভাবে খামারবাড়ির সীমানায় পৌঁছেছিল, সেটা বের করতে পেরেছি। তবে ওদের পরিচয় সম্পর্কে এখনও কিছু জানা যায়নি।'

'অস্ত্রগুলো?'

'শেল-কেসিং আর বুলেট পরীক্ষা করে দেখেছি আমরা। সাত মিলিমিটার... ব্রাউনিং ম্যাগনাম, গ্রেড ফোর থেকে ছোঁড়া হয়েছে। আমেরিকান অস্ত্র।'

'বলতে চাইছেন, এই খুনগুলোর পিছনে আমেরিকানদের হাত আছে?' ভুরু কোঁচকালেন প্রাইম মিনিস্টার।

'আমি শুধু অস্ত্রের কথা বলছি, স্যার। কে ব্যবহার করেছে, তা

জানি না। কিন্তু এ-কথা ঠিক, ড. ইভানোভিচের গবেষণাকে কখনোই আমেরিকানরা ভাল চোখে দেখেনি।'

'অ্যাবসার্ড!' প্রতিবাদ করলেন ইন্টেলিজেন্স চিফ। 'ড. ইভানোভিচের ব্যাপারে কিছু করতে চাইলে আমেরিকানরা সেটা বহু আগেই করতে পারত। এত আয়োজন করে তাঁর ছেলে আর দুই অতিথিকে খুন করতে যেত না।'

'তুমি বলছ, ইভানোভিচ একাই টার্গেট ছিলেন না?' একটু অবাক হলেন প্রাইম মিনিস্টার।

মাথা ঝাঁকালেন সারিনভ। 'এর পিছনে আরও রহস্য থাকতে বাধ্য। কর্নেল রোমানভ আর মি. ক্রুশিন শুধু হাওয়া খেতে ওখানে গিয়েছিলেন বলে বিশ্বাস হয় না আমার।'

'সেক্ষেত্রে এখুনি তদন্ত শুরু করো তুমি, সারিনভ,' গম্ভীর গলায় বললেন প্রাইম মিনিস্টার 'কী ঘটেছে, তা জানতে চাই আমি... যত শীঘ্রি সম্ভব '

'জী, স্যর,' জবাব দিলেন সারিনভ। 'আমি এখুনি কাজে নামছি।'

তিন

কালো, ঘন, ভারী মেঘে ঢেকে আছে গোটা আকাশ। থমথম করছে চারদিক। দূরে কোথাও গির্জার ঘণ্টা ঢং ঢং করে বেজে উঠল।

মেঘ ডাকছে। মাঝে মাঝে মেঘের সঙ্গে মেঘের সংঘর্ষে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। মুহূর্তের জন্যে চোখ-ধাঁধানো আলোয় আলোকিত হয়ে উঠছে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, পরমুহূর্তে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে চারদিক।

দুর্যোগপূর্ণ রাত। এমন রাতে সহজে ঘুম আসার কথা নয় কারও চোখে। দীর্ঘদেহী, সুঠাম, দোহারা গড়নের মানুষটিও বুঝি সে-কারণেই জেগে আছে। নিজের কামরার মেঝেতে একটা গদিমোড়া তক্তপোশে বসে আছে সে ধ্যানমগ্ন হয়ে। কোলে একটি সরোদ, টুংটাং আলতো টোকায় উঠছে অপূর্ব সুরলহরী।

কেমন একটা ঘোরের মধ্যে যেন থমকে গেছে সময়। সরোদের মিষ্টি সুরের সঙ্গে কোন্ অতলতলে যেন হারিয়ে যেতে চায় হৃদয়। রুদ্র প্রকৃতির গর্জন ছাপিয়ে এই সুর যেন মধুর দোলায় আশ্চর্য এক আন্দোলনের সৃষ্টি করেছে ঘরের পরিবেশে।

তন্ময় হয়ে বাজাচ্ছে মানুষটা।

এই মুহূর্তে তার অন্য কোনও পরিচয় নেই। সে সুরের সাধক। সে প্রতিভাবান সঙ্গীতশিল্পী। নিজেকে বিলিয়ে দেবার এই সূক্ষ্ম শিল্প মাধ্যমকে মানুষটি গ্রহণ করেছে অন্তর দিয়ে। অনেক ত্যাগ, অনেক পরিশ্রমের বিনিময়ে আয়ত্ত করেছে সে এই অপূর্ব সুর সৃষ্টির ক্ষমতা। যন্ত্র নিয়ে যখন সে মেতে ওঠে, তখন পৃথিবীর অস্তিত্বের কথা মনে থাকে না তার। ভুলে যায় তার বিজ্ঞান চর্চার কথা... দেশের কথা... দশের কথা।

শিল্পীর ধর্মই তাই। মানুষটি একনিষ্ঠ সাধক... সার্থক শিল্পী। কিন্তু তার সত্যিকার পরিচয় সম্পূর্ণ ভিন্ন। বিরল এক প্রতিভা, দুর্জ্ঞেয় এক রহস্য। পিতৃদত্ত নাম মনসুর আলী, কিন্তু অন্য এক নামে চেনে সবাই তাকে।

কুয়াশা!

মানবকল্যাণে নিবেদিত পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের একজন এই কুয়াশা। বহুমুখী প্রতিভা বলতে যা বোঝায় সে ঠিক তা-ই, বিজ্ঞানের একটিমাত্র শাখা নিয়ে পড়ে থাকতে তার মন সায় দেয় না। কুয়াশা আসলে মানুষের অবিশ্বাস্য স্বপ্নগুলো পূরণের জন্যে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছে। মানুষ একদিন হুবহু তারই মত মানুষ তৈরি করতে পারবে, মানুষের আয়ু হবে কমপক্ষে বিশ হাজার বছর, তারুণ্য ও যৌবন হবে চিরস্থায়ী, আক্রান্ত হবার আগেই শরীর থেকে ক্যান্সার ও এইডস জিন শনাক্ত করা ও বের করে নেয়া সম্ভব হবে, আলোর চেয়ে পাঁচগুণ দ্রুতগতিসম্পন্ন স্পেসশিপে চড়ে মানুষ একদিন এক গ্যালাক্সি থেকে আরেক গ্যালাক্সিতে ঘুরে বেড়াবে, এই গতিই তাকে সুযোগ করে দেবে অতীত থেকে বেড়িয়ে আসার, এমনকী ভবিষ্যৎ দেখে আসারও।

স্বপ্নগুলো যতই অবিশ্বাস্য আর অবাস্তব মনে হোক, এগুলোই কুয়াশার গবেষণার বিষয়। সাধারণ মানুষ হয়তো এ-সব শুনে হেসেই খুন হবে, কিন্তু বিজ্ঞানের নতুন নতুন সম্ভাবনা সম্পর্কে যারা খবর রাখে, তারা জানে আধুনিক মানুষের এ-সব স্বপ্ন একদিন সত্যি সত্যিই পূরণ হতে যাচ্ছে। একদিন মানে অনির্দিষ্ট কাল বোঝায় না। আজ যেটাকে অবাস্তব বা অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে, আগামী পঞ্চাশ বা একশো বছরের মধ্যে সেটাকে বিজ্ঞানীরা বাস্তব সত্য হিসেবে প্রমাণ করে দেখাবেন। সারা পৃথিবী জুড়েই বিজ্ঞানীরা গবেষণায় মেতে আছেন, সাফল্য পাওয়া স্রেফ সময়ের ব্যাপার মাত্র।

কুয়াশার সঙ্গে আর সব বিজ্ঞানীর পার্থক্য হলো, তার সঙ্গে ওঁদের গবেষণার পদ্ধতি মেলে না। উন্নত দেশের বিজ্ঞানীরা গবেষণার জন্যে সরকার অথবা ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য পায়। ওঁদের একেকটা প্রজেক্ট দশ বা বিশ বছর

মেয়াদী। কিন্তু কুয়াশা কোথাও থেকে কোনও অর্থসাহায্য পায় না, তাই একদিকে তাকে টাকার সন্ধানে থাকতে হয়, আরেক দিকে খেয়াল রাখতে হয় সম্ভাব্য কত কম সময়ের ভিতর প্রতিটি গবেষণা শেষ করা যায়। টাকা যোগাড় করার জন্য মাঝে-মধ্যে মরিয়া হয়ে ওঠে সে, দেশ-বিদেশের কুখ্যাত ধনীদের বাড়িতে হানা দিয়ে নগদ যা পায় ছিনিয়ে আনে। কিংবা হেরোইন আর ব্রিফকেস ভর্তি টাকা হাতবদল হওয়ার সময় বিনা মেঘে বজ্রপাতের মত উদয় হয়, মানবতার শত্রুদেরকে কাবু করে কেড়ে নেয় সব। কুয়াশার 'এক্সপেরিমেণ্ট' পদ্ধতিও আলাদা, অনেক সময় গিনিপিগ হিসেবে মানুষকেই 'মডেল' হিসেবে গ্রহণ করে সে। এই গিনিপিগ করা হয় বেশিরভাগই অপরাধ জগতের লোকজনকে এক্সপেরিমেন্ট ব্যর্থ হলে তাদের অনেককেই অকালে মরা যেতে হয়। এ-ব্যাপারে কুয়াশা বিবেকের কোনও দংশন অনুভব করে না। কিন্তু আইন তো আর ডাকাতি বা এক্সপেরিমেণ্টের নামে মানুষ হত্যা মেনে নিতে পারে না। এখানেই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাগুলোর সঙ্গে কুয়াশার বিরোধ। কুয়াশাকে ধরার জন্য, কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর জন্য চেষ্টা করে যাচ্ছে দুনিয়ার বড় বড় সব ল-এনফোর্সমেণ্ট এজেন্সি; আর কুয়াশা তাদের পাতা ফাঁদ এড়াবার জন্যে যত রকম কৌশল আছে সব ব্যবহার করছে।

কুয়াশাকে তাই মরীচিকার সঙ্গে তুলনা করা হয়। হঠাৎ কখন তাকে কোথায় দেখা যাবে কেউ তা বলতে পারে না। অনেক সময় দেখেও চিনতে পারা যায় না। তাকে নিয়ে তাই গুজবেরও কোনও অন্ত নেই। অনেকেরই ধারণা, কুয়াশা অদৃশ্য হতে জানে। গুজব বা রহস্য, যাই বলা হোক, সম্পূর্ণ সত্য হয়তো কোনোদিনই জানা যাবে না, অন্তত কুয়াশা পুলিশের হাতে ধরা না পড়া পর্যন্ত। তবে

ধরতে যদি কোনোদিন পারেও, পুলিশ তাকে কতদিন বা কত ঘণ্টা আটকে রাখতে পারবে সেটাও একটা প্রশ্ন বটে।

ইদানীং অবশ্য তেমন একটা শোনা যায় না তার কথা। অনেকদিন হলো গা-ঢাকা দিয়ে আছে ও। সর্বশেষ খবর থেকে জানা যায়: বাংলাদেশেরই কোনও এক দুর্গম এলাকায়, পুরনো... পরিত্যক্ত এক জমিদার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। ওখানেই মাটির নীচে তৈরি করে নিয়েছে ল্যাবরেটরি, সেখানে অক্লান্তভাবে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে ধন্বন্তরী এক ওষুধ আবিষ্কারের জন্য। আদরের ছোট বোন মহুয়া, তার স্বামী বিখ্যাত গোয়েন্দা শহীদ খান, কিংবা শহীদের বন্ধু কামালের সঙ্গে কোনও যোগাযোগই নেই বলতে গেলে। দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন; ওভাবেই থাকত আরও বহুদিন, যদি না আজ সকালে খবরের কাগজটা দেখত।

কপালই বলতে হবে, বাজার-সদাই করবার জন্য পাঁচ মাইল দূরের গ্রামের বাজারে অনুচর পাঠিয়েছিল কুয়াশা। ওখানে চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে বসে সময় কাটাবার জন্য পত্রিকার পাতা উল্টাতে উল্টাতে তার চোখ আটকে যায় আন্তর্জাতিক পাতার একটা ছোট্ট খবরে। মনিবের জন্য কিনে আনে সে একটা কাগজ।

সরোদের সূক্ষ্ম তারে শেষ আঁচড় টেনে স্থির হলো কুয়াশা। মিষ্টি মধুর সুর হারিয়ে যেতে শুরু করেছে অবলীলায়। নেমে এল ওর দৃষ্টি। পায়ের কাছে মেলে রাখা হয়েছে পত্রিকার পাতাটা। তাতে কালো অক্ষরে লেখা:

জগদ্বিখ্যাত রুশ বিজ্ঞানী নিহত

এরপর সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে, নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের দিকপাল, ড. ইলিয়া ইভানোভিচ, তাঁর নিজস্ব খামারবাড়িতে আততায়ীর গুলিতে পুত্র-সহ নিহত হয়েছেন। এখন পর্যন্ত এ-হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে পুলিশ কোনও সূত্র খুঁজে পায়নি। এই

মৃত্যুতে পৃথিবী এক বিরল প্রতিভাকে হারাল ইত্যাদি, ইত্যাদি।

খবরের সঙ্গে ছোট্ট করে ড. ইভানোভিচের একটা সাদাকালো ছবি দেয়া হয়েছে। সেটার দিকে তাকালেই বুক টনটন করে উঠছে কুয়াশার, যেন কোনও আপনজনকে হারিয়েছে। অনুভূতিটা নিয়ে অবাক হবার কিছু নেই। ড. ইভানোভিচকে ব্যক্তিগতভাবে চিনত কুয়াশা, তাঁকে পিতার মত সম্মান করত।

বাস্তবে ইলিয়া ইভানোভিচ ছিলেন কুয়াশার গুরু, নিউক্লিয়ার সায়েন্সের সমস্ত খুঁটিনাটি কুয়াশা তাঁর কাছেই শিখেছে। পদ্ধতিগতভাবে বিজ্ঞান শেখেনি ও, যা জেনেছে সব নিজের চেষ্টায়। জীবনের একটা বড় সময় ওকে ছোটাছুটি করতে হয়েছে দেশে-বিদেশে, জ্ঞানার্জনের জন্য। বড় বড় বিজ্ঞানীদের দরজায় কড়া নেড়েছে ও, অনুরোধ জানিয়েছে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার ব্যাপারে ওকে শিক্ষা দেবার জন্য। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিফল হয়ে ফিরতে হয়েছে। হুলিয়াধারী একজন অপরাধীর জ্ঞানতৃষ্ণা মিটাবার সাহস হয়নি কারও। হাতেগোনা ব্যতিক্রমদের মধ্যে ড. ইভানোভিচ ছিলেন প্রথম সারির তিনজনের একজন। কুয়াশার পরিচয় নিয়ে মাথা ঘামাননি তিনি, সত্যিকার একজন জ্ঞানপিপাসু বিজ্ঞানসাধক হিসেবে বরণ করে নিয়েছিলেন ওকে। ছদ্মপরিচয় দিয়ে কুয়াশাকে নিজের সহকারী বানিয়েছিলেন, হাতে-কলমে শিখিয়েছেন বহুকিছু। নিপাট ভালমানুষ, সচ্চরিত্র এবং নীতিবান ছিলেন ভদ্রলোক। কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলেছিলেন ওকে। নিজের অজান্তেই ড. ইভানোভিচকে পিতার আসনে বসিয়ে ফেলেছিল কুয়াশা।

সেই মানুষটিই কিনা খুন হয়ে গেছেন! অব্যক্ত এক যন্ত্রণায় বুক দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছে কুয়াশার। কিছুতেই মনকে শান্ত করতে পারছে না। পারছে না গবেষণায় মনোনিবেশ করতে। ভেবেছিল

সরোদ বাজালে হয়তো কমবে এ-যন্ত্রণা, কিন্তু কমেনি।

না, এভাবে আর বসে থাকা যায় না। তক্তপোশ থেকে উঠে দাঁড়াল কুয়াশা। ড. ইভানোভিচের হত্যা-রহস্য ভেদ করতে হবে ওকে। নিজ হাতে শাস্তি দিতে হবে পিতৃসম মানুষটির খুনিকে। রাশান পুলিশ যে কিছু করতে পারছে না, তা তো খবরের কাগজেই লিখেছে। যা করার করতে হবে ওকেই। কারণ পুলিশের পদ্ধতিতে এগোবে না কুয়াশা। অন্ধকার জগতের মানুষ ও, অন্ধকার জগতের সূত্র ধরে এগোবে। ড. ইভানোভিচের সঙ্গে বছরখানেক কাটিয়েছে কুয়াশা রাশায়। তখন সে-দেশের অপরাধীদের সঙ্গে নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে ও। আজ সময় এসেছে তার সদ্ব্যবহার করার।

সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেছে। সরোদ তুলে রাখল কুয়াশা। আলমারি থেকে বের করে আনল নিজের কালো পোশাক আর পিস্তল।

মস্কো, রাশা। দশ দিন পর।

ভারী তুষারপাত হচ্ছে গত ক'দিন ধরে। জনজীবন বিপর্যস্ত। আজ সন্ধ্যায় দমকা হাওয়া বইছে। তুষারের বড় বড় ঝাপটা ধীরে ধীরে ঢেকে ফেলছে রেড স্কয়্যারকে। কাল সকাল নাগাদ অন্তত দু'ফুট বরফের স্তর পড়ে যাবে রাস্তাঘাটে।

রেড স্কয়্যার থেকে তিন কিলোমিটার দূরে রয়েছে একটি আবাসিক এলাকা। স্বল্প আয়ের লোকজন থাকে ওখানে। ওখানকার একটা অ্যাপার্টমেন্টের সামনে এসে দাঁড়াল ট্যাক্সি। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে বেঁটে-খাটো একজন মানুষ নেমে এল। চুল ধূসর। সাধারণ কাপড়চোপড়। বয়স ষাট ছাড়িয়ে গেছে। মুখে বলিরেখা। পরিশ্রান্ত চেহারা। তার ওপর কনকনে শীত। দাঁড়িয়ে

থাকতে রীতিমত যুদ্ধ করতে হচ্ছে মানুষটাকে। তারপরেও অভ্যাসবশত চারপাশে নজর বুলিয়ে নিতে ভুলল না। সন্তুষ্ট হয়ে ঢুকে পড়ল বিল্ডিঙের ভিতর। এলিভেটর ব্যবহার করল না, এগিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে।

সিঁড়ির ধাপগুলো শুকনো। ধীরে ধীরে ধাপ বেয়ে উঠতে শুরু করল বৃদ্ধ। প্রতিটি ল্যাণ্ডিঙে থামল, পকেট থেকে টর্চ বের করে আরেক প্রস্থ সিঁড়ির সব ক'টা ধাপ দেখে নিল আলো ফেলে। থাকার কথা নয় অথচ আছে, এই রকম ছায়া খুঁজছে। ছয়তলায় উঠে নিজের দরজার সামনে আবার একবার থামল। এরপর ওপর দিকে উঠে গেছে সিঁড়ি, শেষ মাথায় কেয়ারটেকারের ঘর। টর্চের আলোয় দেখা গেল সাততলায় উঠে যাবার প্রথম প্রস্থ সিঁড়িতে, বাঁকের এদিক পর্যন্ত পায়ের কোনও দাগ নেই। জানে, স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার জন্যে মুরমানস্কে গেছে কেয়ারটেকার। পকেট থেকে চাবি বের করে তালার ফুটোয় ঢোকাতে যাবে, এমন সময় শিরদাঁড়ার ওপর শক্ত কিছু ঠেকল। পরিষ্কার রুশ ভাষায় কথা বলল পিছনের মানুষটা। উচ্চারণে হালকা বিদেশি টান।

'সাবধান, মি. ভাদিম। আমার হাতে এটা পিস্তল, গুলি করতে দ্বিধা করব না। কাজেই সাবধান... মরতে চাইলে লাফ-ঝাঁপ দিতে পারেন। নইলে ল্যাণ্ডিঙের আলোটা জ্বালুন। পিছন ফেরার চেষ্টা করবেন না।'

বয়স যে দক্ষতায় মরচে ধরিয়ে দেয়, তার প্রমাণ পেল ভাদিম। তার হাতে এই মুহূর্তে পিস্তল থাকা উচিত ছিল, কিন্তু রয়েছে টর্চ। সাধারণ সতর্কতা অবলম্বন করতেও ভুল করে বসে আছে সে। টর্চ ধরা মুঠোটা একটু শক্ত হলো। এটাকেই হাতিয়ার হিসেবে কাজে লাগাবার চেষ্টা করবে নাকি? কিন্তু মাথায় চিন্তাটা আসার সঙ্গে সঙ্গে ঝেড়ে ফেলে দিল বৃদ্ধ। পিছনে দাঁড়ানো

লোকটা নিজের কাজ বোঝে, ওর শিরদাঁড়ার উপর পিস্তলের মাজল এমন শক্ত ভাবে ঠেকিয়ে রেখেছে, যেন গোলমেলে নড়াচড়ার প্রথম আভাস পাওয়া মাত্র ট্রিগার টিপে দেয়া যায়।

দেয়াল হাতড়ে সুইচবোর্ডটা স্পর্শ করল ভাদিম, বোতাম টিপে ল্যাণ্ডিঙের আলো জ্বালল। কম পাওয়ারের বাল্‌ব, ম্লান আলো।

'ভিতরে ঢুকব আমরা,' বলল লোকটা। পরিণত, পরিশীলিত কণ্ঠস্বর। গলার আওয়াজেই বোঝা যায়, একজন অভিজ্ঞ লোক, কঠিন পাত্র। 'অস্থির হবার দরকার নেই। ধীরে-সুস্থে তালা খুলুন—খুব সাবধানে। তারপর আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকুন।'

ত্রিশ সেকেণ্ড পর ভাদিমের বুক আর পেটের মাঝখানে পিস্তল তাক করে ছোট বেডরুমের ভিতর ঢুকল কালো পোশাক পরা দীর্ঘদেহী লোকটা। একটা পায়ে সম্ভবত সমস্যা আছে তার, ছড়িতে ভর দিয়ে হাঁটছে। তার অনুরোধে বোতাম টিপে বেডসাইড টেবিল ল্যাম্পটা জ্বালল ভাদিম।

লোকটা জানতে চাইল, 'ওভারহেড লাইটটা জ্বাললেন না কেন?'

'এক সুইচেই দুটো আলো জ্বলে,' বলল ভাদিম। 'ওটা নষ্ট হয়ে গেছে।'

মাথা ঝাঁকাল লোকটা। আলো জ্বেলে পিছিয়ে গেছে ভাদিম, কিন্তু দরজার কাছ থেকে এগিয়ে এসে দূরত্বটাকে সমান করে নেয়নি প্রতিপক্ষ। ঘরের ভিতর নড়াচড়ার জায়গা একেবারেই কম, তার ওপর লোকটার হাতের পিস্তল এক চুল নড়ছে না, হঠাৎ কিছু করে বসার চিন্তাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিল ভাদিম। লোকটা স্বাস্থ্যবান, সুদর্শন। বেশ লম্বা... প্রায় ছ'ফুট, চোখদুটো সতর্ক এবং বুদ্ধিদীপ্ত। বয়স ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে।

কুচকুচে কালো রঙের হ্যাট আর লেদার কোট পরে আছে। ইঙ্গিতে বসতে বলল বন্দিকে। বিছানার ধারে বসল ভাদিম।

বলল, 'যদি ডাকাতি করার আশায় এসে থাকো, হতাশ হতে হবে তোমাকে। আমার কাছে টাকাপয়সা বা দামি জিনিস... কিছুই নেই।'

'আপনি খুব ভাল করেই জানেন, আমি ডাকাত নই।' শান্ত গলায় বলল লোকটা।

'তা হলে রাতদুপুরে এটা কী ধরনের রসিকতা, আশা করি তুমি নিজেই সেটা আমাকে ব্যাখ্যা করে বলবে। তার আগে, যদি অনুমতি দাও, গা থেকে কোটটা খুলতে চাই আমি। দেখতেই পাচ্ছ, তুষার লেগে ভিজে গেছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে অনুমতি দিল লোকটা, এবার আর সতর্ক করে দিল না। সাবধানে, ধীরে ধীরে কোট খুলল ভাদিম, তার প্রতিটি নড়াচড়া ঠাণ্ডা চোখে লক্ষ করল প্রতিপক্ষ। খুব যে শক্ত করে ধরে আছে পিস্তলটা তা নয়, কিন্তু হাত আর আঙুল এমন আশ্চর্য স্থির হয়ে আছে যে মাজলটা এক চুল নড়ছে না। আগেই লক্ষ করেছে বৃদ্ধ, লোকটার কোটের পকেট থেকে উঁকি দিয়ে আছে একজোড়া রাবারের জুতো। কীভাবে ভিতরে ঢুকেছে, এ থেকে বোঝা যায়। রাস্তার দিকের দরজা খোলার জন্যে নিশ্চয়ই স্কেলিটন কী ব্যবহার করেছে সে, তারপর জুতো খুলে দোর-গোড়ার চাতাল টপকেছে, তুষারে পা ফেলেনি। এমন একজন লোক যার সমস্ত দিকে খেয়াল আছে।

বিছানা ছাড়া ঘরের আরেকটা ভারী ফার্নিচার হলো ওয়ার্ডরোব, অত্যন্ত সাবধানে সেটার বাইরের দিকের একটা হুকে কোটটা ঝুলিয়ে রাখল ভাদিম। কোটটা ঝোলাবার সময় লক্ষ রাখল, একদিকের পকেট যেন বাইরের দিকে থাকে, যেটায় তার

পিস্তল রয়েছে।

'আপনার কোটের ভিতর একটা পিস্তল আছে, মি. ভাদিম,' পিছন থেকে বলল লোকটা। 'সাবধানে বের করে আনুন ওটা, তারপর ঘরের কোণে ছুঁড়ে ফেলুন।'

এই যা, বুদ্ধিটা কাজে লাগল না। বিড়বিড় করে ভাগ্যকে গালমন্দ করল বৃদ্ধ। একই সঙ্গে মনে মনে প্রশংসা করল প্রতিপক্ষের। নজর বটে লোকটার!

পিস্তলটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে দীর্ঘদেহীর মুখোমুখি হলো ভাদিম। কড়া গলায় জানতে চাইল, 'এসবের মানে কী?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না, পিছিয়ে গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়াল লোকটা, ধীরে ধীরে শরীরটা ঘোরাল সে, কিন্তু ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে থাকল বৃদ্ধের দিকে। বেডরুম থেকে বেরিয়ে যাবার এই একটাই দরজা, পকেট থেকে চাবি বের করে তালা লাগিয়ে দিল সেটায়। শরীরটা আবার ঘুরিয়ে নিল সে। দরজার কবাটে হেলান দিয়ে বলল, 'আপনার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে, মি. ভাদিম ...এবং আমি জানি, ঠিকমত প্রেশার সৃষ্টি করতে না পারলে কোনও ইনফরমেশনই দেবেন না আপনি। পিস্তল... হুমকি... এসব আপনার মুখ খোলাবার উপলক্ষ্যমাত্র।'

'কী বলছ আবোল-তাবোল!' বিরক্ত গলায় বলল ভাদিম। 'কীসের ইনফরমেশন? আমি বুড়ো মানুষ, রিটায়ার্ড লাইফ কাটাচ্ছি...'

'যাক, শুরুটা সত্য কথা দিয়ে করলেন,' বাধা দিয়ে বলল লোকটা। 'সত্যিই রিটায়ার্ড আপনি।'

'তুমি জানো, আমি কে?' ভুরু কোঁচকাল ভাদিম।

'অবশ্যই,' মাথা ঝাঁকাল পিস্তলধারী। 'কর্নেল লিও ভাদিম, রিটায়ার্ড। এক্স-স্পেৎনাজ, এক্স-কেজিবি। সোভিয়েত আমলে

ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটির টপ লেভেলের ইনফরমেশন গ্যাদারার ছিলেন। বলা হতো, আপনার চোখ-কান ফাঁকি দিয়ে একটা হাঁচিও দিতে পারে না কেউ। এমনই ছিল আপনার নেটওঅর্ক। ঠিক?'

বুঝতে পারল ভাদিম, এ-লোক তার ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়ে এসেছে। অস্বীকার করে লাভ হবে না কোনও। তাই গম্ভীর গলায় বলল, 'অতীত খোঁচাচ্ছ তুমি। এখন কী চাই?'

'বলেছি তো, ইনফরমেশন। গত কিছুদিনে খুব ভালমত খোঁজখবর নিয়েছি। আমার কণ্ট্যাক্টরা বলেছে, যদি কেউ আমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারে, সে কেবল আপনি।'

'হেঁয়ালির মত শোনাচ্ছে তোমার কথাবার্তা। কীসের প্রশ্ন তোমার? কী এমন জিনিস জানতে চাইছ, যা আমি ছাড়া আর কেউ বলতে পারবে না?'

'খুব সাধারণ একটা প্রশ্ন—ড. ইলিয়া ইভানোভিচকে কে খুন করেছে?'

'ড. ইভানোভিচ?' একটু যেন চমকে উঠল ভাদিম। 'তা আমি কী করে বলব? পুলিশকে জিজ্ঞেস করো।'

'কথা ঘোরাবার চেষ্টা করবেন না, মি. ভাদিম,' কঠিন শোনাল দীর্ঘদেহীর কণ্ঠ। 'সরাসরি জবাব দিন আমার প্রশ্নের।'

'জানলে না জবাব দেব! রিটায়ার্ড মানুষ, সেই কবে ইন্টেলিজেন্সের কাজ ছেড়ে দিয়েছি... আমাকে এসব জিজ্ঞেস করার মানে কী?'

'আপনি শুধু চাকরি ছেড়েছেন, মি. ভাদিম। পেশা ছাড়েননি। ও-পথে একবার পা দিলে কেউ কোনোদিন সরে আসতে পারে না। এখনও আপনি গোটা রাশায় সবচেয়ে বড় তথ্যের ভাণ্ডার। সরকারি দফতরের খবরাখবরই হোক, বা আণ্ডারওয়ার্ল্ডের... সব

রয়েছে আপনার হাতের মুঠোয়। প্লিজ, আমাকে ধোঁকা দেবার চেষ্টা করবেন না। ভালয় ভালয় সবকিছু খুলে না বললে আমি কঠোর হতে বাধ্য হব। সে-ধরনের প্রস্তুতি নিয়েই এসেছি।'

'টরচার করবে?'

'প্রয়োজন হলে... হ্যাঁ।'

তীক্ষ্ণচোখে মানুষটার মুখভঙ্গি যাচাই করল ভাদিম। নিশ্চিত হলো, মিথ্যে হুমকি দিচ্ছে না। তাই দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'কে তুমি? কেন এসব করছ?'

'কুয়াশা আমার নাম। ড. ইভানোভিচ ছিলেন আমার বাবার মত। তাঁর খুনিকে তাই নিজ হাতে শাস্তি দেব বলে ছুটে এসেছি বাংলাদেশ থেকে।'

ফ্যাকাসে হয়ে গেল বৃদ্ধের চেহারা। ফিসফিসিয়ে বলল, 'তুমি... তুমিই কুয়াশা?'

'আপনি আমাকে চেনেন?'

'নামে। শুধু আমি না, আরও অনেকেই চেনে,' বলল ভাদিম। 'এতক্ষণে... এতক্ষণে সব পরিষ্কার হচ্ছে। এবার বুঝতে পারছি কেন ওরা...'

'কী বলছেন! কী পরিষ্কার হচ্ছে?'

কুয়াশার চোখে চোখ রাখল ভাদিম। 'আজ সকালে খবর এসেছে আমার কাছে—ড. ইলিয়া ইভানোভিচের খুনের দায়ে তোমার নামে হুলিয়া জারি করতে যাচ্ছে রাশান পুলিশ। একগাদা প্রমাণ নাকি একাট্টা করেছে ওরা।'

'হোয়াট!' চমকে উঠল কুয়াশা। 'আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ! কীসের প্রমাণ? আমি তো খুন করিনি ড. ইভানোভিচকে।'

'তা জানি আমি,' বলল ভাদিম। 'বলির পাঁঠা বানানো হচ্ছে তোমাকে। ইউ সি, ইভানোভিচের সঙ্গে তোমার কানেকশনের

ব্যাপারে বহু আগে থেকেই জানি আমরা। ওতে একটু রং চড়ানো হলে দু-চারটা এভিডেন্স পয়দা করতে অসুবিধে হবার কথা নয়। আমি শুধু বুঝতে পারছিলাম না, দুনিয়ায় এত লোক থাকতে তোমাকে কেন ফাঁসাতে চাইছে ওরা। এখন সেটাও পরিষ্কার হয়ে গেছে।'

'খুনটার ব্যাপারে খোঁজখবর নিচ্ছি বলে?'

'একজ্যাক্টলি। নিজের পায়ে কুড়াল মেরেছ তুমি, কুয়াশা। ওরা কিছুতেই তোমাকে ছাড়বে না।'

'কী বলছেন আপনি, কিছুই বুঝতে পারছি না,' বিস্মিত গলায় বলল কুয়াশা। 'কারা আমাকে ছাড়বে না?'

'কর্সিকানরা।'

'কর্সিকান মানে?'

'ফেনিস... মানে, ফিনিক্স গোপন সংঘ। ওদের নিজস্ব লোকজনের বাইরে একমাত্র আমিই সম্ভবত জানি সংঘটার কথা। কিন্তু কোনোদিন সেটা প্রকাশ করার সাহস করিনি। কিন্তু আজ... এখানে এসে তুমি সব গোলমাল করে দিয়েছ, কুয়াশা। কোনও সন্দেহ নেই, এবার আমাকে মরতে হবে। ফেনিস-চক্রের লোকজন কিছুতেই তাদের খবর ফাঁস হতে দেবে না।'

'আপনার কথাবার্তা আমার কাছে হেঁয়ালির মত মনে হচ্ছে, মি. ভাদিম। কীসের ফেনিস? কীসের গোপন সংঘ?'

উঠে দাঁড়াল ভাদিম। জানালার কাছে গিয়ে বাইরে তাকাল। নীরবে কিছু ভাবল কয়েক মুহূর্ত। তারপর ঘুরল কুয়াশার দিকে। 'ঠিক আছে, সবকিছু খুলে বলব তোমাকে। এখন আর গোপন রেখে লাভ নেই কোনও। তুমি-আমি দু'জনেই মরা মানুষ, কুয়াশা। যাবার আগে অন্তত এটুকু জেনে যাও, কী কারণে মরতে চলেছ।'

বৃদ্ধের পাগলাটে কথাবার্তার কোনও আগামাথা খুঁজে পাচ্ছে না কুয়াশা। তবু ধৈর্য ধরার সিদ্ধান্ত নিল। দেখা যাক, কী বলতে চায় লোকটা।

আবার বিছানায় এসে বসল ভাদিম। বলল, 'কিছুদিন আগে ওয়ার্নার নামে এক জেনারেল খুন হয়েছে আমেরিকায়, এটা জানো?'

মাথা ঝাঁকাল কুয়াশা। 'হ্যাঁ, শুনেছি। ওদের জয়েন্ট চিফ অভ স্টাফ। কেন?'

'জেনারেল ওয়ার্নারের খুন, আর ড. ইভানোভিচেরটা... একই দলের কাজ।'

'ফেনিস না কী যেন বললেন, ওদের?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু কেন?'

'সঠিক কারণ আমি জানি না। তবে ধারণা করছি, সম্ভবত ওদের দলে যোগ দিতে রাজি হননি ওঁরা; তাই এমন পরিণতি বরণ করে নিতে হয়েছে।'

'একটা গুপ্তসংঘে যোগ দিতে রাজি হবেন না বলে এমন হাই লেভেলের দু'জন মানুষকে খুন করে ফেলা হবে?' অবিশ্বাস ফুটল কুয়াশার কণ্ঠে। 'অ্যাবসার্ড।'

'মোটেই না,' বলল ভাদিম। 'সাধারণ কোনও সংঘ নয় ফেনিস। দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী, সবচেয়ে বড়, আর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর সংগঠন ওরা। নিজেদের লুকিয়ে রাখার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি রকমের সতর্ক। নিজের অবস্থা দেখে কিছু বুঝতে পারছ না? ড. ইভানোভিচের ব্যাপারে খোঁচাখুঁচি করছ, তাতেই তোমাকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে ওরা। তুমি ওদের সম্পর্কে কোনও ধরনের তথ্যপ্রমাণ পাবার আগেই!'

'তা হলে আপনি বেঁচে আছেন কীভাবে?'

'কারণ এতদিন মুখ বন্ধ রেখেছি আমি। আমাকে থ্রেট বলে মনে করেনি ওরা। কিন্তু জেনারেল ওয়ার্নার আর ড. ইভানোভিচ নিশ্চয়ই কাউকে সব খুলে বলতে যাচ্ছিলেন। বিশেষ করে ইভানোভিচের ব্যাপারটা জানা আছে আমার। রাশান আর্মির একজন কর্নেল আর সরকারি একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে নিজের খামারবাড়িতে দাওয়াত দিয়েছিলেন তিনি। সম্ভবত ফেনিসের ব্যাপারে আলোচনা করবার জন্য। কেউই প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারেনি ওখান থেকে। এর অর্থ পরিষ্কার।'

'আপনাকে আরও খোলাসা করে সব বলতে হবে, মি. ভাদিম। ওই ফেনিস না ফিনিক্স কী যেন বললেন... কী ধরনের সংগঠন ওরা?'

'বেসিক্যালি ওরা খুনি। মানুষ খুন করাই ওদের পেশা। শুরুতে টাকার বিনিময়ে গুপ্তহত্যা চালাত, মাঝে বহু বছরের জন্য গায়েব হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন আবার ফিরে এসেছে... আগের চেয়েও কয়েক গুণ ভয়ঙ্কর হয়ে। পার্থক্য হলো, এখন আর টাকার বিনিময়ে কাজ করছে না ওরা। সব করছে নিজেদের ইচ্ছে অনুসারে। বিচারবুদ্ধিহীন হত্যাকাণ্ড—গুমখুন, প্লেন-হাইজ্যাকিং, বোমা-হামলা... আপাতদৃষ্টিতে কোনও প্যাটার্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না এসবের মধ্যে। কিন্তু ভালমত তাকালে বোঝা যায়, কাজের ধারা অত্যন্ত নিখুঁত, এবং হাইলি প্রফেশনাল।'

'আপনি টেরোরিজমের কথা বলছেন।'

'এক অর্থে হ্যাঁ। দুনিয়ার সমস্ত টেরোরিস্ট অর্গানাইজেশনকে চালায় ওরা—প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে। সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করে, অথবা টাকার জোগান দেয়। আল-কায়েদা, বাদের-মেইনহফ, নয়া রেড ব্রিগেড... সবাই ফেনিসের কথামত চলে।'

'অসম্ভব। দুনিয়াব্যাপী টেরোরিস্টদের কোনও সেণ্ট্রাল কণ্ট্রোল আছে বলে শুনিনি আমি।'

'আছে, কুয়াশা... আছে। বিশ্বাস করো, কিংবা না-ই করো। ফেনিসের নেটওয়ার্ক যে কত বড়, আর কত শক্তিশালী, তার কিছুই জানা নেই তোমার। শুধু টেরোরিস্টরা নয়, দুনিয়ার সমস্ত বড় বড় দেশের সরকারে বসে আছে ওদের লোক—আমেরিকা, রাশা, চিন, কোরিয়া, ইটালি, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড... সবখানে!'

'ব্যাপারটা পরস্পরবিরোধী হয়ে গেল না?' ভুরু কোঁচকাল কুয়াশা। 'যদি বড় বড় সরকার ওদের নিয়ন্ত্রণে থাকে, তা হলে আবার টেরোরিস্টদেরকে কী দরকার?'

'ভাল প্রশ্ন, কিন্তু উত্তরটা আমার জানা নেই,' বলল ভাদিম। 'ওদের কাজকর্মের কোনও আগামাথা খুঁজে পাইনি আমি কখনও। কী ঘটাচ্ছে, তা জানতে পারছি; কিন্তু কেন ঘটাচ্ছে, তার কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। নির্দিষ্ট একটা লক্ষ্য নিশ্চয়ই আছে ওদের—কী সেটা, একমাত্র ঈশ্বর জানেন।'

সোজা হয়ে দাঁড়াল কুয়াশা। 'আমার কেন যেন মনে হচ্ছে, জুজুর ভয় দেখাচ্ছেন আপনি। এমন কোনও সংগঠন থাকলে তার ব্যাপারে কানাঘুষো হলেও শোনা যেত এতদিনে। আপনার হাতে কোনও প্রমাণ আছে?'

'সোভিয়েত আমলে একজন গুপ্তঘাতককে পাকড়াও করেছিল কেজিবি। বুকে গোল একটা উল্কি ছিল তার—ওটাই ফেনিসদের চিহ্ন। লোকটাকে ইন্টারোগেট করেছিলাম আমি, কেমিক্যাল ইনজেক্ট করে পেট থেকে বের করে নিয়েছিলাম সব কথা। সে-বারই প্রথম ফেনিস সম্পর্কে জানতে পারি আমি।'

'সেই লোক এখন কোথায়?'

'কবরে। কেজিবি হেডকোয়ার্টারের ভিতরে... স্পেশাল

হোল্ডিং সেলে ঢুকে তাকে জবাই করা হয়। আজ পর্যন্ত খুনির পরিচয় জানা যায়নি।'

'তা হলে ওটাই আপনার প্রমাণ?' বাঁকা সুরে বলল কুয়াশা। 'খুন হয়ে যাওয়া একজন গুপ্তঘাতক? এমন হতে পারে না, কেমিক্যালের প্রভাবে প্রলাপ বকছিল লোকটা?'

'না, কুয়াশা। কারণ শুধু ওকেই নয়, লোকটার গ্রেফতার এবং ইন্টারোগেশনের সঙ্গে জড়িত প্রতিটা মানুষ পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর মারা গিয়েছিল—অদ্ভুত সব অ্যাকসিডেন্টে!'

'আপনি ছাড়া।'

'হ্যাঁ, আমি ছাড়া। কারণ নিজস্ব কণ্ট্যাক্টদেরকে কাজে লাগিয়েছিলাম আমি, ফেনিসের কাছে খবর পাঠিয়েছিলাম, আমাকে বাঁচতে দিলে ওদের হয়ে কাজ করব। করেছিও তা-ই—ওই বন্দির কাছ থেকে পাওয়া সমস্ত তথ্য চেপে গিয়েছিলাম, ভুয়া একটা রিপোর্ট জমা দিয়েছিলাম বসদের কাছে। যতদিন কেজিবিতে ছিলাম, ততদিন নানা ধরনের তথ্য পাচার করেছি ফেনিসের কাছে।'

চমকে উঠল কুয়াশা। 'কী বললেন? আ... আপনি ফেনিসের লোক?'

'ছিলাম,' ম্লান হয়ে উঠল ভাদিমের চেহারা। ধীরে ধীরে নিজের শার্টের বোতাম খুলল সে, উন্মুক্ত বুক দেখাল কুয়াশাকে। সেখানে একটা বৃত্তাকার উল্কি।

কয়েক মুহূর্তের জন্য নির্বাক হয়ে গেল কুয়াশা। নিজেকে সামলে নিয়ে যখন মুখ খুলতে যাবে, তখুনি একসঙ্গে ঘটে গেল অনেককিছু।

আচমকা বিকট শব্দ করে ভেঙে পড়ল বেডরুমের জানালার কাঁচ, সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকি খেয়ে আড়ষ্ট হয়ে গেল ভাদিম। চোখদুটো

দেখে মনে হলো পিংপং বল, এখনই লাফ দিয়ে কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসবে। সাদা শার্টে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে টকটকে লাল রং। চমকে গিয়ে পিছনটা দেখল কুয়াশা। ভাঙা জানালা দিয়ে ছুটে এসেছে বুলেট, বিছানায় বসে থাকা বৃদ্ধের মেরুদণ্ডের হাড় গুঁড়িয়ে দিয়েছে।

কাত হয়ে বিছানায় পড়ে গেল ভাদিম, সঙ্গে সঙ্গে মেঝেতে ঝাঁপ দিল কুয়াশা। পরমুহূর্তে জানালা ভেদ করে ছুটে এল আরও একটা বুলেট। কুয়াশাকে না পেয়ে বেডরুমের দেয়ালের পলেস্তারা খসাল ওটা।

হামাগুড়ি দিয়ে বিছানার পাশে চলে গেল কুয়াশা, শরীর জাগাল না, শুধু হাত তুলে খামচে ধরল গুলিবিদ্ধ ভাদিমের কোট, টান দিয়ে তাকে নামিয়ে আনল মেঝেতে। আছাড় খেয়ে ককিয়ে উঠল বৃদ্ধ। ততক্ষণে আরও দু'বার গুলি করেছে আততায়ী। কামরার আসবাবপত্রে আঘাত হেনে কর্কশ শব্দ তুলল বুলেট।

'মি. ভাদিম! মি. ভাদিম!!' বৃদ্ধকে ঝাঁকি দিয়ে ডাকল কুয়াশা।

বহুকষ্টে চোখ খুলল রাশান গুপ্তচর। মুখে তিক্ত একটা হাসি ফুটিয়ে বলল, 'বলেছিলাম না, আমরা দু'জনেই মরা মানুষ? ফেনিসের লেজে পা দিয়ে কেউ বাঁচতে পারে না।'

'কিচ্ছু হয়নি আপনার,' বলল কুয়াশা। 'একটু শক্ত থাকুন, আপনাকে আমি হাসপাতালে নিয়ে যাব।'

'মিথ্যে আশা দেয়ার প্রয়োজন নেই, কুয়াশা,' দুর্বল গলায় বলল ভাদিম। 'আমার সময় শেষ। তোমারও!'

'না, কিছুই শেষ হয়নি,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল কুয়াশা। 'যারাই জড়িত থাকুক এর পিছনে, তারা শাস্তি পাবে। আমাকে শুধু বলুন, কীভাবে ফেনিসের নাগাল পাওয়া যাবে?'

'কর্সিকায় যেতে হবে... মানে, যদি এখান থেকে প্রাণ নিয়ে বেরোতে পারো...' কষ্টেসৃষ্টে বলল ভাদিম। কেশে উঠল, মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল তাজা রক্ত। রুমাল দিয়ে কুয়াশা রক্তটা মুছে দিলে ফিসফিসাল, 'কর্সিকায় শুরু হয়েছিল সব। ত্রিশের দশকে... কাউন্ট গিলবার্তো বারেমির হাতে। সে-ই ফেনিসের জন্মদাতা। সে আর তার কাউন্সিল। যদি কোনও সূত্র থাকে, কর্সিকাতেই আছে সেটা। যাও কুয়াশা, আমার জন্য আর সময় নষ্ট কোরো না। যদি পারো, ঠেকাও ওদেরকে...'

বলতে বলতে কেঁপে উঠল বৃদ্ধ, তারপর নিথর হয়ে গেল। পালস চেক করল কুয়াশা, সব শেষ। মারা গেছে রাশান গুপ্তচর। চোয়াল শক্ত হলো ওর।

জানালার ওপাশ থেকে এখনও গুলি হচ্ছে। সম্ভবত রাস্তার উল্টোপাশের বিল্ডিঙে পজিশন নিয়েছে স্নাইপার। দূরে পুলিশের সাইরেনের মৃদু ওঁয়াওঁ-ওঁয়াওঁ শুনতে পেল ও। তাগিদ অনুভব করল, এখুনি সরে যেতে হবে এখান থেকে। ধরা পড়া চলবে না পুলিশের হাতে।

হামাগুড়ি দিয়ে বেডরুমের দরজার কাছে চলে গেল কুয়াশা। হাত তুলে নব ঘোরাল, বেরিয়ে এল কামরা থেকে। স্নাইপারের নাগালের বাইরে চলে এসেছে, ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল ও। দ্রুত পা চালিয়ে বেরিয়ে পড়ল অ্যাপার্টমেণ্ট থেকে। কিন্তু ল্যান্ডিঙে পা রেখেই চমকে উঠল। সিঁড়ি ধরে উঠে আসছে ষণ্ডামার্কা দুই লোক। ডানদিকের লোকটার হাতে একটা রেডিও, মুখের কাছে নিয়ে নিচুস্বরে কিছু বলে উঠল। বাঁ দিকের লোকটার ডানহাত পরনের ওভারকোটের ভিতরে। হাতটা বেরিয়ে আসতেই কালো রঙের পয়েণ্ট থ্রি এইট ক্যালিবারের অটোমেটিক পিস্তলটা দৃশ্যমান হলো, বিকটদর্শন একটা সাইলেন্সারও লাগানো আছে। দৌড়ে

আসছে ওরা।

ভাবনা-চিন্তার সময় নেই, নিজের পিস্তল তুলে লোকগুলোর দিকে একটা গুলি ছুঁড়ল কুয়াশা। ফলাফল দেখার অপেক্ষা করল না, পাশ ঘুরে ছুটল ল্যাণ্ডিঙের অন্যপ্রান্তের দিকে। ওখানে একটা পুরনো আমলের এলিভেটর আছে। বোতামে চাপ দিয়ে আবার গুলিবর্ষণ করল শত্রুদের দিকে। সিঁড়িতে নেমে পড়ে কাভার নিয়েছে ওরা, গুলি লাগানো গেল না। তাতে অবশ্য অসুবিধে নেই, লোকদুটো কাছ ঘেঁষতে না পারলেই হলো।

এলিভেটরের দরজা যখন খুলল, ততক্ষণে ম্যাগাজিন খালি করে ফেলেছে কুয়াশা। দেরি না করে ঢুকে পড়ল ভিতরে। লক্ষ করল, লোকদুটো বেরিয়ে এসেছে, ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে ওর দিকে। ঠেকানোর উপায় রইল না, এলিভেটরের দরজা বন্ধ হয়ে যাবার আগেই ভিতরে ঢুকে পড়ল রেডিওঅলা, পিস্তলধারীও অস্ত্রসহ হাতটা ঢুকিয়ে দিয়েছে দুটো পাল্লার মাঝখানে। নিমেষে ঘূর্ণিঝড় বয়ে গেল।

বিদ্যুৎ খেলে গেল কুয়াশার শরীরে। ডানদিকে হেলান দিয়ে বাঁ পা-টা অর্ধচন্দ্রাকৃতিতে সামনের দিকে ছুঁড়ে দিল, শরীর ঘুরে গেল আধপাক। মাঝপথে পা-টা আঘাত করল দরজার ফাঁকে ঢুকিয়ে দেয়া হাতটার গোড়ায়। দুপ্ দুপ্ করে পর পর দু'বার শব্দ হলো, এলিভেটরের সিলিঙে ঢুকেছে গুলিদুটো। ছিটকে পিছনে পড়ে গেছে লোকটা। বন্ধ হয়ে গেছে এলিভেটরের দরজা। সেজন্যে থেমে রইল না সময়, উড়ে গিয়ে পড়ল কুয়াশা দ্বিতীয় শত্রুর উপর। ওর কাঁধ রেডিওঅলার তলপেটে আঘাত করল, একহাতে বুক খামচে ধরেছে, অন্যহাতে দেয়ালের সঙ্গে ঠেসে ধরেছে রেডিওধরা হাতটা। হাত থেকে যন্ত্রটা ছিটকে পড়ল মেঝেতে।

পুরো ঘটনা ঘটে যেতে দু'সেকেণ্ডের বেশি লাগল না। রেডিওঅলা এতই অবাক হয়েছে যে আর্তনাদ করতেও ভুলে গেছে। এ-ধরনের প্রতিরোধ আশাই করেনি। লোকটাকে ওর সামনে নিয়ে এল কুয়াশা, বাঁ হাতে পেঁচিয়ে ধরেছে গলা, ডান হাতে প্রচণ্ড জোরে মুচড়ে ধরেছে একটা কান।

'নীচে ক'জন অপেক্ষা করছে?' রুশ ভাষায় জিজ্ঞেস করল কুয়াশা। এলিভেটর ইতোমধ্যে গ্রাউণ্ড ফ্লোরের দিকে নামতে শুরু করেছে।

'নিজেই গিয়ে গুনে দ্যাখ্, শুয়োরের বাচ্চা!'

নীচের দিকে চাপ দিয়ে মাথাটা এলিভেটরের ধাতব দেয়ালে ঠুকে দিল কুয়াশা, কানটা গোড়া থেকে অর্ধেক ছিঁড়ে এসেছে। বুকফাটা আর্তনাদ করে উঠল রেডিওঅলা। উপুড় হয়ে লুটিয়ে পড়ল মেঝেতে এক ঝটকায় তাকে চিৎ করে দিল কুয়াশা। বুকের উপর হাঁটু রেখে চেপে ধরল মেঝের সঙ্গে। হাঁটুতে হোলস্টারের স্পর্শ পেতেই হাত ঢুকিয়ে একটা রিভলবার বের করে আনল, এটায় সাইলেন্সার লাগানো নেই। ওটার ব্যারেল ঠেকাল প্রতিপক্ষের কপালে।

'জবাব দাও, নইলে এখুনি খুলি উড়িয়ে দিচ্ছি,' হিংস্র শোনাল কুয়াশার গলা। 'ক'জন আছে নীচে?'

এবার ভয় ফুটল লোকটার চেহারায়। কাঁপা কাঁপা গলায় বলল, 'দু'জন। একজন এলিভেটরের সামনে, অন্যজন বাইরে ফুটপাতে গাড়ির পাশে।'

'কী রকম গাড়ি?'

'ফোক্সওয়াগেন।'

'রঙ?' কমে এসেছে এলিভেটরের গতি, পৌঁছে গেছে নীচতলায়।

'কালো।'

'বাইরের লোকটা... ও কী পরে আছে?'

'জানি না...'

রিভলবারের বাট দিয়ে চাঁদিতে মাঝারি একটা আঘাত করল কুয়াশা। 'মনে করার চেষ্টা করো!'

'গ্রেটকোট... খয়েরি রঙের গ্রেটকোট পরে আছে।'

থেমে গেল এলিভেটর। রেডিওঅলার কোটের গলার ধরে দাঁড় করিয়ে দিল কুয়াশা। খুলে গেল দরজা। বাঁ পাশ থেকে উদয় হলো কালো পোশাকধারী এক লোক, চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। রেডিওঅলার কপাল আর কানের পাশ দিয়ে নামতে থাকা রক্তের ধারা লক্ষ করে সতর্ক ভঙ্গিতে এক পা পিছিয়ে গেল। বাঁ হাতটা কোটের পকেটে, বিপজ্জনক ভঙ্গিতে পকেটসহ-ই উঠে যাচ্ছে উপরদিকে। আর একটা সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল!

রেডিওঅলার শরীরটাকে বর্মের মত সামনে ধরে রেখে এলিভেটর থেকে বের হলো কুয়াশা। খুক্ খুক্ কাশির মত তিনটে শব্দ হলো। শেষবারের মত আর্তনাদ করে উঠল রেডিওঅলা, বুক রক্তাক্ত হয়ে গেছে। তাকে চশমাঅলার দিকে ছুঁড়ে দিল কুয়াশা, প্রাণহীন দেহটার ভারে হুড়মুড় করে পড়ে গেল সে, পিস্তলধরা হাতটা চাপা পড়ল দুই দেহের মাঝখানে।

লোকটার দিকে এগোতে গিয়েও থেমে গেল কুয়াশা। বুঝতে পারল, কেন ব্যাটা পিস্তল বের করেনি, কেন পকেট থেকেই গুলি করেছে। বিল্ডিঙের ভিতরের গণ্ডগোলের আওয়াজ চাপা দেয়া যায়নি। কীভাবে যেন ঝামেলার গন্ধ পেয়ে গেছে আশপাশের লোকজন। বিল্ডিঙের সামনে এখন একটা ছোটখাট জটলা। সদর দরজার কাঁচ ভেদ করে উঁকিঝুঁকি মারছে বেশ ক'টা কৌতূহলী মুখ।

সময় নষ্ট করল না কুয়াশা। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল দরজা থেকে। জটলার দিকে তাকিয়ে কণ্ঠে আকুতি ফোটাল, বলল, 'ভিতরে একজন আহত হয়েছে। প্লিজ... সাহায্য করুন।'

হুড়োহুড়ি পড়ে গেল জনতার মাঝে। ছোট দরজা গলে একসঙ্গে বিল্ডিঙে ঢোকার চেষ্টা করছে সবাই—হিরো সাজার ইচ্ছে আর কী। সাবধানে ছায়ায় সরে এল কুয়াশা। চঞ্চল চোখে খুঁজে বের করল ফোক্সওয়াগেনটাকে। ড্রাইভার ভিতরে বসা। খয়েরি রঙের গ্রেটকোট পরনে, কোনও সন্দেহ নেই, ওটাই শেষ বাধা। বিল্ডিঙের সামনে জটলা দেখে লোকটা সম্ভবত আর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকার সাহস পায়নি। ঝামেলা টের পেলে সটকে পড়ার ইচ্ছে, তাই ইঞ্জিনও চালু করে রেখেছে।

পিছন থেকে অগ্রসর হলো কুয়াশা, ফোক্সওয়াগেনের রিয়ার-ভিউ আর সাইডভিউ মিরর থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে। হাতে বেরিয়ে এসেছে সাইলেন্সার লাগানো পিস্তলটা। নিচু হয়ে ড্রাইভারের দরজার পাশে চলে গেল ও, তারপর ঝট্ করে উঠে দাঁড়াল। এতক্ষণে সচকিত হলো ড্রাইভার, মাথা ঘুরিয়ে তাকাল অনাহূত আগন্তুকের দিকে, তবে দেরি করে ফেলেছে সে। পিস্তলের বাট দিয়ে জানালার কাঁচে সজোরে আঘাত হানল কুয়াশা, ভাঙা কাঁচের আঘাত থেকে বাঁচতে মাথা নামিয়ে ফেলল লোকটা, হাত বাড়িয়ে দিল পাশের সিটের দিকে—ওখানে তার নিজের অস্ত্রটা রাখা।

'খবরদার!' বুক কাঁপানো স্বরে ধমকে উঠল কুয়াশা। 'নড়বে না!'

থমকে গেল ড্রাইভার। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাচ্ছে কুয়াশার দিকে।

'নামো!'

চকিতে নিজের পিস্তলের দিকে তাকাল ড্রাইভার, হিসেব

কষছে—ওটা নিতে পারবে কি না।

'বোকামি কোরো না,' বলল কুয়াশা। 'লক্ষ্মী ছেলের মত নেমে এসো গাড়ি থেকে।'

আবার পাশে তাকাল ড্রাইভার, হার মানতে চাইছে না।

গুলি করল কুয়াশা, লোকটার দু'পায়ের মাঝখানে, সিটের গদিতে। 'পরেরটা কিন্তু বিচি গালিয়ে দেবে,' হুমকি দিল ও।

সাহস হারিয়ে ফেলেছে, ড্রাইভার, হ্যাণ্ডস্ আপের ভঙ্গিতে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে।

'ভাগো!' রাস্তার দিকটা দেখিয়ে দিল কুয়াশা।

মাথা ঝাঁকিয়ে ছুটে পালাল ড্রাইভার। কয়েক সেকেণ্ড তার পিঠের দিকে পিস্তল তাক করে রাখল কুয়াশা, তারপর উঠে বসল ড্রাইভিং সিটে। কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ করল না, হ্যাণ্ডব্রেক রিলিজ করে আগে বাড়ল। রিয়ারভিউ মিররে চশমাঅলাকে দৌড়ে বেরুতে দেখল বিল্ডিং থেকে—হতভম্ব ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে ফোক্সওয়াগেনের দিকে। একটু পরেই বাঁক ঘুরল গাড়ি, লোকটা হারিয়ে গেল দৃষ্টিসীমা থেকে। সাইরেন জোরালো হয়ে উঠেছে, উল্টোদিক থেকে বেশ ক'টা পুলিশ-কার পেরিয়ে গেল কুয়াশাকে। ঘটনাস্থলের দিকে যাচ্ছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে শরীরে একটু ঢিল দিল কুয়াশা। আপাতত ও নিরাপদ, বেরিয়ে এসেছে জাল কেটে। কিন্তু তারপর? পুলিশি ঝামেলা কিংবা হুলিয়া ওর জন্যে নতুন কিছু নয়। সারাজীবন ওসব সামলে কাজ করতে হয়েছে ওকে। কিন্তু কেন যেন মন খুঁতখুঁত করছে লিও ভাদিমের কথাগুলোর ব্যাপারে। বেচারার অকালমৃত্যু প্রমাণ করে দিচ্ছে, ফেনিসের কাহিনি মিথ্যে নয়। সত্যিই আছে ওই সংগঠন, নিজেদের অস্তিত্ব গোপন রাখার জন্য যে-কোনও কিছু করতে পারে।

কিন্তু সত্যিই কি ওরা অমন শক্তিশালী? সত্যিই কি দুনিয়ার বড় বড় সরকার আর সন্ত্রাসীদেরকে নিয়ন্ত্রণ করছে ওরা? যদি তা-ই হয়, এত ভয়ানক একটা সংগঠনকে ঠেকানো যাবে কেমন করে? হঠাৎ করেই নিজেকে খুব অসহায় মনে হলো কুয়াশার। পরিষ্কার বুঝতে পারছে, অনেক বড় একটা শক্তির বিপক্ষে দাঁড়িয়ে গেছে ও। একাকী ওটাকে মোকাবেলা করতে পারবে না, এ-ধরনের অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে লড়াই করবার মত অভিজ্ঞতাও নেই ওর। একজন সঙ্গী দরকার। কিন্তু কে হবে সেই সঙ্গী? এমন কে আছে, যে জেনে-শুনে যুদ্ধে নামবে ফেনিসের মত একটা সংগঠনের বিরুদ্ধে?

একটু ভাবল কুয়াশা। হঠাৎ মুচকি হাসি ফুটল ঠোঁটে। হ্যাঁ, আছে একজন। ওর-ই মত আরেক বঙ্গসন্তান। ন্যায়ের পূজারী, দুঃসাহসী, দুর্ধর্ষ এক বীর। কিন্তু সমস্যা হলো, কুয়াশাকে দেখামাত্র অ্যারেস্ট করবে সে। হাত-পা বেঁধে, বেহুঁশ করে নিয়ে যাবে বাংলাদেশে, দাঁড় করিয়ে দেবে কাঠগড়ায়। তা হলে সাহায্য চাইবে কেমন করে? কীভাবে শোনাবে নিজের কথা?

ঠাণ্ডা মাথায় ছক কাটতে শুরু করল কুয়াশা। কায়দামত পেতে হবে ওই মানুষটাকে, ফাঁদে ফেলতে হবে। বাধ্য করতে হবে ওর সমস্ত কথা শুনবার জন্য। আশা করা যায়, এরপর ওকে সাহায্য করবে সে। কিন্তু কাজটা মোটেই সহজ হবে না। কারণ যাকে কুয়াশা ফাঁদে ফেলতে চায়, সে আর কেউ নয়...

বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের মাসুদ রানা!

চার

কাঁচা-পাকা ভুরুজোড়া কুঁচকে আছে। কপালের পাশে একটা রগ তিরতির করে কেঁপে উঠল। গভীর মনোযোগের সঙ্গে একটা ফাইল দেখছেন বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের সুযোগ্য কর্ণধার মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান। ইন্টারকম বেজে ওঠায় ধ্যানভঙ্গ হলো তাঁর। স্পিকারে শোনা গেল সেক্রেটারি ইলোরার কণ্ঠ।

'সোহেল ভাই এসেছেন, স্যার।'

'ভেতরে পাঠাও।'

কয়েক মুহূর্ত পরে দরজা ঠেলে কামরায় ঢুকল বিসিআই-এর চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সোহেল আহমেদ। দুর্দান্ত এজেন্ট ছিল সে একসময়, দুর্ঘটনায় একটা হাত কাটা পড়ায় এখন বিসিআই-এ প্রশাসনের দায়িত্বে কাজ করছে। এক অর্থে বিসিআই চিফের ডান হাত বলা চলে ওকে।

বুক দুরু দুরু করছে সোহেলের, রাহাত খানের সামনে এলে সবারই যা হয়। মৃদু গলা খাঁকারি দিয়ে চিফের মনোযোগ আকর্ষণ করল। ফাইল থেকে চোখ না তুলে সামান্য মাথা ঝাঁকিয়ে ওকে সামনের চেয়ারে বসতে ইঙ্গিত করলেন রাহাত খান।

কয়েক মিনিট কেটে গেল নীরবতায়, হাতের ফাইল নিয়ে ব্যস্ত বিসিআই চিফ, সোহেলের কথা যেন ভুলেই গেছেন। উসখুস

করতে শুরু করেছে সোহেল, এই সময় ফাইল দেখা শেষ হলো তাঁর। ফোল্ডারটা বন্ধ করে সোজা হয়ে বসলেন তিনি। হাডসন হাভানার প্যাকেট থেকে একটা সেলোফেন মোড়া চুরুট বের করলেন, সযত্নে কাগজ ছাড়িয়ে দাঁতে চেপে ধরে অগ্নিসংযোগ করলেন তাতে। পাতলা সাদা একফালি ধোঁয়া চোখে যাওয়ায় চোখদুটো পেঁচিয়ে উপর দিকে ঘুরিয়ে আঙুলের ফাঁকে নিলেন চুরুটটা। তারপর দৃষ্টি রাখলেন সোহেলের চোখে।

'কী ঘটেছে, শুনেছ নিশ্চয়ই?' গম্ভীর গলায় বললেন তিনি।

'জী স্যর,' মাথা ঝাঁকাল সোহেল। 'কাল রাতে বিসিআই-এর কম্পিউটার নেটওয়ার্ক হ্যাক করা হয়েছে। কোনও তথ্য চুরি হয়েছে কি না, তা বলা যাচ্ছে না। তবে মেইনফ্রেমের ভিতরে একটা মেসেজ পেয়েছি আমরা।'

টেবিলের উপরে রাখা একটা প্রিন্টআউট তুলে নিলেন রাহাত খান। বিড়বিড় করে পড়লেন বার্তাটা:

'মাসুদ রানা, সাহায্য দরকার আমার। জরুরি ভিত্তিতে তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া প্রয়োজন। ওয়াশিংটনের, নেব্রাস্কা অ্যাভিনিউ-এ, হোটেল এক্সেলসিয়রে দেখা করো আমার সঙ্গে। আজ থেকে পাঁচদিন পর... আগামী উনিশ তারিখে। কুয়াশা।'

সোহেলের দিকে চোখ ফেরালেন বিসিআই চিফ। জিজ্ঞেস করলেন, 'কী মনে হয় তোমার? মেসেজটা কতখানি অথেনটিক?'

'বলা কঠিন, স্যর,' কাঁধ ঝাঁকাল সোহেল। 'কেউ তামাশাও করতে পারে।'

'তামাশা করার জন্য কুয়াশার নাম বেছে নেবে কেন?' ভুরু কোঁচকালেন রাহাত খান। 'তা ছাড়া মেসেজটা আমাদের নিজস্ব কোডে এনক্রিপ্ট করা ছিল, তাই না? বলতে পারো, ওই টপ সিক্রেট কোড কীভাবে পেল হ্যাকার?'

'ব্যাপারটা একটু রহস্যময় তো বটেই,' স্বীকার করল সোহেল। 'আমাদের কম্পিউটার এক্সপার্ট রায়হান রশিদের সঙ্গে কথা বলেছি আমি... কিন্তু ও-ও কোনও সদুত্তর দিতে পারেনি। ওর মতে বিসিআই-এর কম্পিউটার নেটওয়ার্ক হ্যাক করা দুনিয়ার সবচেয়ে কঠিন কাজগুলোর একটা।'

'কুয়াশার জন্য কিছুই অসম্ভব নয়,' গম্ভীর হয়ে গেলেন রাহাত খান। 'দুনিয়ার সবচেয়ে রহস্যময় মানুষ ও, একটা মরীচিকা। আমাদের টপ সিক্রেট ওয়াচলিস্টে গত দশ বছরের বেশি সময় ধরে নাম আছে ওর... এক নম্বরে। কিন্তু আজ পর্যন্ত ওর ধারেকাছে ভিড়তে পারিনি আমরা।'

মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল চিফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর। এই ওয়াচলিস্ট আসলে অসাধারণ প্রতিভাবান ও গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশিদের একটি তালিকা, যাঁরা বিভিন্ন কারণে দেশের বাইরে অবস্থান করছেন কিংবা আত্মগোপন করে আছেন। এঁদের দিকে নজর রাখা এবং সম্ভব হলে দেশে ফিরিয়ে আনা বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের অনেক গুরুদায়িত্বের একটি। এভাবে তালিকাভুক্ত অনেক বিখ্যাত মানুষকেই বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে অতীতে, তাঁদের প্রতিভাকে দেশের মাটিতে... দেশের কল্যাণে ব্যবহারের সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু কুয়াশার ছায়াও মাড়ানো যায়নি আজ পর্যন্ত

'তা হলে আপনি, স্যর, ধরেই নিচ্ছেন, মেসেজটা কুয়াশা পাঠিয়েছে?' জিজ্ঞেস করল সোহেল।

'হ্যাঁ, কাজের ধারা ওর সঙ্গে মেলে,' বললেন রাহাত খান। 'কিন্তু ও আসলে কী চাইছে, সেটা বুঝতে পারছি না। ওয়াশিংটনের ঠিকানা দিয়েছে... রানাও এ-মুহূর্তে আমেরিকায়। ব্যাপারটা কো-ইনসিডেন্স হতে পারে না। অস্পষ্ট লাগছে

আমাদের কাছে মেসেজ পাঠানোর ব্যাপারটা। রানার লোকেশন যদি ওর জানা থাকে, তা হলে আমাদের কাছে মেসেজ পাঠাল কেন? কেন সরাসরি যোগাযোগ করেনি রানার সঙ্গে?'

'বিপদে পড়েছে, তাই সম্ভবত রানার মাধ্যমে বিসিআইয়ের সাহায্য নিতে চাইছে কুয়াশা।' অনুমান করল সোহেল।

'কীসের বিপদ?' বললেন রাহাত খান। ইশারা করলেন সামনে পড়ে থাকা ফাইলটার দিকে। 'কুয়াশার ফাইল আগাগোড়া স্টাডি করেছি আমি। এমন কোনও বিপদের তো আভাস পাইনি, যার জন্য এত বছর পর আমাদের মুখাপেক্ষী হতে হবে ওকে।'

'সরি, স্যর। ফাইলটা আপডেট করবার সুযোগ পাইনি। একদম তাজা খবর হলো, দু'দিন আগে রাশান পুলিশ ওর নামে একটা হুলিয়া জারি করেছে। সেটার কপি পাঠানো হয়েছে ইন্টারপোল-সহ ইয়োরোপ-আমেরিকার সমস্ত দেশে। বাংলাদেশও কপি পাবে দু'একদিনের ভিতর।'

'কুয়াশার জীবনের প্রথম হুলিয়া নয় এটা,' চুরুটে টান দিলেন রাহাত খান।

'ঠিক। কিন্তু আগেরগুলোর চেয়ে এটা অনেক সিরিয়াস,' বলল সোহেল। 'রাশার টপ নিউক্লিয়ার ফিযিসিস্ট-সহ তিনজন গণ্যমান্য ব্যক্তিকে খুনের অভিযোগ আনা হয়েছে ওর বিরুদ্ধে। ওকে শাস্তি দেবার জন্য উঠে-পড়ে লেগে গেছে রুশ সরকার।'

'তুমি কি ড. ইলিয়া ইভানোভিচের কথা বলছ?' কয়েকদিন আগে পড়া ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট স্মরণ করলেন রাহাত খান। সোহেলকে মাথা ঝাঁকাতে দেখে বললেন, 'ব্যাপারটা একটু বিদঘুটে না? ওটা তো প্রফেশনাল হিটের মত মনে হয়েছে আমাদের কাছে। কুয়াশার কাজের সঙ্গে একেবারেই মেলে না। তা ছাড়া খুন হওয়া মানুষগুলোর সঙ্গে ওর কানেকশন কোথায়?

মোটিভ কী?'

'সেটা কেউই বলতে পারছে না।'

'হুম, মনে হচ্ছে গভীর কোনও রহস্য আছে এর ভিতরে।'

'আমার ধারণা, কুয়াশাকে ফাঁসিয়ে দেয়া হয়েছে, স্যর,' বলল সোহেল। 'বড় ধরনের ঝামেলায় পড়েছে ও। এ-কারণেই নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করবার জন্য সহায়তা চাইছে আমাদের। কথা হলো, আমরা ওকে সাহায্য করব কি না।'

'ওকে সাহায্য করা আমাদের দায়িত্ব, কিংবা দায়... কোনোটাই নয়,' রুক্ষ গলায় বললেন রাহাত খান। 'কুয়াশা একজন ক্রিমিনাল; এবারের কেসটা ভুয়া হতে পারে, কিন্তু অতীতে বহু অন্যায় করেছে সে। তা ছাড়া, রাশান পুলিশের কাজে বাধা দেয়ার অধিকার নেই বিসিআইয়ের।'

'তা হলে আমরা অগ্রাহ্য করব ওর আবেদন?' একটু বিস্মিত হলো সোহেল

'না, আবেদনটাকে আমরা নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করব,' শান্ত গলায় বললেন রাহাত খান। 'কবীর চৌধুরীর মত কুয়াশা একেবারে আন-রিকভারেবল কেস না। মহৎ কিছু গুণ আছে ওর—মানুষকে সাহায্য করে. অপরাধীদের শাস্তি দেয়। তাই বহুদিন আগেই কুয়াশার ব্যাপারে একটা নির্দিষ্ট টার্গেট ঠিক করে রেখেছি আমরা—সম্ভব হলে ওকে দেশে ফিরিয়ে আনব, অন্যায়ের পথ থেকে সরিয়ে সঠিকভাবে গবেষণার সুযোগ করে দেব। যদি রাজি না হয়, তা হলে ওকে তুলে দেব আইনের হাতে। এতদিন পর... এই প্রথম ওকে নাগালে পাবার একটা উপায় দেখতে পাচ্ছি। সুযোগটার সদ্ব্যবহার করতে হবে। রানা ওকে আটক করে নিয়ে আসবে বাংলাদেশে। আর যা-ই হোক, ওর মত প্রতিভাবান একজন বিজ্ঞানীকে পশ্চিমা বিশ্বের হাতে পড়তে দেয়া যায় না।

প্রতিভাটাকে মন্দ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করবে ওরা, সারা দুনিয়ায় বিপদ ঘনিয়ে আসবে তাতে।'

'কিছু মনে করবেন না, স্যর,' ভয়ে ভয়ে বলল সোহেল। 'কিন্তু কুয়াশা এত সহজে ধরা দেবে বলে মনে হয় না আমার। অত্যন্ত ধূর্ত ও, শেয়ালের চেয়েও চতুর। ও ঠিকই আন্দাজ করবে, আমরা ওকে বন্দি করবার প্ল্যান আঁটতে পারি।'

'কুয়াশাকে মোটেই ছোট করে দেখছি না আমি,' বললেন রাহাত খান। 'রানা ওকে বাগে পাবার আগে ও কীভাবে রানাকে বাগে পেতে পারে, সে-পরিকল্পনা করেই মাঠে নামবে ও।'

'তা হলে?'

'পিছিয়ে আসার উপায় নেই। জেনে-শুনেই ফাঁদের মধ্যে পা দিতে হবে রানাকে। পাল্লা দিতে হবে কুয়াশার সঙ্গে।' ইন্টারকমের বোতাম চাপলেন রাহাত খান। 'ইলোরা, এম.আর.নাইনের সঙ্গে কথা বলব আমি। ডাকো ওকে।'

'ইয়াল্লা!' ফিসফিসাল সোহেল। 'রানা বনাম কুয়াশা! না জানি কী হয়!'

বস্টনের প্রাসাদোপম একটা বাড়ির লিভিংরুমে নিঃশব্দে বসে আছে দু'জন লোক। উঁচু এক পাহাড়ের উপর এই বাড়ি, নামকরা এক ব্যক্তির বাসস্থান। কেউ কল্পনা করতে পারবে না, এখান থেকেই পরিচালিত হয় গোপন এক সংগঠনের সমস্ত কর্মকাণ্ড।

ধৈর্য ও সমীহের সঙ্গে অপেক্ষা করছে একজন, অপরজন একটা ফাইল পড়ছে। অপেক্ষারত লোকটা সি.আই.এ.-র বড় কর্মকর্তা। অপর লোকটি বয়স্ক, উচ্চপদস্থ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উঁচুমহলে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে তার। এখনকার এই বৈঠকের সময় এবং স্থান ঠিক করা হয়েছে আজ সকালে, তড়িঘড়ি করে।

দশ মিনিট পর মুখ তুলল বয়স্ক মানুষটি, ফোল্ডার ভাঁজ করে রেখে দিল টেবিলে। 'দিস ইজ সিরিয়াস,' বলল সে। 'এই কুয়াশা লোকটাকে অবহেলা করা মোটেই ঠিক হবে না।'

ধীরেসুস্থে পাইপে অগ্নিসংযোগ করল সিআইএ-র অফিসার, তারপর নীলচে খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে ভরাট গলায় বলল, 'তা কেউ করছেও না। আমাদের রাশান গ্রুপ ওকে ইভানোভিচের মামলায় ফাঁসিয়েছে এ-কারণেই।'

'তাতে সমস্যার কোনও সমাধান হচ্ছে না। নিশ্ছিদ্র ফাঁদ গলে বেরিয়ে গেছে কুয়াশা। আপনার ইনফরমেশন অনুসারে ও এখন বিসিআই-কে জড়াতে চাইছে পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে। জানেন নিশ্চয়ই, শুধুমাত্র ওই একটা ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিতেই আজ পর্যন্ত চর ঢোকাতে পারিনি আমরা। ওরা যদি মাঠে নামে, তা হলে সেটা ঠেকাবার মত গোপন অস্ত্র নেই আমাদের হাতে।'

'সেক্ষেত্রে হার্ডলাইনে যাব আমরা,' বলল সিআইএ অফিসার। 'যে-ই আমাদের ব্যাপারে নাক গলাতে আসবে, তাকেই খতম করে দেব।'

'কৌশলটা শুরুতেই খাটাবার পরামর্শ দেব আমি,' বলল বয়স্ক মানুষটা। 'কুয়াশাকে তার বিসিআই কণ্ট্যাক্ট-সহ পরপারে পাঠিয়ে দিন। কার সঙ্গে ও যোগাযোগ করছে, তা জানা গেছে?'

'নিশ্চিত নই; তবে আমার ধারণা, মাসুদ রানাকে রিক্রুট করবার চেষ্টা চালাচ্ছে ও। হি'জ দ্য বেস্ট দে হ্যাভ।'

'মাসুদ রানা,' গম্ভীর হয়ে গেল বয়স্ক লোকটা। 'আরও বড় এক আপদ। কুয়াশার সঙ্গে ও যদি জোট বাঁধে, সেটা আমাদের জন্য দুশ্চিন্তার কারণ হবে।'

'আমার মনে হয় আপনি খামোকাই চিন্তা করছেন,' বলল সিআইএ অফিসার। 'আফটার অল, ওরা নশ্বর মানুষ। কী-ই বা

করতে পারবে দু'জনে আমাদের বিরুদ্ধে?'

'ওদেরকে আণ্ডার-এস্টিমেট করলে মস্ত ভুল করবেন। সিআইএ-র পুরনো ফাইলপত্র ঘেঁটে দেখুন। মাসুদ রানা কতবার আপনাদেরকে ঘোল খাইয়েছে, তার পরিষ্কার হিসেব পেয়ে যাবেন। কুয়াশাও বছরের পর বছর ধরে ফাঁকি দিয়ে যাচ্ছে সারা দুনিয়ার ল-এনফোর্সমেন্ট ডিপার্টমেন্টগুলোকে।'

'জানি। কিন্তু ফেনিসের মত প্রতিদ্বন্দ্বী কোনোদিন পায়নি ওরা... পাবেও না।'

'শত্রুকে কখনও ছোট করে দেখবেন না, মিস্টার!' একটু ধমকে উঠল বয়স্ক লোকটা। 'যান, যা বলছি করুন। মাসুদ রানা আর কুয়াশা যতক্ষণ বেঁচে আছে, আমরা নিরাপদ নই।'

'চিন্তা করবেন না, স্যার,' কুটিল হাসি ফুটল সিআইএ অফিসারের ঠোঁটে। আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। 'আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি, ওদের আয়ু ফুরিয়ে এসেছে!'

পাঁচ

হলওয়েতে পায়ের শব্দ শুনে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মাসুদ রানা। দরজার পাশে গিয়ে পিপহোলে চোখ রাখল। সাদামাঠা চেহারার একজন পুরুষ হেঁটে গেল সামনে দিয়ে, থামল না পলকের জন্যও। হোটেলের সাধারণ গেস্ট, আর কিছু না। চেয়ারে ফিরে গিয়ে শরীর এলিয়ে দিল ও। দৃষ্টি নিবদ্ধ করল

সিলিঙে। ডুবে গেল চিন্তার সাগরে।

মাসখানেক হলো আমেরিকায় এসেছে ও। অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের অনুরোধে নুমার একটা ছোট অভিযানে অংশ নিয়েছে; সেটা শেষ হবার পর বেরিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে রানা এজেন্সির শাখাগুলো পরিদর্শন করবার কাজে। মোটামুটি নিরুপদ্রবে কেটে যাচ্ছিল সময়, হঠাৎ মেজর জেনারেল রাহাত খানের ফোন ওলটপালট করে দিয়েছে সবকিছু। ওর সাহায্য চাইছে প্রতিভাবান বিজ্ঞানী কুয়াশা, দেখা করতে চাইছে!

মনসুর আলী ওরফে কুয়াশা সম্পর্কে সবই জানা আছে রানার। তার প্রতিভা এবং মহত্ত্বের কদর করে ও। লোকটা অপরাধী হতে পারে, কিন্তু তার কর্মকাণ্ডে কখনও নিরীহ-নিরপরাধ মানুষের ক্ষতি হয় না। বরং অজানা-অচেনা মানুষের বিপদে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে মুহূর্তের জন্য কুণ্ঠা করে না কুয়াশা। সেজন্য নিজের জীবনের ঝুঁকি নিতেও দ্বিধা নেই তার। অপরাধ করে শুধুমাত্র বিজ্ঞানের স্বার্থে, পৃথিবীর উপকারের জন্য... মহান লক্ষ্য নিয়ে। অদ্ভুত একজন মানুষ, এক ধরনের শ্রদ্ধা রয়েছে রানার তার প্রতি। সম্মান করে বললেও সম্ভবত বাড়িয়ে বলা হবে না। তাই মেজর জেনারেল রাহাত খানের অর্ডারটা শুরুতে একটু দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল ওকে।

বিসিআই চিফের পরিষ্কার নির্দেশ—যে করে হোক, কুয়াশাকে আটকাতে হবে; নিয়ে যেতে হবে বাংলাদেশে। লোকটার যদি কিছু বলার থাকে, সেটা দেশে পৌঁছুনোর পর শোনা যাবে। বুড়োর অবাধ্য কোনোদিন হয়নি রানা, তাই দ্বিধা ঝেড়ে ফেলেছে। আপাতত কুয়াশাকে করজায় নেয়া রানার একমাত্র লক্ষ্য। সেটা নিশ্চিত করবার জন্য নির্ধারিত সময়ের দু'দিন আগে নেব্রাস্কা অ্যাভিনিউয়ের হোটেল এক্সেলসিয়রে এসে উঠেছে ও। কুয়াশার

ফাইল ভালমত স্টাডি করে নিয়েছে রানা, কোন্ পদ্ধতিতে সে কাজ করে, তা বুঝে নিয়েছে। স্ট্র্যাটেজিস্ট হিসেবে তার কোনও তুলনা হয় না, এক অর্থে ম্যাজিশিয়ানও বলা চলে প্রতিভাবান বিজ্ঞানীটিকে। চমক দেখানোয় ওস্তাদ। ওকে পরাস্ত করতে হলে কয়েক পা এগিয়ে থাকতে হবে। আগেভাগে হোটেলে এসে ওঠা সে-পরিকল্পনারই অংশ।

কুয়াশা যে সরাসরি দেখা করবে না ওর সঙ্গে, এ-ব্যাপারে রানা মোটামুটি নিশ্চিত। হ্যাঁ, একটা পর্যায়ে নিশ্চয়ই মুখোমুখি হবার প্ল্যান আছে লোকটার; কিন্তু তার আগে প্রতিপক্ষকে একেবারে নিরস্ত্র এবং অসহায় করে নেবে, যাতে ওকে আটকাবার ক্ষমতা না থাকে রানার। শুধুমাত্র তখনই নিজের চেহারা দেখাবে কুয়াশা। এ-কাজ করা সম্ভব রানাকে ফাঁদে ফেলে। শেষ মুহূর্তে নয়, পুরো পাঁচ-পাঁচটা দিন আগে এক্সেলসিয়র হোটেলের নাম দিয়েছে সে এ-কারণেই। এখানেই রানাকে কবজা করবার প্ল্যান করেছে কুয়াশা। সন্দেহটা গাঢ় হবার পিছনে প্রচুর যুক্তি আছে।

নেব্রাস্কা অ্যাভিনিউয়ের এই হোটেলটা একেবারে ছোট, এখানে কুয়াশার ট্রেস পেতে খুব একটা কষ্ট করতে হয়নি রানাকে। সামান্য কিছু টাকা খরচ করেছে হোটেল-কর্মচারীদের পিছনে; তাতেই জেনে গেছে, ছড়িঅলা এক ভারতীয় ভদ্রলোক অতীতে একাধিকবার এসেছে এ-হোটেলে। তিনতলার, দুইশ' এগারো নম্বর রুমে সবসময় ওঠে সে। কক্ষটার বিশেষত্ব বুঝতে কষ্ট হয়নি রানার। জানালা দিয়ে পুরো নেব্রাস্কা অ্যাভিনিউ আর আশপাশের আরও দুটো রাস্তা দেখা যায় ওখান থেকে। পিছনের জানালা আর কার্নিশ ধরে খুব সহজে পৌঁছুনো যায় ফায়ার-এস্কেপেও। আগেভাগে পুলিশের গাড়ি দেখতে পাওয়া, এবং দ্রুত সটকে পড়া—দুটোর জন্যই দুইশ' এগারো আদর্শ।

কুয়াশা যে থাকার জন্য এ-কামরাকে বেছে নেবে, তাতে অবাক হবার কিছু নেই। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো, আগামী উনিশ তারিখের জন্য রুমটা ইতোমধ্যে বুক করে রেখেছে জনৈক ব্যক্তি। কুয়াশা ছাড়া আর কে? এত সহজে তার খোঁজ পাওয়া যাবার অর্থ একটাই—সে চাইছে, নির্ধারিত তারিখে রানা হানা দেবে ওখানে... ওর পাতা ফাঁদে। কামরায় ঢুকে দেখা যাবে, কুয়াশা নয়, অন্য কেউ অপেক্ষা করছে ওখানে। একজন ডিকয়। যাকে দেখে চমকে যেতে হবে ওকে। আশপাশে লোক রাখবে কুয়াশা, হতচকিত রানার উপর হামলা করবে তারা, আটকে ফেলবে। সুন্দর কৌশল। নিজে ঝুঁকি নেবে না, কিন্তু ঠিকই কার্যোদ্ধার হয়ে যাবে এতে।

রানা জানে, কুয়াশাকে পরাস্ত করতে হলে তছনছ করতে হবে এই পরিকল্পনা। নিজেকে প্রতিপক্ষের হাতের পুতুল নয়, বরং প্রতিপক্ষকে নিজের হাতের পুতুলে পরিণত করতে হবে। যাদেরকে মিডল-ম্যান হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে কুয়াশা, তাদেরকে ছেঁটে ফেলতে হবে ক্যানভাস থেকে। কাজটা খুব একটা কঠিন হবার কথা নয়। নিজস্ব লোক বলতে কেউ নেই কুয়াশার, যাদেরকেই ব্যবহার করার প্ল্যান করুক, ভাড়া করা লোক হবে। আনুগত্য নামক জিনিসটা থাকে না ভাড়াটে লোকের ভিতর, সামান্য চেষ্টাতেই তাদেরকে ত্যক্ত করে সরিয়ে দেয়া সম্ভব। যখন অন্যের মাধ্যমে কার্যোদ্ধার করার উপায় থাকবে না, বাধ্য হয়ে গর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে হবে কুয়াশাকে। নিজেকেই হাজির হতে হবে খেলার মাঠে। আর তখনই তাকে ঘায়েল করবে রানা।

তাই ছদ্ম-পরিচয়ে উল্টোদিকের দুইশ' তেরো নম্বর কামরাটা ভাড়া নিয়েছে রানা। দু'দিন আগেই এসে উঠেছে ওখানে,

কুয়াশার ঠিক করে দেয়া সময়ের অনেক আগে। নিশ্চয়ই এমনটা আশা করবে না সে। নিয়মমাফিক নজর রাখছে রানা করিডোরে। দেখা যাক, কে এসে ওঠে দুইশ' এগারো নম্বর রুমে। তারপর ব্যবস্থা নেবে ডিকয়কে সরিয়ে দেবার।

দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। ক্লান্তি বোধ করছে। গত দু'দিন থেকে ঠিকমত ঘুমাতে পারেনি। নজর রাখতে হচ্ছে চারপাশে, সেই সঙ্গে থাকতে হচ্ছে অতিমাত্রায় সতর্ক। এই বিশেষ মিশনে সম্পূর্ণ একাকী কাজ করতে হচ্ছে ওকে। কারও সাহায্য নিতে পারছে না, সে-রকমই নির্দেশ পেয়েছে বিসিআই চিফের কাছে। আমেরিকানদেরকে কিছুতেই জানতে দেয়া যাবে না কুয়াশার উপস্থিতির কথা। নইলে ওরাই প্রতিভাবান বিজ্ঞানীটিকে নিজেদের কবজায় নেবার চেষ্টা করবে।

ওয়াশিংটনে আসবার আগে নিজের ট্রেইল লুকানোর জন্য কৌশলের আশ্রয় নিয়েছে রানা। রাহাত খান যখন ফোন করেন, তখন ও ছিল ফ্লোরিডায়... কী ওয়েস্টে। ওখান থেকে ভার্জিন আইল্যাণ্ডে যাবার জন্য ছোট একটা বিমান চার্টার করেছে, সেখানে হোটেল বুকিং দিয়েছে। এয়ারপোর্টেও গিয়েছিল, কিন্তু বাথরুমে গিয়ে পরিচয় অদল-বদল করে নিয়েছে রানা এজেন্সির একজন অপারেটরের সঙ্গে। রানা সেজে সে উঠেছে চার্টার করা বিমানে; আর আসল রানা ছদ্ম-পরিচয়ে উঠে পড়েছে ওয়াশিংটন-গামী ডমেস্টিক ফ্লাইটে। সহজে এ-চাতুরি ধরা পড়বার কথা নয়। তারপরেও কখন কী ঘটে যায়, তার ঠিক নেই। শুধু কুয়াশাকে নিয়ে নয়, আমেরিকান ইন্টেলিজেন্সকে নিয়েও কিছুটা দুশ্চিন্তায় ভুগছে ও।

উঠে দাঁড়াল রানা। না, এখন আর দুশ্চিন্তার সময় নেই। আজ উনিশ তারিখ। মাহেন্দ্রক্ষণ ঘনিয়ে আসছে। খুব শীঘ্রি কাজে

নামতে হবে ওকে। চিন্তাটার সঙ্গে তাল মিলিয়েই যেন বাইরে শোনা গেল কলরব। এগিয়ে গিয়ে আবার পিপহোলে চোখ রাখল রানা। সুবেশী, সুন্দরী এক যুবতী দাঁড়িয়ে আছে দুইশ' এগারো নম্বরের দরজায়। হোটেলের বেলবয় রয়েছে সঙ্গে, মেয়েটির লাগেজ তার কাঁধে। সুটকেস নয়, ট্রান্স-আটলাণ্টিক ফ্লাইটে আসা ব্যাগেজও নয়; স্রেফ একটা ওভারনাইট ব্যাগ।

মুচকি হাসল রানা। এসে গেছে ডিকয়। কুয়াশার ভাড়া করা শকুনরাও নিশ্চয়ই চক্কর দিতে শুরু করেছে আশপাশে। মাঠে নেমেছে ধূর্ত মানুষটা। শুরু হয়েছে খেলা।

রুমের ভিতরে ঢুকে গেল সুন্দরী আর বেলবয়। রানা ফিরে এল বিছানার কাছে। বেডসাইড টেবিল থেকে তুলে নিল টেলিফোনের রিসিভার। ডায়াল করল রানা এজেন্সির আর্লিংটন শাখায়... শাখা-প্রধান তিশা ইসলামের কাছে। কল রিসিভ হবার সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'কিচ্ছু বোলো না, চুপচাপ শুনে যাও কী করতে হবে।'

রানার গলা চিনতে পেরেছে তিশা। মৃদুস্বরে বলল, 'জী, বলুন।'

'নেব্রাস্কা অ্যাভিনিউয়ের এক্সেলসিয়র হোটেলে ফোন করবে তুমি... পনেরো-বিশ মিনিট, কিংবা আধঘণ্টা অন্তর অন্তর। দুইশ' এগারো নম্বর রুমে কানেকশন চাইবে। একটা মেয়ে ধরবে ফোন। তাকে বলবে আমাকে ফোন দিতে, ঠিক আছে?'

'আপনি থাকছেন ওখানে?'

'না।'

'তা হলে বার বার ফোন করব কেন?'

'প্রশ্ন করতে মানা করেছি না তোমাকে?' মৃদু ভর্ৎসনা করল রানা। 'তারপরেও করেই যখন ফেলেছ, তা হলে শোনো। ওই

মেয়েকে বিরক্ত করবে তুমি। অতিষ্ঠ করে ফেলবে। ক্লিয়ার?'

'জী। ওই মেয়ে কী ক্ষতি করেছে আপনার, জানতে পারি?'

'কিছুই না। ইন ফ্যাক্ট, ও আমাকে চেনেই না। কিন্তু যে আমাকে চেনে, সে ঠিকই বুঝে নেবে এই ফোনের অর্থ। আর কোনও কথা নয়। আমি রাখছি।'

রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা।

এক্সেলসিয়র হোটেলের উল্টোপাশে, অন্ধকার গলির মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে কুয়াশা। দেয়ালে হেলান দিয়ে হাত-পা ঝাড়া দিল, মাথা এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে হালকা এক্সারসাইজ করে নিল ঘাড়ের। টেনশন দূর করতে চাইছে, সেইসঙ্গে চাইছে শরীরে চেপে বসা ক্লান্তিকে তাড়াতে। টানা তিনদিন জার্নি করতে হয়েছে ওকে। বিমানে উড়েছে অসংখ্য ঘণ্টা, ড্রাইভ করে যেতে হয়েছে বিভিন্ন শহর আর গ্রামে, দেখা করতে হয়েছে বিশ্বস্ত লোকজনের সঙ্গে, তাদের কাছ থেকে জোগাড় করতে হয়েছে ভুয়া কাগজপত্র, যা দিয়ে তিন-তিনটে ইমিগ্রেশন পয়েন্ট নির্বিঘ্নে পার হওয়া যায়। মস্কো থেকে এথেন্স, এথেন্স থেকে লণ্ডন, লণ্ডন থেকে নিউ ইয়র্ক। ওখান থেকে শেষ বিকেলের একটা ফ্লাইট ধরে ওয়াশিংটনে পৌঁছেছে ও।

খাটাখাটনি গেলেও একটা সন্তুষ্টি কাজ করছে মনের ভিতর। ঠিকমত ছক সাজাতে পেরেছে, জায়গামত বসাতে পেরেছে লোক। উঁচু শ্রেণীর এক পতিতাকে ভাড়া করেছে ডিকয় হিসেবে, তার উপর নজর রাখছে দু'জন লোক আর একজন বয়স্কা মহিলা। হোটেলের ভিতরে অবস্থান নিয়েছে সবাই। চমৎকার আয়োজন, রানাকে এর ভিতর পা দিতেই হবে। হোটেলের সবক'টা প্রবেশপথ কুয়াশার সার্ভেইলান্সে রয়েছে। রানা যেদিক দিয়েই

আসুক, দেখতে পাবে। একটা করে খুদে ওয়াকি-টকি রয়েছে সবার কাছে, রানাকে দেখামাত্র অ্যালার্ট করে দেবার জন্য। ওয়াকি-টকিগুলো কুয়াশা কিনেছে ফিফথ্ অ্যাভিনিউয়ের মিতসুবি কমপ্লেক্স থেকে।

মাসুদ রানাকে কোনও ভাবেই খাটো করে দেখছে না কুয়াশা। কোনও ফাঁদই যে ওর জন্য নিখুঁত নয়, সেটা ভাল করে জানে। কিন্তু কৌতূহলের সামনে সবাই অসহায়। তা ছাড়া বহুদিন থেকেই বিসিআই কুয়াশাকে নাগালের মধ্যে পাবার চেষ্টা করছে। এমন পরিস্থিতিতে হোটেলে হাজির না হয়ে উপায় নেই রানার। কুয়াশার কামরা সহজে চিনে নিতে পারবে সে, ওখানে যে একজন মেয়ে থাকছে, তা-ও জানতে পারবে। সন্দেহ নেই, মেয়েটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য যাবে ও। ভাড়া করা লোকদুটো হামলা চালাবে ওখানে, রানাকে বন্দি করবে।

প্ল্যানের এই অংশটা নিয়ে একটু দ্বিধা আছে কুয়াশার। রানাকে কবজা করার জন্য মাত্র দু'জন লোক কখনোই যথেষ্ট নয়। তা ছাড়া এরা সেই অর্থে প্রফেশনাল নয়, রাস্তার গুণ্ডাই বলা চলে। এ-দুর্বলতা ঢাকার জন্য ও রেখেছে বয়স্কা মহিলাটিকে। সে-ই কুয়াশার গোপন অস্ত্র, সত্যিকার একজন প্রফেশনাল। অথচ দেখে বোঝার কোনও উপায় নেই। আপাতদৃষ্টিতে সৌম্য চেহারার এক ভদ্রমহিলা, আসলে সে প্রাক্তন আইরিশ বিপ্লবী, জাত-খুনি। আন-আর্মড কমব্যাট, আর সব ধরনের অস্ত্র ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত। বহুদিন আগে এক বিপদের সময় কুয়াশা সাহায্য করেছিল এই মহিলাকে, সেই থেকে কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ। সাহায্য চাইতেই রাজি হয়ে গেছে। তাকে পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করার একটাই কারণ—রানাকে সামাল দেয়া। নিজের শারীরিক ক্ষমতা নিয়ে মোটেই সন্দেহ নেই কুয়াশার; তবে এ-ও জানে, রানা যদি খেপে

যায়, তার সঙ্গে লড়াই করে পেরে উঠবে না ও। কিন্তু এই মহিলা পারবে। তার সে-ক্ষমতা আছে। আর কেউ না পারলেও এই মহিলা রানাকে পরাস্ত করতে পারবে। সবচেয়ে বড় কথা, বয়স্কা একজন মহিলাকে কখনোই সন্দেহ করবে না রানা। কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঘায়েল হয়ে যাবে।

সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন। এখন অপেক্ষার পালা। দেখা যাক, রানা তার অ্যাপয়েন্টমেন্ট রাখে কি না। সফল হবে, তা ভাবছে না কুয়াশা। ব্যর্থ হবে, তা-ও না। কী ঘটবে সেটা সময়ই বলে দেবে।

ঝন ঝন করে বেজে উঠল টেলিফোন। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে রিসিভার তুলল সিআইএ-র বড় কর্মকর্তাটি, কানে ঠেকাল। অন্যপাশ থেকে ভেসে এল তার চিফ অ্যানালিস্টের কণ্ঠ।

'সুসংবাদ, স্যর! মাসুদ রানার ট্রেস পাওয়া গেছে।'

'কোথায়?'

'ফ্লোরিডা কীজ থেকে একটা চার্টার করা বিমানে উঠেছে ও দু'দিন আগে। দুটো স্টপেজে থেমে আগামীকাল ভার্জিন আইল্যাণ্ডে পৌঁছুবে বলে আশা করা হচ্ছে।'

'কোথায় পেয়েছ এই ইনফরমেশন?'

'শার্লট এমিলির হোটেলে আগামীকাল ওর বুকিং আছে।'

'কে করিয়েছে বুকিং?'

'ওভারসিজ কল পেয়েছে ওরা আমেরিকা থেকে। রানা আগামীকাল সকাল নাগাদ পৌঁছুবে বলে জানানো হয়েছে ওদেরকে।'

'ফোনের উৎস?'

'রানা এজেন্সির ফ্লোরিডা শাখা। কী ওয়েস্টে আমাদের লোক

ইতোমধ্যে এয়ারপোর্টে চলে গেছে। সমস্ত চার্টার লগ চেক করে দেখবে সে।'

ভুরু কোঁচকাল সিআইএ কর্মকর্তা। ভার্জিন আইল্যাণ্ড? ওখানে কী কাজ রানার? কুয়াশার সঙ্গে দেখা করবে ওখানে? জিজ্ঞেস করল, 'ভার্জিন আইল্যাণ্ডে কোনও শাখা আছে রানা এজেন্সির?'

'জী না, স্যর।'

'তা হলে কেন যাচ্ছে ওখানে?'

'এজেন্সির ফ্লোরিডা শাখায় ফোন করে ডিরেক্টরকে চেয়েছিলাম। ওরা বলল, মি. রানা ছুটি কাটাতে গেছেন।'

কপালের ভাঁজ গভীর হলো সিআইএ কর্মকর্তার। ছুটি কাটাতে যাবে মাসুদ রানা? কুয়াশার সঙ্গে দেখা না করে? অসম্ভব! আর দু'জনের যোগাযোগের জায়গা যদি ভার্জিন আইল্যাণ্ড হয়, সেটা তো গোপন রাখার কথা। উঁহুঁ, গোলমাল আছে কোথাও।

'রানা এজেন্সির অন্যান্য শাখার টেলিফোন লাইন ট্যাপ করতে বলেছিলাম তোমাকে,' বলল সিআইএ কর্মকর্তা। 'সেটার কী খবর?'

'সমস্ত ট্রান্সক্রিপ্ট জমা আছে আমার কম্পিউটারে,' বলল অ্যানালিস্ট। 'কিন্তু ওগুলোয় চেক চালাইনি। দরকার তো নেই, রানার খোঁজ তো বের করে ফেলেছি...'

'তুমি একটা গর্দভ!' গাল দিয়ে উঠল সিআইএ কর্মকর্তা। 'তাই এমন কথা ভাবছ! এক্ষুনি চেক করো সব। রানা মোটেই ভার্জিন আইল্যাণ্ডে যায়নি। ভুতুড়ে একটা ট্রেইল ওটা—আমাদেরকে বোকা বানানোর জন্য। সবকিছু দেখে রিপোর্ট করো আমাকে।'

রাগী ভঙ্গিতে রিসিভার নামিয়ে রাখল সে। মেজাজ খাট্টা হয়ে গেছে। অবশ্য অ্যানালিস্টকে পুরোপুরি দোষারোপও করতে

পারছে না। আসল ঘটনা কিছুই জানা নেই বেচারার। রুটিন কাজের মত মাসুদ রানার খোঁজ বের করতে বলা হয়েছে তাকে। গাদা গাদা টেলিফোন ট্রান্সক্রিপ্টে চোখ বোলাবে কেন?

পায়চারি শুরু করল সিআইএ কর্মকর্তা। অস্থিরতা চেপে বসেছে মনে। না, মাসুদ রানা বা কুয়াশাকে নিয়ে দুর্ভাবনা নেই তার। দুর্ভাবনা ফেনিসের নেতাকে নিয়ে। যদি কোনোভাবে দুই বাঙালি তার হাত গলে পালায়, তা হলে মুখ দেখানো যাবে না নেতার সামনে। কঠিন শাস্তি পেতে হবে।

তাড়াতাড়ি ফোনের রিসিভার তুলে নিল সে। রিং করল নিজস্ব ব্ল্যাক অপস্ টিমের লিডারের কাছে।

'একটা হিট টিম চাই আমি,' চাহিদা জানাল সিআইএ কর্মকর্তা। 'চারজনের টিম। ফুললি ইকুইপড্। দু'জন টার্গেটকে খতম করতে হবে।'

'ঠিক আছে,' ওপাশ থেকে জানানো হলো। 'টার্গেটের ডিটেইলস্ বলুন।'

'ই-মেইলে পাঠিয়ে দিচ্ছি ওসব, তুমি টিম রেডি করো।'

'কখন পাঠাতে হবে ওদেরকে? কোথায়?'

'এখুনি রেডি করো ওদেরকে। লোকেশন আমি একটু পরে জানাচ্ছি...'

কথা শেষ হলো না। ইয়ারপিসে বিপ বিপ ধ্বনি শোনা গেল—দ্বিতীয় লাইনে আরেকটা কল এসেছে। 'হোল্ড অন,' ব্ল্যাক অপসের লিডারকে বলল সিআইএ কর্মকর্তা। বোতাম টিপল অন্য কলারের সঙ্গে কথা বলার জন্য।

'জরুরি একটা ব্যাপার জানাবার জন্য ফোন করলাম, স্যার,' শোনা গেল চিফ অ্যানালিস্টের কণ্ঠ।

'কী সেটা?'

'রানা এজেন্সির আর্লিংটন শাখায় একটা ইররেগুলারিটি লক্ষ করেছি। গত কয়েক ঘণ্টায় ওখান থেকে নেব্রাস্কা অ্যাভিনিউয়ের একটা হোটেলে, নাম এক্সেলসিয়র, অনেকবার ফোন করা হয়েছে। প্যাটার্নটা অদ্ভুত। একটা কলও দশ-বিশ সেকেণ্ডের বেশি নয়।'

'কী কথা হচ্ছে ফোনে?'

'জানা নেই, স্যর। ব্রাঞ্চ চিফ তার এনক্রিপ্টেড লাইনের ফোন ব্যবহার করছে, কথা বোঝার উপায় নেই।'

'তাতে ঘোড়ার ডিম কী লাভ হচ্ছে আমাদের?'

'এনক্রিপ্টেড ফোন, স্যর। একটা কিছু গোপন করছে ওরা, তাই না? রহস্য আছে এতে।'

আচমকাই মুড বদলে গেল সিআইএ কর্মকর্তার। 'নাইস জব, ম্যান।' প্রশংসা করল সে। 'ছুটি নিতে পারো তুমি।' বোতাম টিপে ফিরে গেল ব্ল্যাক অপস্ টিমের লিডারের কলে।

'লোকেশন পাওয়া গেছে,' খুশি খুশি গলায় বলল সিআইএ কর্মকর্তা। 'ওয়াশিংটনেই... নেব্রাস্কা অ্যাভিনিউয়ে পাঠাও তোমার টিম। হোটেল এক্সেলসিয়রে।'

ছয়

বেসিনের কল ছেড়ে এক আঁজলা পানি মুখে ছিটাল রানা। তাকাল আয়নার দিকে। ঘুমের অভাবে চোখদুটো টকটকে লাল হয়ে উঠেছে, সেই সঙ্গে গালভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি মিলে বুনো

দেখাচ্ছে চেহারা। বিশ তারিখ, ভোর চারটে বাজে; প্রায় একটা দিন পেরিয়ে গেছে লুকোচুরি খেলায়, এর মাঝে ঘুমানোর বা বিশ্রাম নেবার কোনও সুযোগই পায়নি ও।

করিডোরের ওপারে, দুইশ' এগারো নম্বর রুমে কুয়াশার সুবেশী ডিকয়ও ঘুমাতে পারছে না। চোখ মুদলেই বেজে ওঠে ফোন। শুরু হয় জ্বালাতন।

'মি. মাসুদ রানা, প্লিজ!'

'বলেছি তো, কোনও মাসুদ রানাকে চিনি না আমি। কেন বিরক্ত করছেন? কে আপনি?'

'মি. রানার বন্ধু। জরুরি একটা ব্যাপারে কথা বলা দরকার ওঁর সঙ্গে। প্লিজ, দিন না ফোনটা!'

'এই নামে কেউ নেই এখানে। আমি মি. রানাকে চিনি না। আপনি আমাকে পাগল করে তুলছেন! খবরদার, আর ফোন করবেন না। নইলে হোটেল ম্যানেজমেণ্টকে বলে টেলিফোন ডিসকানেক্ট করে রাখব আমি।'

'ও-কাজ করতে যাবেন না। আপনার নিয়োগকর্তা মোটেই খুশি হবে না ওতে। বলা যায় না, পেমেণ্ট আটকে দিতে পারে।'

'স্টপ ইট!'

রীতিমত হৈচৈ করছে মেয়েটা। উল্টোপাশের কামরা থেকেও পরিষ্কার সব শুনতে পাচ্ছে রানা। মুচকি হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে। চমৎকার কাজ দেখাচ্ছে তিশা। খুব শীঘ্রি সহ্যের বাঁধ ভেঙে যাবে মেয়েটার, হোটেল ছেড়ে পালাবে। যত টাকাই সেধে থাকুক কুয়াশা, টেলিফোনের এমন উৎপাত সইতে হবে বলে ভাবেনি নিশ্চয়ই? বিপদের আশঙ্কাও জেগে উঠবে তার ভিতরে। ঘড়ি দেখল রানা, দেরি নেই আর। ডিকয় সরে যাচ্ছে দৃশ্যপট থেকে... কুয়াশার পরিকল্পনায় সৃষ্টি হতে চলেছে খুঁত।

এরপর শকুনদেরকে পাঠাতে বাধ্য হবে সে। ওদেরকেও পরাস্ত করবে রানা ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়ে। নিঃসঙ্গ হয়ে পড়বে কুয়াশা। হতাশা আর ক্ষোভের কারণে নিজেই মাঠে নামতে বাধ্য হবে। পা রাখবে রানার ফাঁদে। শুধু সময়ের অপেক্ষা, একসময় না একসময় ঠিকই তিনতলার করিডোরে উদয় হবে কুয়াশা; থামবে দুইশ' এগারো নম্বর কেবিনের সামনে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের কামরার দরজা খুলে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে রানা, ইতি ঘটাবে ওদের মধ্যকার স্নায়ুযুদ্ধের।

করিডোরে পায়ের আওয়াজ শুনে ঝট্ করে সোজা হলো রানা। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে দরজার কাছে গেল ও, পিপহোলে চোখ রাখল।

বয়স্কা একজন হোটেল মেইডকে দেখতে পেল ও, দুইশ' এগারোর দরজা খুলছে। ডানহাতে তোয়ালের স্তূপ, যেন বাথরুমের তোয়ালে বদলাতে যাচ্ছে। ভুরু কোঁচকাল রানা। ভোর চারটায় হোটেল মেইড? কুয়াশার কীর্তি নিঃসন্দেহে। রাতের শিফটের এই মেইডকে ভাড়া করেছে অফ-আওয়ারে তার ডিকয়ের উপর নজর রাখবার জন্য। বুদ্ধিটা মন্দ নয়, তবে খুঁত আছে এতে। এ-ধরনের মানুষকে খুব সহজেই সরিয়ে দেয়া যায়—ফ্রন্ট ডেস্কে সামান্য একটা ফোন করেই অন্যত্র ব্যস্ত করে ফেলা যায় হোটেল মেইডকে। সবচেয়ে বড় কথা, মেইডের ডিউটি শেষ হয়ে যাবে সকালে। তখন তাকে ডেকে নিয়ে বাড়তি টাকা সাধতে পারে ও, কুয়াশার ইনফরমেশন বের করে নিতে পারে। কোত্থেকে যোগাযোগ করেছিল সে, কীভাবে পেমেন্ট দিয়েছে, ইত্যাদি।

পিপহোল থেকে চোখ সরিয়ে নিচ্ছিল, এমন সময় আবার নড়াচড়া লক্ষ করল রানা। সুন্দরী মেয়েটা বেরিয়ে এসেছে কামরা

থেকে, হাতে তার ওভারনাইট ব্যাগ। মেইডও বেরুল, নিচু গলায় কিছু বলার চেষ্টা করল মেয়েটাকে।

'জাহান্নামে যেতে বলো ওকে!' খেপাটে গলায় চেঁচিয়ে উঠল সুন্দরী। 'পাগলের পাল্লায় পড়েছি আমি। আগে জানলে কিছুতেই রাজি হতাম না। না, আর এক মুহূর্তও থাকছি না আমি এখানে।'

গটমট করে হেঁটে দৃষ্টিসীমা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। মেইড কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিজেও চলে গেল অন্যদিকে।

দরজা থেকে সরে এল রানা। চমৎকারভাবে এগোচ্ছে ওর প্ল্যান। টেলিফোন করার বুদ্ধিটা কাজে লেগে গেছে। ডিকয়কে হটিয়ে দেয়া গেছে, আবার আকৃষ্ট করা গেছে কুয়াশাকেও। যত কিছুই হোক, ফোনে মাসুদ রানার নাম শোনা গেছে... কৌশলে একটা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেয়া হয়েছে তার দিকে। এখন কিছুতেই পিছু হটবে না অকুতোভয় বিজ্ঞানী। হয় এস্পার, নয় ওস্পার: একটা কিছু করতেই হবে তাকে।

জমে উঠছে খেলা।

রাস্তার ধারে হাঁটছে কুয়াশা। পা টনটন করছে ব্যথায়. সতর্ক থাকতে হচ্ছে সাইডওয়াকে হাঁটতে থাকা লোকজনের উপর হুমড়ি খেয়ে না পড়ার জন্য। মনোযোগ ধরে রাখার জন্য মগজের এক্সারসাইজ করছে—পায়ের কদম গুনছে. হিসেব রাখছে পেভমেণ্টের ফাটলের, কিংবা বিড়বিড় করে সমাধান করছে নানা রকম সমীকরণ। পকেটের ওয়াকি-টকিটাকে মনে হচ্ছে বাড়তি উপদ্রব. এ-মুহূর্তে একেবারে অচল ওটা। চার্জ শেষ হয়ে গেছে; থাকলেও লাভ হতো না। যাদের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য কিনেছিল যন্ত্রটা, তারাই আর নেই এখন।

বেলা এগারোটা বিশ বাজে। জ্যান্ত হয়ে উঠেছে ওয়াশিংটন নগরী। ব্যতিব্যস্ত মানুষ ছোটাছুটি করছে চারদিকে, রাস্তাঘাট ভরে গেছে গাড়িঘোড়ায়... কিন্তু এখনও থামেনি এক্সেলসিয়র হোটেলে উদ্ভট ফোনের উৎপাত।

মাসুদ রানা, প্লিজ। ওঁর সঙ্গে জরুরি কথা আছে আমার...

পাগলামি!

কী করছে রানা? কোথায় ও? এখন পর্যন্ত টিকিটিও দেখা যাচ্ছে না কেন ওর?

হোটেলে এখন শুধু বয়স্কা মহিলাটি আছে। পতিতা মেয়েটা বিদ্রোহ করেছে ভোরে; সকাল হতে না হতে লোকদুটোও বেঁকে বসেছে। একদিনের চুক্তিতে আনা হয়েছিল ওদেরকে, সকাল নাগাদ কাজের কোনও অগ্রগতি না হওয়ায় ধৈর্য হারিয়েছে তারা। দ্বিতীয় দিনের জন্য অবিশ্বাস্য অঙ্কের একটা পারিশ্রমিক দাবি করে বসেছে। ওদেরকে ধরে রাখার কোনও যুক্তি দেখতে পায়নি কুয়াশা, তাতে লাভ নেই কোনও। বোঝাই যাচ্ছে, ওর সযত্নে গড়া পরিকল্পনা মাটি করে দিয়েছে রানা। ফোনের উৎপাতের পিছনে তাচ্ছিল্য, নাকি চ্যালেঞ্জ কাজ করছে, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

পরিস্থিতি অন্যরকম হলে আশা ছেড়ে দিত কুয়াশা। নিজের পথে চলে যেত। কিন্তু এখন তা সম্ভব নয়। যেভাবে হোক, রানার সঙ্গে কথা বলতে হবে ওকে। কিন্তু লোকটা তো দেখাই দিল না হোটেলে। কী করা এখন? শেষ চেষ্টা হিসেবে বয়স্কা মহিলাটিকে দুইশ' এগারো নম্বর রুমে ঢুকিয়েছে ও। মাঝে মাঝে ফোনে রিপোর্ট দিচ্ছে সে—না, রানার দেখা পায়নি। তবে আধঘণ্টা পর পরই টেলিফোন আসছে রুটিনমাফিক। মাসুদ রানাকে চাইছে একটি মেয়ে। দশ-পনেরো সেকেণ্ডের বেশি লাইনে থাকে না সে,

বাড়তি একটা শব্দও উচ্চারণ করে না। পুরোপুরি প্রফেশনাল আচরণ। ফোনটা ট্রেস করবার উপায় নেই কোনও।

ফোন বুদের দিকে এগোল কুয়াশা। হোটেলের এণ্ট্রান্স থেকে পঞ্চাশ গজ উত্তরে ওটা, রাস্তার উল্টোপাশে। ভিতরে ঢুকে গ্লাসডোর টেনে দিল। স্লটে কয়েন ফেলে ডায়াল করতে যাবে, এমন সময় একটা দৃশ্য দেখে স্থির হয়ে গেল।

হলুদ রঙের একটা ট্যাক্সি এসে থেমেছে হোটেলের সামনে, লম্বা-চওড়া একজন লোক নেমে এল সেটা থেকে। অস্বাভাবিক কিছু নয়, কিন্তু লোকটার চেহারা-সুরত এবং ভাবভঙ্গি সন্দিহান করে তুলল কুয়াশাকে। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে সরাসরি হোটেলে ঢুকল না সে, পেভমেণ্টে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ, আশপাশ জরিপ করে নিল তীক্ষ্ণ চোখে। তারপর পা বাড়াল এণ্ট্রান্সের দিকে। হাঁটার ভঙ্গি সাধারণ সিভিলিয়ানের মত নয়, সামরিক প্রশিক্ষণের ছাপ ফুটে আছে তাতে। চেহারাই বলে দিচ্ছে, কঠিন পাত্র। হাঁটু পর্যন্ত লম্বা একটা ওভারকোট পরেছে, অস্ত্র লুকিয়ে রাখার জন্য আদর্শ পোশাক। কুয়াশার অভিজ্ঞ চোখ একজন প্রফেশনাল খুনিকে চিনতে পারছে।

ডায়াল করা আর হলো না কুয়াশার। ক্রেড্‌ল থেকে রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল, কথা বলার ভান করে ফোন বুদের ভিতর দাঁড়িয়ে রইল ও। ব্যাপারটা আরেকটু বুঝে নেয়া দরকার। লোকটা একা এসেছে, নাকি সঙ্গী-সাথী আছে আরও? একা হলে কো-ইনসিডেন্স ভাবা যেতে পারে। কিন্তু যদি আরও লোক থাকে, বুঝতে হবে নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে এসেছে। এ-মুহূর্তে হোটেল এক্সেলসিয়রে খুনি উদয় হতে পারে শুধু ওকে হত্যা করার জন্য।

কুয়াশার আশঙ্কাকে সত্যি প্রমাণের জন্য মিনিটপাঁচেক পরে আরেকজন উদয় হলো হোটেলের সামনে। এ-লোক গাড়িতে

আসেনি: পথচারী, চোখে সাদামাঠা একটা চশমা, হাতে ব্রিফকেস। সাধারণ চাকরিজীবীর বেশ নিয়েছে। কিন্তু পরনে ঠিক প্রথম লোকটার মতই ওভারকোট। হোটেলের সামনে পৌঁছে একই কায়দায় চারদিক দেখে নিল। রাস্তার উল্টোদিকে দাঁড়ানো তৃতীয় একজনের সঙ্গে চোখাচোখি হলো তার। নিগ্রো, শীতের ভারী জ্যাকেট আর উইন্টার বুট পরে আছে। গলায় স্কার্ফ, চোখে কালো সানগ্লাস। সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের জন্য পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা। নিগ্রো পকেট থেকে সিগারেট বের করে লাইটারের সাহায্যে ধরাল... সঙ্কেত দিল আসলে। মৃদু মাথা ঝাঁকিয়ে উল্টো ঘুরল চশমাঅলা, ঢুকে পড়ল হোটেলে, প্রথম খুনির সঙ্গে যোগ দিতে যাচ্ছে।

হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়ে গেছে কুয়াশার। মানে কী এর? সার্ভেইলান্স করতে নয়, এরা এসেছে অ্যাকশনের জন্য। হাবভাবেই পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু টার্গেট কে? ও নিজে? হতে পারে, কিন্তু ও তো রয়েছে হোটেলের বাইরে। ওরা ভিতরে ঢুকল কেন? নিশ্চিত না হয়ে তো প্রফেশনাল লোকজন কোথাও পা ফেলে না। তা হলে? দ্বিতীয় কোনও টার্গেট আছে ওদের? কে সেটা? রানা?

আচমকা সব পরিষ্কার হয়ে গেল কুয়াশার কাছে। মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হলো নিজের বোকামির কথা ভেবে। রানা বাইরে থেকে আসবে বলে ধারণা করেছিল, ওভাবেই পুরো সেটআপ সাজিয়েছে। কিন্তু ও যে হোটেলের ভিতরেই থাকতে পারে, তা মাথায় আসেনি একবারও। বহু আগে থেকেই ওখানে ঘাপটি মেরে বসে আছে দুর্ধর্ষ বাঙালি এজেন্ট, ওখানে বসেই নাচিয়ে বেড়াচ্ছে ওকে। তিক্ত একটা হাসি ফুটল কুয়াশার ঠোঁটে, তবে মনে মনে তারিফও করল রানার।

কিন্তু এখন ওসব নিয়ে সময় নষ্ট করার উপায় নেই। তিন খুনির উপস্থিতিতে জটিল হয়ে গেছে পরিস্থিতি। নিঃসন্দেহে ফেনিসের লোক এরা। কীভাবে এই হোটেলের খোঁজ পেল, তা জানা নেই। কিন্তু এটা নিশ্চিত—ওদের টার্গেটের তালিকায় কুয়াশার পাশাপাশি রানার নামও ঢুকে গেছে। সংগঠনটা কতখানি সিরিয়াস, তা বোঝা যাচ্ছে এবার। কোনও ধরনের ঝুঁকি নিতে রাজি নয়, কেউ পথের কাঁটা হতে পারে ভাবলেই তাকে সরিয়ে দিচ্ছে এরা। মানুষটা সত্যিকার কোনও সমস্যা সৃষ্টি করবার আগেই!

উদ্বেগ অনুভব করল কুয়াশা। ওর কারণে বিপদ নেমে এসেছে রানার উপরে, ওর জন্যই জীবন যেতে বসেছে বেচারার। কাজেই রানাকে রক্ষা করার দায়িত্বও এখন ওর উপরেই বর্তাচ্ছে। কিন্তু কীভাবে? রানা ঠিক কোথায় অবস্থান করছে, সেটাই তো জানা নেই ওর। কিছু একটা করতে হবে... এক্ষুণি! একটা মুহূর্ত অপচয় করা চলে না। তাড়াতাড়ি ফোন বুদ থেকে ডায়াল করল হোটেলের নাম্বারে।

'রানা এখানে?' কুয়াশার বক্তব্য শুনে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল বয়স্কা মহিলাটি।

'হ্যাঁ, তোমার খুব কাছাকাছিই আছে বলে ধারণা করছি আমি। রুমে কে ঢুকছে না ঢুকছে, সব দেখতে পাচ্ছে ও। তুমি কি এখনও ইউনিফর্মে আছ?'

'হ্যাঁ। কেন?'

'আশপাশের কামরাগুলো চেক করে দেখো।'

'হায় যিশু! কী বলছ, বুঝতে পারছ? যদি কেউ টের পায় যে, মেইড নই আমি এখানকার...'

'কথা বাড়িয়ো না!' ধমকে উঠল কুয়াশা। 'হাতে সময় নেই

একদম। রানাকে খুঁজে বের করতে হবে আমাদেরকে। এবং সেটা এখুনি। দশ মিনিটের মধ্যে আবার রিং দেব তোমাকে।'

'দাঁড়াও... ওকে আমি চিনব কী করে?'

'খুব সহজ। একমাত্র ও-ই তোমাকে ওর কামরায় ঢুকতে দেবে না।'

খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে রানা। শার্ট খুলে ফেলেছে, ঠাণ্ডা বাতাসে কাঁপছে হি হি করে। হিটার বন্ধ করে দিয়েছে অনেক আগেই, রুমের তাপমাত্রা এখন পঞ্চাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। ইচ্ছে করে কষ্ট দিচ্ছে নিজেকে... জাগ্রত থাকার জন্য। আরামদায়ক উষ্ণ পরিবেশের চেয়ে শীতার্ত অবস্থায় মানুষের নার্ভ অনেক তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

মৃদু একটা শব্দ কানে এল ওর। ধাতুর সঙ্গে ধাতুর ঘর্ষণের আওয়াজ। জানালার পাল্লা টেনে ছুটে গেল ও পিপহোলের কাছে। দুইশ' এগারো নম্বর থেকে বেরিয়ে এসেছে বয়স্কা মেইড, হাতে যথারীতি ভাঁজ করা তোয়ালে আর বিছানার চাদর। একদিকে চলে গেল সে। মনে হচ্ছে কুয়াশার শেষ অনুচরও হাল ছেড়ে দিয়েছে। দৃশ্যপট এখন সম্পূর্ণ ফাঁকা। এবার ফাঁদের অবস্থা দেখার জন্য কুয়াশাকে সশরীরে হাজির হতে হবে।

ক্লজিটের কাছে চলে গেল রানা, ভিতর থেকে বের করে আনল একটা পরিষ্কার শার্ট। গায়ে চড়াল ওটা। বালিশের তলা থেকে বের করল নিজের সিগ-সাওয়ার হ্যাণ্ডগান। ম্যাগাজিন চেক করছে, এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। দ্বিধান্বিত টোকা।

পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল রানা, ইন্দ্রিয় অতিমাত্রায় সতর্ক হয়ে উঠেছে। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। ফ্রন্ট ডেস্কে বাড়তি টাকা দিয়েছে ও, কেউ যাতে বিরক্ত না করে ওকে। দরজার নবে ঝুলিয়ে

দিয়েছে ডু *নট ডিস্টার্ব* সাইন। নামি-দামি হোটেলে প্রাইভেসি রক্ষার জন্য এটুকুই যথেষ্ট। তা হলে কে টোকা দিচ্ছে দরজায়?

সিগ-সাওয়ার বাগিয়ে দরজার কাছে গেল রানা। পিপহোল দিয়ে সাবধানে উঁকি দিল বাইরে। বয়স্কা সেই মেইড ফিরে এসেছে। কুয়াশার ভাড়া করা শকুন... এখনও পরাজয় মেনে নেয়নি তা হলে! মুহূর্তের জন্য চেহারাটা দেখল রানা। সৌম্যদর্শন মুখটার ভিতর কী যেন লুকিয়ে আছে। কিন্তু ও নিয়ে সময় নষ্ট করার মানে হয় না। ওর নাগাল পেয়ে গেছে মহিলা, কনফ্রন্টেশনে যাওয়াই ভাল। দেখা যাক, টাকার লোভ দেখিয়ে ওকে নিজের দলে ভেড়ানো যায় কি না। রানার খবর কুয়াশার কাছে নয়, বরং কুয়াশার খবর রানার কাছে পৌঁছুবে ওতে।

সিগ-সাওয়ারটা কোমরের পিছনে গুঁজে ফেলল রানা, ঢেকে ফেলল শার্ট দিয়ে। তারপর গলা চড়িয়ে বলল, 'ইয়েস?'

'মেইড-সার্ভিস, স্যর।' জবাব এল ওপাশ থেকে। উচ্চারণে আইরিশ টান। 'ম্যানেজমেন্ট বলেছে সব কামরার সাপ্লাই ঠিকঠাক আছে কি না, দেখে নিতে।'

মিথ্যেটা জুতসই হয়নি। তবে ভাড়াটে একজন প্রৌঢ়া মেইডের কাছে এরচেয়ে কনভিন্সিং কোনও কিছু আশা করাও যায় না।

'ঠিক আছে, ভিতরে আসুন।' ছিটকিনি খুলে দিল রানা।

'দুইশ' এগারো নম্বর থেকে কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না, স্যর,' জানাল এক্সেলসিয়রের সুইচবোর্ড অপারেটর।

'আবার চেষ্টা করুন,' বলল কুয়াশা। চোখ সেঁটে আছে রাস্তার উল্টোপাশের কফি শপের উপর। নিগ্রো খুনি ওখানে ঢুকেছে, বেরিয়ে আসবে যে-কোনও মুহূর্তে। ও-ই নিঃসন্দেহে দলটার

নেতা। ও মাঠে নামলেই শুরু হবে হিট টিমের মূল অ্যাকশন।

'আপনার যা ইচ্ছে, স্যর,' বিরক্তি নিয়ে বলল অপারেটর।

অস্থির হয়ে উঠেছে কুয়াশা। পনেরো মিনিট পেরিয়ে গেছে বয়স্কা মহিলাটির তল্লাশি শুরু হবার পর। হোটেলের তিনতলায় মাত্র আটটা রুম, সেগুলোর দরজায় টোকা দিয়ে প্রতিক্রিয়া দেখবার জন্য এত সময় লাগার কথা নয়। সবগুলোতে লোক থাকলেও না। ঘাপলা হয়েছে কোথাও।

চকিতে হোটেল এণ্ট্রান্সের দিকে নজর ফেরাল কুয়াশা। চমকে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। আরেকজন হাজির হয়েছে। দাড়িঅলা, বেঁটে এক লোক। এর গায়েও কালো ওভারকোট, গলায় পেঁচিয়েছে সিল্কের মাফলার; মাথায় ধূসর হ্যাট—একটু নিচু করে পরেছে, যাতে ঠিকমত চেহারা দেখা না যায়। পেভমেণ্টের উপর দাঁড়াল ক্ষণিকের জন্য। সঙ্গে সঙ্গে কফি শপের জানালায় মৃদু আলো দেখা গেল—ম্যাচ জ্বালানো হয়েছে। আরেকটা সঙ্কেত। ঘুরে হোটেলের এণ্ট্রান্সের দিকে পা বাড়াল দাড়িঅলা খুনি।

ইয়ারপিসে কর্কশ আওয়াজ তুলে বেজে চলেছে দুইশ' এগারো নম্বর রুমের ফোন, জবাব দিচ্ছে না কেউ। আঁতকে উঠল কুয়াশা। একটাই অর্থ হতে পারে এর—বুড়ির পরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে রানার কাছে। কিন্তু দুশ্চিন্তা বুড়িকে নিয়ে নয়, বরং রানাকে নিয়ে। প্রাক্তন ওই আইরিশ বিপ্লবীর স্বভাব-চরিত্র খুব ভাল করে জানা আছে কুয়াশার, কোণঠাসা হয়ে পড়লে উন্মাদ হয়ে যাবে। যদিও তাকে বার বার বলে দেয়া হয়েছে; কিছুতেই রানার ক্ষতি করা চলবে না, কিন্তু সার্ভাইভাল ইন্সটিঙ্কটের সামনে সেসবের কোনও মূল্য নেই। রানা যদি বুড়িকে বন্দি করতে চায়, স্রেফ বেঘোরে খুন হয়ে যাবে। মহিলা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর।

রিসিভারের ইয়ারপিস খড়খড় করে উঠল। ওপাশ থেকে

শোনা গেল টেলিফোন অপারেটরের কণ্ঠ। 'দুঃখিত, স্যর। কিছুতেই জবাব পাওয়া যাচ্ছে না দুইশ' এগারো নম্বর রুম থেকে। আপনি বরং ঘণ্টাখানেক পরে চেষ্টা করুন।'

কুয়াশাকে আরেকদফা অনুরোধের সুযোগ দিল না মেয়েটা। কথা শেষ করেই লাইন কেটে দিল।

রিসিভার নামিয়ে রাখল কুয়াশা। ঠোঁট কামড়াল হতাশায়। আর কোনও উপায় নেই। রঙ্গমঞ্চে এবার নামতেই হবে ওকে। নিতে হবে ঝুঁকি। কাঁধ ঝাঁকাল, কী আর করা। কোটের ভিতরের পকেটে হাত দিয়ে বের করে আনল একটা ছোট বাণ্ডিল। এর ভিতরে ওর সমস্ত ভুয়া কাগজপত্র। ওখান থেকে বেছে বের করল সুইটজারল্যাণ্ডের নামকরা একটা ব্রোকারেজ হাউজের পরিচয়পত্র। ওটা গুঁজে রাখল ওয়ালেটে। হোটেলের উল্টোপাশের গলির ভিতরে একটা ব্রিফকেস লুকিয়ে রেখেছিল আগেই, সেটা সংগ্রহ করল। তারপর পাক্কা ব্যবসায়ীর ভঙ্গিতে নেব্রাস্কা অ্যাভিনিউ পেরিয়ে ঢুকে পড়ল হোটেলে।

সরাসরি ডে-শিফটের ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করল ও। নিজের পরিচয়পত্র দেখাল, বিজনেস কনফারেন্সের জন্য পুরো হোটেল বুকিঙের টোপ ফেলল... ফলে দশ মিনিটের মাথাতেই বিনয়ে বিগলিত হয়ে যেতে দেখা গেল ম্যানেজারকে হাজার হোক, তাদের এই ছোট্ট হোটেলকে সুইটজারল্যাণ্ডের অমন নামকরা প্রতিষ্ঠান কনফারেন্সের জন্য বেছে নেবে, এ তো সাত কপালের ভাগ্য!

'ছোট্ট একটা উপকার করতে হবে আমার,' ম্যানেজারের হাতে একশো ডলারের তিনটে নোট গুঁজে দিয়ে বলল কুয়াশা, ততক্ষণে লোকটাকে বড়শিতে পুরোপুরি গেঁথে ফেলেছে ও। 'কী দিনকাল পড়েছে, তা তো জানেন। সৎ ব্যবসায়ীদের জন্য পদে

পদে বাধা। একটা লোক খুব জ্বালাতন করছে আমাকে, ও এ-মুহূর্তে এ-হোটেলেই আছে বলে সন্দেহ আমার...'

ফলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই হোটেলের গত চব্বিশ ঘণ্টার টেলিফোন রেকর্ড এসে গেল কুয়াশার হাতে। কম্পিউটার থেকে প্রিণ্টআউট নিয়ে এসেছে সুইচবোর্ডের অপারেটর। বলা বাহুল্য, তাকেও সামান্য *পকেট-খরচ* দেয়া হয়েছে।

বাকি সব ফ্লোর বাদ দিয়ে শুধু তিনতলার রেকর্ডে চোখ বোলাল কুয়াশা। দুটো করিডোর আছে ওখানে। দুইশ' এগারো থেকে পনেরো পর্যন্ত পাঁচটা রুম পশ্চিম উইঙে। ওগুলোর আউটগোয়িং কলের উপরেই মনোযোগ দিল ও। বিল দেখে বোঝা গেল, হোটেল ছোট হলেও এখানকার চার্জ অনেক বেশি। এক্সক্লুসিভ হোটেল হলে যা হয় আর কী। লিস্টটা এরকম:

২১২...লণ্ডন, ইউকে। চার্জ: ২৬.৫০ ডলার।

২১৪...দেস ময়নেস, আইওয়া। চার্জ: ৪.৫০ ডলার।

২১৪...সিডার র্যাপিডস, আইওয়া। চার্জ: ৪.৮০ ডলার।

২১৩...আর্লিংটন, ভার্জিনিয়া। চার্জ: ৫.১০ ডলার।

২১৫...ডেনভার, কলোরাডো। চার্জ: ৬.৭৫ ডলার।

২১৪...প্যাসাডেনা, ক্যালিফোর্নিয়া। চার্জ: ১১.৬৫ ডলার।

২১৫...ইস্টন, মেরিল্যাণ্ড। চার্জ: ৮.০৫ ডলার।

২১২...এথেন্স, গ্রিস। চার্জ: ৩০.১০ ডলার।

২১২...স্টকহোম, সুইডেন। চার্জ: ৩৮.২৫ ডলার।

২১৫...ওয়াশিংটন ডিসি, ভার্জিনিয়া। চার্জ: ৩.৬৫ ডলার।

প্যাটার্ন খোঁজার চেষ্টা করল কুয়াশা। দুইশ' বারো থেকে ইয়োরোপের তিনটা জায়গায় ফোন করা হয়েছে, কিন্তু তার সঙ্গে রানার কোনও সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না। ইণ্টারন্যাশনাল কল করতে চাইলে সেটা ও নিজের সেলফোন থেকেই করতে

পারে, তাতে পয়সা কম খরচ হয়: ট্রেসও থাকে না। দুইশ' চোদ্দ আর পনেরোর বাসিন্দারা লোকাল কল করেছে, তাতেও কোনও বিশেষত্ব দেখতে পাচ্ছে না। খটকা লাগছে শুধু দুইশ' তেরোর এণ্ট্রিটা। একটামাত্র কল... কারণ কী? চব্বিশ ঘণ্টায় আর কোথাও কি ফোন করতে হয়নি লোকটাকে? নাকি সেলফোন আছে তার কাছে? তা-ই যদি হয়, সেক্ষেত্রে একটামাত্র কল হোটেলের সুইচবোর্ড থেকে করার দরকার কী ছিল?

'আপনি বোধহয় দুইশ' বারোর ভদ্রলোককে খুঁজছেন,' আগ বাড়িয়ে বলে উঠল অপারেটর মেয়েটা। টাকা পেয়ে খুশির সীমা নেই তার। 'ইয়োরোপে বার বার ফোন করছেন, বিজনেসম্যান হবার সম্ভাবনা বেশি।'

'হতে পারে,' কাঁধ ঝাঁকাল কুয়াশা। 'কিন্তু আমি যাকে খুঁজছি, তার সঙ্গে এথেন্স, স্টকহোম বা লণ্ডনের সম্পর্ক নেই।' একটু দ্বিধা করল ও। 'ইয়ে... দুইশ' তেরোতে কে থাকছে?'

'না, না, ওই লোক হতে পারে না,' বলল অপারেটর। গলার স্বর খাদে নামাল মেয়েটা। 'চুপি চুপি জানাই আপনাকে, মসিয়ো, লোকটা সম্ভবত পাগল।'

'মানে?'

ব্যাখ্যা করল মেয়েটা, দুইশ' তেরোর দরজায় গত তিনদিন থেকে *ডু নট ডিস্টার্ব* সাইন ঝুলছে। ফ্রন্ট ডেস্কে বলে দেয়া হয়েছে, কোনও অবস্থাতেই ওই গেস্টকে বিরক্ত করা চলবে না। খাবার-দাবার ওয়েইটাররা রেখে আসছে দরজার সামনে, ভিতরে যাবার অনুমতি নেই। এমনকী মেইড সার্ভিস পর্যন্ত বাতিল করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে কামরা থেকে।

'ব্যাপারটা অস্বাভাবিক না?' জিজ্ঞেস করল কুয়াশা।

'একেবারে খুবই অস্বাভাবিক তা বলব না,' বলল অপারেটর।

'মাঝে মাঝে এমন গেস্ট পাই আমরা। রুমের দরজা জানালা বন্ধ করে দিনের পর দিন মদ গেলে; কিংবা বউয়ের চোখ ফাঁকি দিয়ে ফুর্তি করে অন্য মেয়েদের সঙ্গে। কিন্তু মেইড সার্ভিস বাতিল করতে দেখিনি কাউকে। আফটার অল, ময়লা চাদর আর ভেজা তোয়ালে নিয়ে ক'দিন থাকতে পারে মানুষ?'

'খাটাশ লোকজন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিয়ে মাথা ঘামায় না,' হালকা গলায় বলল কুয়াশা।

'তা বটে। কিন্তু আমাদের ট্যাক্সের পয়সায় সরকারি চাকুরিতে এমন লোক পোষা হচ্ছে, সেটা সহ্য করা মুশকিল।'

'বলতে চাইছ, সরকারি লোক?'

'কোনও সন্দেহ নেই। নাইট ম্যানেজারের কাছে শুনেছি, আজ ভোরে... পাঁচটার দিকে নাকি একজন সুট-বুট পরা মানুষ এসেছিল দুইশ' তেরোর গেস্টের ছবি নিয়ে। ম্যানেজারকে বলেছে, লোকটা অ্যালকোহলিক; সাইকিয়াট্রিক সমস্যাও আছে। ওকে কিছু বলতে মানা করেছে আমাদেরকে, আজ দুপুরের মধ্যেই নাকি একজন ডাক্তার নিয়ে আসবে চিকিৎসার জন্য।'

'সরকারি ক্রিডেনশিয়াল দেখিয়েছে ওই সুট-বুট পরা লোক?'

'উঁহুঁ। তবে এত বছর থেকে ওয়াশিংটনে আছি আমরা, চেহারা দেখেই সরকারি লোক চিনতে জানি।'

'থ্যাংক ইউ, ম্যা'ম.' মেয়েটার হাতে আরেকটা একশো ডলারের নোট দিল কুয়াশা. 'অনেক উপকার করেছ আমার।'

'মাই প্লেজার!'

সুইচবোর্ডের সামনে থেকে সরে এল কুয়াশা। বুক ঢিবঢিব করছে। পেয়েছে... রানার খোঁজ পেয়ে গেছে ও। কিন্তু দুঃসংবাদ, খোঁজটা খুনির দলও পেয়েছে। লবিতে চোখ বোলাল, কোথাও দেখতে পেল না লোকগুলোকে। নিশ্চয়ই পজিশন নিতে শুরু করে

দিয়েছে। এখন ছুটে গিয়ে রানাকে সাবধান করে দেয়া সম্ভব নয়, খুনিরা ওকে কিছুতেই ও-পর্যন্ত পৌঁছুতে দেবে না। তার আগেই খুন করবে। ফোন করতে পারে, কিন্তু রানা ওর কথা বিশ্বাস করতে যাবে কেন?

তাড়া অনুভব করল কুয়াশা। একটা উপায় বের করতেই হবে ওকে। নইলে কোনও আশা নেই রানার। কী করা যায়? ভাবতে ভাবতে এণ্ট্রান্সের দিকে তাকাল ও, স্থির হয়ে গেল নিগ্রো খুনিকে লবিতে ঢুকতে দেখে।

বড্ড দেরি হয়ে গেছে। এখুনি শুরু হবে হামলা।

সাত

বয়স্কা মেইড রুমে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে খটকার কারণ ধরতে পারল রানা। মহিলার চোখ। সাদাসিধে হোটেল কর্মচারীর দৃষ্টি নেই ওতে, অন্যরকম বুদ্ধিমত্তার ছাপ ফুটে আছে। সেইসঙ্গে মিশে আছে সামান্য ভীতি এবং কৌতূহল। কামরায় ঢোকার ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাজ করছে তার ভিতরে।

অভিনেত্রী নাকি?

'বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত, স্যর,' রানার ক্লান্ত চেহারা আর রুমের দিকে তাকাল মহিলা। হাঁটতে শুরু করল বাথরুমের দিকে। 'দু'মিনিটের বেশি নেব না আমি।'

কাঁচা অভিনয়। আইরিশ টান লুকানোর প্রাণপণ চেষ্টা করছে

সে, ব্যর্থ হচ্ছে হাস্যকরভাবে। পিছন থেকে হাঁটার ভঙ্গিটা জরিপ করল রানা। না, বয়সের সঙ্গে খাপ খাচ্ছে না। জীবনের কষাঘাতে জর্জরিত বৃদ্ধার পদক্ষেপ নয়, বরং অনেকটাই চপল বলা চলে। সন্দেহ নেই, এ-বয়সেও নিয়মিত ব্যায়াম করে মহিলা।

কুয়াশার পছন্দ দেখে মুচকি হাসল রানা। বড্ড কাঁচা কাজ করেছে। বোঝাই যাচ্ছে, ভুয়া মেইড। এরচেয়ে সত্যিকার একজনকে ভাড়া করলেই বেশি ভাল করত। অন্তত এভাবে ধরা পড়ে যেত না সে।

'নতুন তোয়ালে দিয়ে গেলাম, স্যর,' খানিক পর বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে বলল মহিলা। দরজার দিকে ফিরে যাচ্ছে। 'বিরক্ত করবার জন্য আরেকবার দুঃখপ্রকাশ করছি।'

হাতের মৃদু ইশারায় তাকে থামাল রানা। সাধারণ মেইড হলে এই ইশারার অর্থ বুঝত না।

'স্যর?' জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল মহিলা। চোখের মণিতে সতর্কতার ছাপ।

'কিছু মনে করবেন না,' হালকা গলায় বলল রানা। 'আপনি আইরিশ, তাই না? আয়ারল্যান্ডের ঠিক কোথায় আপনার বাড়ি? উচ্চারণটা ঠিক ধরতে পারছি না। উইক্‌লো কাউন্টিতে নাকি?'

'জী, স্যর।' নিচু গলায় বলল মেইড।

'দক্ষিণের কাউন্টি ওটা, ঠিক?'

'হ্যাঁ, স্যর,' গলার স্বর খাদে নেমে গেছে মহিলার। বাঁ হাতে আঁকড়ে ধরেছে দরজার নব।

'বাড়তি একটা তোয়ালে দেয়া যাবে?' বলল রানা। 'বাথরুমে না, বিছানার উপরে রেখে দিন।'

'ক্... কী?' একটু থতমত খেয়ে গেল মহিলা। পরমুহূর্তে সামলাল নিজেকে। 'হ্যাঁ, স্যর... নিশ্চয়ই।' তোয়ালে নিয়ে এগিয়ে

গেল বিছানার দিকে।

দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল রানা। ছিটকিনি লাগিয়ে দিল। বলল, 'ও.কে., ম্যাডাম। লুকোচুরির খেলা শেষ। তোমার সঙ্গে জরুরি কথা আছে আমার...'

ঘুরতে শুরু করেছিল ও, চমকে উঠল পিছনের শব্দ শুনে। কাপড়ের মৃদু খসখসানি, তার সঙ্গে বাতাসে শিস কাটার আওয়াজ। ঝট্ করে নড়ে উঠল রানা, পুরোপুরি রক্ষা পেল না তাতে, ঘাড়ের কাছটায় চিনচিনে ব্যথা অনুভব করল, কাঁধ ভেসে যেতে শুরু করল রক্তে। ঘাতক বুলেট ওর চামড়া চিরে দিয়েছে।

পাগলের মত হাত চালাল রানা। নাগালের মধ্যে একটা ল্যাম্প পেয়ে সেটা ছুঁড়ে দিল বিছানার দিকে।

সরে গিয়ে ল্যাম্পটাকে ফাঁকি দিল মহিলা। এতক্ষণে তাকে ঠিকমত দেখতে পেল রানা। হাত থেকে তোয়ালের স্তূপ ফেলে দিয়েছে, সেখানে শোভা পাচ্ছে চকচকে একটা সাইলেন্সার লাগানো পিস্তল। মুখ থেকে খসে পড়েছে ভালমানুষির মুখোশ, বুনো চেহারা আর দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে প্রকাশ পাচ্ছে—এ একজন প্রফেশনাল খুনি।

মেঝেতে ঝাঁপ দিল রানা। সেন্টার-টেবিলের পিছনে গিয়ে আছড়ে পড়ল। উপর দিয়ে ছুটে গেল দ্বিতীয় গুলি। সিগ-সাওয়ারের জন্য কোমরের পিছনটায় হাত দিল ও... নেই! ঝাঁপ দেবার সময় পড়ে গেছে বেল্টের ফাঁক থেকে। এখন ওটা নাগালের বাইরে। এ-নিয়ে মাতম করবার সময় নেই, সেন্টার-টেবিলটার একটা পায়া ধরে উঠে দাঁড়াল ও, বনবন করে ঘোরাতে ঘোরাতে ছুটে গেল প্রতিপক্ষের দিকে।

দ্রুত দুটো শট নিল মহিলা, ঘুরন্ত টেবিলে আঘাত করে চলটা ওঠাল বুলেট, রানার গায়ে লাগল না। তৃতীয়বার গুলি করবার

সুযোগ পেল না সে, রানা এসে পড়েছে গায়ের উপর। টেবিল দিয়ে সজোরে আঘাত করল ও। দেয়ালের উপর ছিটকে পড়ল মহিলা। টেবিল দিয়ে ঠেসে ধরল রানা তাকে দেয়ালের সঙ্গে।

'বাস্টার্ড!' ব্যথায় গালি দিয়ে উঠল খুনে বুড়ি। হাত থেকে খসে পড়ল পিস্তল।

টেবিল দিয়ে মহিলার হাঁটুর নীচে আঘাত করল রানা, ক্ষণিকের জন্য অচল করে ফেলল। তারপর হাত বাড়াল পড়ে যাওয়া পিস্তলটা তুলে নিতে। অস্ত্রটা হাতে এলে আবার ফিরল প্রতিপক্ষের দিকে, চুল মুঠো করে ধরে হ্যাঁচকা টানে মহিলাকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করল দেয়ালের পাশ থেকে।

টান খেয়ে খুলে এল লালরঙের উইগ, তলা থেকে উঁকি দিল খোঁপা বাঁধা কাঁচাপাকা চুল। পরচুলার জন্য তৈরি ছিল না রানা, তাল হারিয়ে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে গেল মহিলার শরীরে, জামার ভিতর থেকে বের করে আনল ছুরি—একটা সরু স্টিলেটো। এ-ধরনের অস্ত্রের সঙ্গে পরিচয় আছে রানার—ক্লোজ কমব্যাটে আগ্নেয়াস্ত্রের চেয়ে অনেক বেশি মারাত্মক, ফলায় বিষ মাখানো থাকলে তো আরও। প্রাণঘাতী আঘাতের প্রয়োজন নেই, সামান্য একটা আঁচড়ই যথেষ্ট; নিমেষে প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হবে শরীর, কয়েক সেকেণ্ড পর ঢলে পড়বে মৃত্যুর কোলে।

ছুরি বাগিয়ে রানার দিকে ঝাঁপ দিল মহিলা, অভিজ্ঞ নাইফ-ফাইটারের ভঙ্গিতে। আলতো পায়ে এক কদম পিছিয়ে গেল রানা, ছুরি ধরা হাতটা নাগালের মধ্যে আসতেই পিস্তলের বাট দিয়ে সজোরে আঘাত করল কবজির উপরে। ব্যথায় ককিয়ে উঠল মহিলা। থেমে দাঁড়াল, কিন্তু হাত থেকে পড়ল না ছুরি।

'থামো!' চেঁচাল রানা। আরেকটু পিছিয়ে গিয়ে পিস্তল তাক করল মহিলার কপাল বরাবর। 'চারটে শট নিয়েছ। আরও দুটো

বুলেট রয়ে গেছে ম্যাগাজিনে। না থামলে খুন হয়ে যাবে!'

হাঁপাতে হাঁপাতে ছুরি নামিয়ে ফেলল মহিলা। দাঁড়িয়ে রইল স্থির, বাকরুদ্ধ অবস্থায়। অবিশ্বাসের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে প্রতিপক্ষের দিকে। রানা আন্দাজ করল, এ-ধরনের পরিস্থিতিতে আগে কখনও পড়েনি মহিলা। সবসময় জয় হয়েছে তার।

'কে তুমি?' জিজ্ঞেস করল রানা। বাঁ হাত বাড়িয়ে বিছানা থেকে তুলে নিল তোয়ালে। চেপে ধরল ঘাড়ের ক্ষতের উপর।

'আমার পরিচয় তুমি কোনোদিনই জানতে পারবে না, বাছা,' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল মহিলা।

'তোমার ঠিকুজি-কোষ্ঠি জানার কোনও ইচ্ছে আমার নেই,' বলল রানা। 'এমনিতেই জিজ্ঞেস করেছি ওটা। কুয়াশা কোথায়?'

'কে?'

'কুয়াশা... মানে যে-লোক তোমাকে ভাড়া করেছে।'

'কেউ আমাকে ভাড়া করেনি। এখানে এসেছি কৃতজ্ঞতার প্রতিদান দিতে। যার কারণে এসেছি, তার নাম কুয়াশা হলেও হতে পারে। বহু নাম ব্যবহার করে সে। কিন্তু এ-মুহূর্তে ওকে কোথায় পাওয়া যাবে, তা জানি না আমি।'

'বিশ্বাস করি না। যোগাযোগ আছে তোমাদের। তুমি জিনিস বটে একটা! এভাবে লড়তে শিখেছ কোথায়? কবে?'

'তোমার জন্মের আগে, বাছা! বেলসেন, ডাচাউ... এমন শত শত ক্যাম্পে। যুদ্ধক্ষেত্রে। আমি একা নই, আরও অনেকেই শিখে নিয়েছে কীভাবে নিজেকে রক্ষা করতে হয়... কীভাবে প্রতিশোধ নিতে হয়!'

'সর্বনাশ!' বিড় বিড় করল রানা। *আলুফাস*-এর সদস্য এই মহিলা। আইরিশ যুদ্ধের ফসল এক গোপন বাহিনী ওটা। যুদ্ধকালীন সময়ে তরুণী, যুবতী মেয়েদেরকে উঠিয়ে নিয়ে যেত

সৈন্যরা: বিভিন্ন ক্যাম্পে বেশ্যার মত ব্যবহার করা হতো ওদেরকে, চালানো হতো অকথ্য নির্যাতন। সেই মেয়েরাই পালিয়ে গিয়ে আলুফাস-বাহিনী গড়ে তোলে। মানবহত্যার ট্রেইনিং নিয়ে যোগ দেয় যুদ্ধে—প্রতিশোধের নেশায়! কুয়াশা ওই বাহিনীর একজন পুরনো সদস্যকে রিক্রুট করেছে! পাগল নাকি? এসব মেয়েদের মধ্যে সাধারণ বিচারবুদ্ধি, কিংবা মানবিক অনুভূতির কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। গোটা পুরুষজাতিকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে এরা, পুরুষ হয়ে এদের কাউকে নিয়ন্ত্রণ করার চিন্তা একমাত্র বোকারাই করতে পারে।

'শোনো,' বলল রানা। 'তোমার সঙ্গে আমার কোনও শত্রুতা নেই। শুধু কুয়াশাকে চাই আমি। আর কিছু না। যদি আমার কথা শোনো, যেতে দেব তোমাকে। কী বলো, রাজি আছ প্রস্তাবে?'

'কী করতে হবে আমাকে?' জিজ্ঞেস করল মহিলা।

'ওর সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ করছ তুমি?'

দরজার দিকে ইশারা করল মহিলা। 'ওপাশের কামরায় ফোন করে ও।'

'কতক্ষণ পর পর?'

'ঠিক নেই। কখনও দশ মিনিট, কখনও আধঘণ্টা। তবে করবে যে, তাতে সন্দেহ নেই।'

'গুড। ওকে হোটেলের ভিতরে ডেকে আনবে তুমি। ডানদিকে সরে এসো। ছুরিটা ফেলে দাও বিছানার উপর।'

'তুমি আমাকে গুলি করবে না তো?' সন্দেহ ঘনাল মহিলার চোখে। কারণ, সে-ও চিনেছে রানাকে নিষ্ঠুর খুনি হিসাবে।

'করতে চাইলে এতক্ষণে করে দিতে পারতাম,' নরম গলায় বলল রানা। বিশ্বাস অর্জন করতে চাইছে মহিলার। 'ভয় পেয়ো না। আমার কথা শোনো, কোনও ক্ষতি হবে না তোমার। ছুরিটা

ফেলে দাও, তারপর ওপাশের কামরায় যাব আমরা।'

'হাঁটতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। তুমি সম্ভবত আমার পা ভেঙে দিয়েছ।'

'আমি সাহায্য করছি।' তোয়ালেটা নামিয়ে ফেলে মহিলার দিকে এগিয়ে গেল রানা। হাত বাড়িয়ে দিল। 'আমার হাত ধরো।'

ব্যথায় মুখ কুঁচকে বাঁ পা সামনে বাড়াল মহিলা, হাত ধরার ভান করল। পরমুহূর্তে বদলে গেল সবকিছু। শরীরে যেন বিদ্যুৎপ্রবাহ ঘটল তার, নড়ে উঠল বিস্ময়কর দ্রুততায়। চেহারায় ফিরে এল বুনো ভাবটা, দৃষ্টিতে উন্মাদনা।

ভয়ানক গতিতে ছুরির ফলাটা ছুটে এল রানার পেটের দিকে!

নিগ্রো খুনিকে অনুসরণ করে এলিভেটরে উঠে এল কুয়াশা। আশপাশে বাকি তিনজনকে দেখা যাচ্ছে না। সম্ভবত নিজ নিজ পজিশনে চলে গেছে তারা।

আরও দু'জন মানুষ উঠেছে এলিভেটরে। আমেরিকান একজোড়া কপোত-কপোতী; পরনে দামি পোশাক, সারাক্ষণ জড়িয়ে ধরে রেখেছে পরস্পরকে। দুজনের আঙুলেই বিয়ের আংটি। নব-বিবাহিত।

নিগ্রো লোকটা একটু জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়েছে এলিভেটরের পিছনের কোনায়, মুখ ঘুরিয়ে রেখেছে দেয়ালের প্যানেলের দিকে। চেহারা দেখতে দিতে চায় না কাউকে। খুনোখুনির পরে প্রত্যক্ষদর্শীরা যেন ঠিকমত চেহারার বিবরণ দিতে না পারে পুলিশকে। এতে সুবিধে হলো কুয়াশার, লোকটার নাগালের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল ও। আকস্মিক আক্রমণ চালানো যাবে তাতে।

খিলখিল করে হেসে উঠল মেয়েটা, তার সঙ্গী পাঁচতলার

বোতাম চাপল। মৃদুস্বরে ক্ষমা চেয়ে আগে বাড়ল নিগ্রো, তিনতলার বোতাম টিপে ফিরে এল আগের জায়গায়। কাজটা করতে গিয়ে চকিতের জন্য চোখাচোখি হয়ে গেল কুয়াশার সঙ্গে। বিস্ফারিত হয়ে উঠল চোখজোড়া।

এলিভেটরের দরজা বন্ধ হওয়া পর্যন্ত মূর্তির মত স্থির রইল দু'জনে। তারপরেই বিদ্যুৎবেগে জ্যাকেটের ভিতরে হাত ঢোকাল নিগ্রো, পিস্তল বের করে আনার ইচ্ছে। হাতের ছড়ি তুলে তার কবজির জয়েণ্টে প্রচণ্ড এক আঘাত হানল কুয়াশা। অস্থিসংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার বিশ্রী আওয়াজ হলো। ককিয়ে উঠল লোকটা। নির্দয়ভাবে তার হাঁটুর জয়েণ্টে পেনাল্টি কিক ঝাড়ল কুয়াশা, আলাদা করে দিল ওখানকার হাড়ও। হুড়মুড় করে মেঝেতে বসে পড়ল খুনি। মাথার চুল ধরে তার নাক-কপাল ঠুকে দিল কুয়াশা দেয়ালের সঙ্গে, এরপর মেঝেতে শুইয়ে ফেলে একটা হাঁটু তুলে দিল পিঠের উপর। নড়াচড়ার উপায় রইল না নিগ্রোর। হাতদুটোও চাপা পড়েছে শরীরের তলায়। এতকিছু ঘটে যেতে সময় লাগল মাত্র আড়াই সেকেণ্ড!

চিৎকার করে উঠল আমেরিকান মেয়েটা। তার সঙ্গীও হতভম্ব হয়ে গেছে।

'খবরদার!' ধমকে উঠল কুয়াশা। 'কোনও আওয়াজ নয়!' নিজের পিস্তল বের করে নিগ্রোর খুলির পিছনে ঠেকাল। লোকটা দাপাদাপি করতে চাইছে দেখে বলল, 'নোড়ো না। মগজে বুলেট ঢুকে যাবে তা হলে।'

স্থির হয়ে গেল নিগ্রো। ছড়ি ফেলে দিয়ে তার জ্যাকেটের ভিতর থেকে পিস্তল কেড়ে নিল কুয়াশা। মুখ ঘোরাল কাঁপতে থাকা নবদম্পতির দিকে।

'রিল্যাক্স,' বলল ও। 'কথা শুনলে তোমাদের কোনও ক্ষতি

করব না আমি।'

'ক্... কী চান আপনি?' তোতলাতে তোতলাতে জিজ্ঞেস করল যুবকটি।

'তোমাদের রুমে যাব আমরা,' বলল কুয়াশা। 'পকেট থেকে চাবি বের করো। এলিভেটর থেকে বেরিয়ে স্বাভাবিকভাবে হাঁটবে। কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা কোরো না। ঠিক আছে?'

'জিসাস ক্রাইস্ট!'

'কুইক! চাবি বের করো।'

যুবকটি আড়ষ্ট হয়ে গেছে, তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল মেয়েটা। চাবি বের করে বলল, 'প্লিজ, আপনার কথামতই হবে সব। আমাদের খুন করবেন না।'

'কথা দিলাম।' সংক্ষেপে বলল কুয়াশা।

তিনতলায় ক্ষণিকের জন্য থামল এলিভেটর, কিন্তু দরজা খুলতে দিল না কুয়াশা। মেয়েটাকে বলল *ক্লোজ* বাটন চেপে ধরে রাখতে। একটু পরে পাঁচতলায় পৌঁছুল এলিভেটর। নিগ্রোকে মেঝে থেকে উঠিয়ে আনল কুয়াশা। ব্যথায় আবার ককিয়ে উঠল সে।

'সাবধান! একটা শব্দও নয়!' তার কানের কাছে ফিসফিসাল কুয়াশা। 'আওয়াজ করলে খুলি উড়িয়ে দেব তোমার। জিন্দেগিতে আর কখনও ককাতে পারবে না তখন।' দরজা খুলে গেছে। 'মুভ!' নির্দেশ দিল ও।

পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে হাঁটতে শুরু করল নবদম্পতি। পিছনে নিগ্রোকে নিয়ে এগোল কুয়াশা। গা ঘেঁষে রয়েছে, কৌশলে পিস্তল ঠেকিয়ে রেখেছে লোকটার পেটের সঙ্গে।

করিডোর মোটামুটি ফাঁকা পাওয়া গেল। বৃদ্ধ এক গেস্টের সঙ্গে দেখা হলো কেবল, গম্ভীরমুখে একটা বই পড়তে পড়তে

হাঁটছেন। অদ্ভুত মিছিলটার দিকে তাকিয়েও দেখলেন না। মোড় নিয়ে চলে গেলেন অন্য এক করিডোরে।

নবদম্পতির হানিমুন স্যুইটে ঢুকে পড়ল চারজনে। কামরার মাঝখানে একটা চেয়ার এনে তাতে বসানো হলো নিগ্রোকে। বিছানার চাদর পাকিয়ে পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলা হলো ভালভাবে। এরপর দম্পতির দিকে ফিরল কুয়াশা।

'ক্লজিটে ঢুকে পড়ো তোমরা। এক্ষুণি।'

'আ... আপনি তো বলেছিলেন...' প্রতিবাদের চেষ্টা করল যুবক।

'তোমাদের ভালর জন্যই বলছি,' তাকে বাধা দিল কুয়াশা। 'যাও!'

দ্বিরুক্তি করল না দম্পতি। দু'জনে ঢুকে পড়ল ক্লজিটের ভিতরে। বাইরে থেকে ছিটকিনি লাগিয়ে দিল কুয়াশা। তারপর ফিরে এল খুনির কাছে।

'কাজটা কীভাবে করতে যাচ্ছ, তা বলার জন্য ঠিক পাঁচ সেকেণ্ড দিচ্ছি তোমাকে,' থমথমে গলায় বলল ও।

কপাল আর নাক থেকে বের হয়ে আসা রক্ত মুখে ঢুকছে নিগ্রোর। থুঃ করে একদলা থুতু ফেলল। কবজি আর হাঁটুর ব্যথা কিছুটা সয়ে এসেছে বেচারার। শান্ত গলায় বলল, 'কীসের কথা বলছ, তা আরেকটু পরিষ্কার করতে হবে তোমাকে।'

'নিশ্চয়ই!' একটু এগিয়ে গেল কুয়াশা। পিস্তলের সাইটের খোঁচায় চিরে দিল বন্দির গালের অনেকখানি। এরপর পিছনে গিয়ে তার ভাল কবজিটাও ভেঙে দিল মট্ করে। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। তার মুখের মধ্যে পিস্তলের ব্যারেল ঢুকিয়ে দিল ও। চিৎকার থামিয়ে ফেলল খুনি।

'এবার পরিষ্কার হয়েছে?' সকৌতুকে বলল কুয়াশা। 'নাকি

আরও দু'চারটে হাড় ভাঙতে হবে?'

সভয়ে মাথা নাড়ল নিগ্রো।

'গুড।' পিছিয়ে এল কুয়াশা। 'এবার গান গাইতে শুরু করো।'

'আমার কাজ রানাকে রুম থেকে বের করে আনা,' ভাঙা গলায় বলল নিগ্রো। ব্যথা সহ্য করার জন্য ক্ষণে ক্ষণে ঠোঁট কামড়ে ধরছে। 'এরপর বাকিরা ওর ব্যবস্থা নেবে।'

'তোমার কথায় রানা রুম থেকে বের হবে কেন?' জিজ্ঞেস করল কুয়াশা।

'সিআইএ-র ক্রিডেনশিয়াল আছে আমার কাছে। ডিরেক্টরের পক্ষ থেকে একটা চিঠিও নিয়ে এসেছি, মাসুদ রানার সঙ্গে জরুরি ভিত্তিতে দেখা করতে চেয়েছেন তিনি ওতে। ভুয়া চিঠি, কিন্তু সেটা বোঝার উপায় নেই। রানা যদি ফোনে কনফার্ম করতে চায়, তাতেও অসুবিধে নেই। হোটেলের লাইন ইন্টারসেপ্ট করে রেখেছি আমরা। কলটা ডাইভার্ট হয়ে চলে যাবে আমাদের লোকের কাছে। ডিরেক্টরের সেক্রেটারি সেজে মিটিঙের কনফার্মেশন দেবে সে।'

'হুম, রানা রুম থেকে বের হয়ে এল... তারপর?'

'মোটে তিনটে একজিট আছে তিনতলায়। মেইন এলিভেটর, স্টেয়ারকেস আর সার্ভিস এলিভেটর। সবগুলোতে একজন করে লোক রাখা হয়েছে। রানাকে দেখামাত্র গুলি করবে ওরা। পিছন থেকে আমিও। ক্রসফায়ারে ফেলা হবে ওকে, যাতে কোনোভাবেই বাঁচতে না পারে।'

'আর ফায়ার এস্কেপ?'

'ওখানে এক্সপ্লোসিভ বসানো হয়েছে। কেউ ওখান দিয়ে নামার চেষ্টা করলে বিস্ফোরণ ঘটবে। যদিও ও-পথে রানার

বেরুবার সম্ভাবনা খুবই কম।'

'প্ল্যান ওলোট-পালোট হয়ে যেতে পারে না? রানা যদি রুম থেকে না বেরোয়?'

'সেক্ষেত্রে সবাই মিলে হামলা করব আমরা। দরজা ভেঙে ঢুকে পড়ব ওর কামরায়। যত চালুই হোক, চারজনকে কিছুতেই ঘায়েল করতে পারবে না ও।'

'আই সি! প্ল্যান তো দেখছি শুধু রানার জন্য। আমার ব্যাপারে কী ব্যবস্থা নিয়েছ?'

'কিছু না। কারণ আমরা শিয়োর হয়েছিলাম, তুমি এ-হোটেলে নেই। রিসেপশনে তোমার এবং রানার, দু'জনেরই ছবি দেখানো হয়েছিল। শুধু রানা এ-হোটেলে উঠেছে বলে জানানো হয়েছে ওখান থেকে। তাই তোমাকে সেকেণ্ডারি টার্গেট হিসেবে ব্রিফ করা হয়েছে আমাদের। পাওয়া গেলে ভাল, না পাওয়া গেলেও ক্ষতি নেই। তোমার ব্যাপারে পরে ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

'হুম! তোমাদের শিডিউল বলো।'

'বারোটা বেজে দশ মিনিটে আমি অ্যাপ্রোচ করব রানার কাছে...'

রুমের ডেস্কে শোভা পেতে থাকা অ্যান্টিক ঘড়ির দিকে তাকাল কুয়াশা। বারোটা বেজে এগারো মিনিট। 'তারমানে ওরা সবাই পজিশন নিয়ে ফেলেছে,' অন্যমনে বলল ও।

'জানি না। আমি ঘড়ি দেখতে পাচ্ছি না।'

'তার দরকারও নেই। কতক্ষণ অপেক্ষা করবে তোমার সঙ্গীরা?'

'পনেরো মিনিট। এরমধ্যে রানা নীচে না নামলে সবাই উঠে আসবে তিনতলায়।'

ঠোঁট কামড়াল কুয়াশা। হাতে সময় নেই একদম। বেডসাইড

টেবিলের উপর রাখা টেলিফোনের উপর চোখ পড়ল। রিং দেবে রানাকে? সাবধান করে দেবে? ও কি বিশ্বাস করবে ওর কথা? আর কোনও উপায়ও তো নেই হাতে।

'চুপচাপ বসে থাকো,' নিগ্রোকে বলল ও। 'আমাকে একটা ফোন করতে হবে।'

অভিজ্ঞতা, ট্রেইনিং আর উপস্থিত বুদ্ধির কল্যাণে বেঁচে গেল রানা। মহিলার হাতে ছুরিটা ঝিক্ করে উঠেছে দেখে সচেতনভাবে কিছু না ভেবেই সরে গেল ও—নিখাদ রিফ্লেক্স অ্যাকশন। পেট চিরে দিতে পারল না, তাই ছুরিটা তুলে একদিক থেকে আরেক দিকে চালাল মহিলা, রানা সরে না গেলে গলাটা ফাঁক হয়ে যেত। পাগলের মত ট্রিগার চাপল ও পিস্তলের, কিন্তু খালি চেম্বারে খটাস করে পড়ল হ্যামার। চারটা বুলেটই ছিল ম্যাগাজিনে। সেটা জানা থাকায় সুকৌশলে ফাঁদ পেতেছে মহিলা। ছুরি বাগিয়ে ছুটে এল রানার কাছে। আঘাতটা ঠেকাবার জন্যে বাম বাহু তুলল রানা।

ছোটোখাটো এই প্রৌঢ়ার গায়ে এতো শক্তি ভাবা যায় না। ওদের দুটো বাহু পরস্পরের সাথে ধাক্কা খেলো, রানার মনে হলো যেন ইস্পাতের একটা রডের সাথে বাড়ি খেয়েছে হাতটা। পিস্তল ছেড়ে দিয়ে হাতটা শক্ত করে ধরে ফেলল ও। গায়ের কাছে ঘেঁষে এসেছে এবার মহিলা, নিজেকে ছাড়াবার জন্য হাত মোচড়াচ্ছে।

নিজেকে ছাড়াতে পারলে ছুরির দ্বিতীয় কোপটা আরেকদিক থেকে মারত সে। এক সেকেণ্ডের জন্যে খুনের নেশায় চকচকে চোখদুটো স্থির হলো রানার চোখে। সামনে বাড়ার জন্য প্রচণ্ড চাপ দিল সে, তারপর অপ্রত্যাশিতভাবে পিছু হটে দ্বিতীয়বার ছুরি চালাবার সুযোগ করে নিল। পুরনো ক্লোজ কমব্যাট ট্রিক, প্রতিপক্ষের শরীরটাকে লেভারেজ হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে

মহিলা। তার এই ফাঁদে পা দেয়া উচিত হয়নি রানার। ছুরিটা এবার অন্য কায়দায় ধরেছে সে, ফলাটা বেরিয়ে আছে বুড়ো আঙুলের মাথা থেকে, নীচের দিক থেকে উঠে আসবে প্রতিপক্ষের দিকে।

ধীর ভঙ্গিতে এগোল মহিলা, ফণা তোলা সাপের মতো এদিক-ওদিক দুলছে শরীরটা, হঠাৎ করে একদিক থেকে আরেক দিকে সরে যাচ্ছে। তারপর রানার অরক্ষিত বাম পাশটা লক্ষ্য করে ছুরি চালাল সে।

আবার তাকে ঠেকিয়ে দিল রানা, বাম বাহু সামনে বাড়িয়ে, সেই সাথে ডান হাত দিয়ে মহিলার কব্জি ধরার চেষ্টা করল। কব্জিটা নীচের দিকে নামাতে চেষ্টা করল রানা, মোচড় দিল, ব্যথা পেয়ে প্রতিপক্ষ যাতে ছুরিটা ছেড়ে দেয়। কিন্তু রানার একটা আঙুল মুঠোর ভিতর নিয়ে নীচের দিকে টান দিল মহিলা, তার গায়ে এতোই শক্তি রানার ডান হাতটা পিছলে গেল, ওটায় যেন মাখন মাখানো আছে।

এখন আবার একবার এদিক, একবার ওদিক সরার ভান করছে মহিলা। হঠাৎ দু'পা পিছিয়ে গেল সে, ভান করল আরও এক পা পিছাবে, কিন্তু তা না করে লাফ দিল ডান দিকে, শেষে ভান করল বাম দিকে সরে যাবে, কিন্তু তা না গিয়ে চলে এল সামনে, হাঁটু ভাঁজ করে ছেড়ে দেয়া স্প্রিঙের মতো লাফ দিল।

নীচে থেকে আসতে দেখল রানা ছুরিটা, শরীরটা বাম দিকে ঘুরিয়ে নিল ও। মাত্র কয়েক ইঞ্চির জন্যে ওকে ছুঁতে পারল না ছুরির ফলা, ফলার ডগাটা লাগল গিয়ে কামরার দেয়ালে।

রানা তাকে ধরার আগেই একটা দ্রুতগতি ঘূর্ণির মত পিছিয়ে গেল মহিলা, আবার এগিয়ে এল ওর দিকে। মুঠো করা হাতে এখনও ধরে আছে ছুরিটা। আবারও আঘাতটা ঠেকিয়ে দিল রানা,

এবার ডান হাত দিয়ে প্রতিপক্ষের কব্জিটা শক্ত করে ধরে ফেলেছে, বাম বাহু দিয়ে নিরেট চাপ দিল মহিলাকে।

শরীরের সমস্ত শক্তি এক করল রানা, তারপর হ্যাঁচকা টান দিল নীচের দিকে। দেয়ালে বাড়ি খেল মহিলার হাত, ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল সে, শিরদাঁড়া বাঁকা করে কুঁজো হয়ে গেল। হাত থেকে খসে পড়ল ছুরি, এখনো হাঁপাচ্ছে আর ধস্তাধস্তি করছে, একটা হাঁটু উঠে আসছে রানার দুই উরুর সন্ধিস্থলে।

আঘাতটা খেয়ে চোখে অন্ধকার দেখল রানা, শুনতে পেল আহত পশুর মতো আওয়াজ বেরিয়ে এল নিজের গলা থেকে। কুঁজো হয়ে গেল রানা, উরুসন্ধি চেপে ধরে হুড়মুড় করে পড়ে গেল মেঝেতে। দেখল, সাপের মতো এঁকেবেঁকে নীচে নেমে গেল মহিলার একটা হাত, ছুরিটা খুঁজছে মেঝেতে। পেয়েও গেল। ওটা বাগিয়ে ধরে ঝাঁপ দিল শিকারের দিকে।

উন্মত্তের মত লাথি ছুঁড়ল রানা, জুতোর তলা আঘাত করল মহিলার হাঁটুর নীচে। ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠল সে, ব্যালান্স হারিয়ে পড়ে যেতে শুরু করল। গড়ান দিয়ে সরে গেল রানা। পরমুহূর্তে ধড়াম করে মেঝেতে আছাড় খেল মহিলা, গলা চিরে বেরিয়ে এল আর্তচিৎকার। কেঁপে উঠল তার সারা দেহ।

আচ্ছন্নের মত পড়ে রইল রানা। শরীরে শক্তি পাচ্ছে না আর। কখন নিজেকে সামলে নিয়ে মহিলা আবার ছুরি চালায়, সে-অপেক্ষা করছে। কয়েক মুহূর্ত পরও যখন কিছু ঘটল না, কাত হলো ও। একই ভঙ্গিতে পড়ে আছে *আলুফাস*-এর খুনি। শরীরের নীচটা ভেসে যাচ্ছে রক্তে।

তাড়াতাড়ি মহিলার দিকে এগোল রানা। চিৎ করল তাকে। পরিষ্কার হয়ে গেল রহস্য। বেমক্কা আছাড় খাবার সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। রানার জন্য বরাদ্দ করা স্টিলেটো গেঁথে

গেছে মহিলার নিজেরই বুকে। প্রাণ হারিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে।

'দুঃখিত,' বিড়বিড় করল রানা। আঙুল বুলিয়ে বন্ধ করে দিল ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকা দু'চোখের পাতা।

টলমল পায়ে উঠে দাঁড়াল রানা। বাথরুমে গিয়ে কল ছাড়ল। ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলল ঘাড়ের ক্ষত। এরপর মেডিসিন কেবিনেট থেকে বের করে আনল ফার্স্ট এইড কিট। অ্যান্টিসেপটিক লাগাল, গজ-তুলো আর টেপের সাহায্যে ঢেকে দিল ক্ষতটা। কামরায় ফিরে এসে ধপ্ করে শুয়ে পড়ল বিছানার কিনারায়।

কতক্ষণ ওভাবে পড়ে ছিল রানা, বলতে পারবে না। সচকিত হয়ে উঠল টেলিফোনের রিং শুনে। উঠে বসল ও, রিসিভার তুলে কানে ঠেকাল। বলল, 'ইয়েস?'

'কুয়াশা বলছি।' বাংলায় কথা বলল ওপাশের কণ্ঠ।

'বলুন,' নির্বিকার রইল রানা।

'ভালই খেলা দেখিয়েছ তুমি, রানা। তবে এসবের প্রয়োজন ছিল না...'

'খেলা আপনিও কম দেখাননি, কুয়াশা।' শান্তকণ্ঠে বলল রানা। 'আমি ভাবতে পারিনি আপনি আমাকে খুন করার চেষ্টা করবেন। আমাদের মধ্যে এমন কোনও শত্রুতা ছিল না। চিনিই না আমি আপনাকে।'

'খুন! কীসের কথা বলছ?'

'আইরিশ ওই বুড়ির কথা বলছি। চেনেন নিশ্চয়ই ওকে?'

'ও... ও... ও কি...'

'মারা গেছে। দুঃখিত, আমার কিছু করার ছিল না। আমি স্রেফ আত্মরক্ষা করেছি।'

'তোমাকে খুন করার জন্য পাঠাইনি আমি ওকে। নিশ্চয়ই

তুমি ওকে খেপিয়ে দিয়েছিলে...'

'হোয়াটএভার, মি. কুয়াশা। আপনার প্ল্যান ব্যর্থ হয়েছে। এখন বলুন, ভালয় ভালয় আমার সঙ্গে দেশে ফিরে যাবেন, নাকি অন্য আর কোনও পথ ধরতে হবে আমাকে?'

'পরিস্থিতির গুরুত্ব তুমি বুঝতে পারছ না, রানা। আমি নই, কিন্তু তোমাকে খুন করার জন্য সত্যিই লোক হাজির হয়েছে এখানে। তাদের একজনকে আটক করেছি আমি। বিশ্বাস না হলে শোনো!'

নিগ্রোর খুলিতে পিস্তল ঠেকিয়ে রিসিভারটা কানে ধরল কুয়াশা। ইংরেজিতে ধমকে বলল, 'কথা বলো! কয়জন, আর কেন এসেছ!'

'হ্যাঁ... চারজন এসেছি আমরা... মাসুদ রানাকে খুন করতে...' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল খুনি।

'শুনলে তো?' রিসিভার এবার নিজের কানে ঠেকাল কুয়াশা। 'আমি তোমাকে সতর্ক করে দেবার জন্য ফোন করেছি, রানা। সবগুলো একজিটে লোক রেখেছে ওরা। এমনকী ফায়ার এস্কেপেও এক্সপ্লোসিভ বসিয়েছে। তুমি এখন ফাঁদের মধ্যে আছ, রানা।'

'এটা আপনার নতুন চাল-ও হতে পারে, কুয়াশা,' বলল রানা। 'কীভাবে বুঝব, কোনও অভিনেতার মুখ দিয়ে কথাগুলো বের হয়নি?'

'যদি নিশ্চিত হতে চাও, বসে থাকো নিজের রুমে। পনেরো মিনিটের মধ্যে তুমি যদি নীচে না নামো, তা হলে ওরাই আসবে তোমার কাছে।'

'আমার ভালমন্দ নিয়ে আপনি হঠাৎ এত উতলা হয়ে উঠলেন কেন, জানতে পারি? আমার বাঁচামরায় কী এসে-যায় আপনার?'

'অনেক কিছু এসে-যায়, রানা। তোমাকে আমার দরকার।

ভয়ঙ্কর একটা ষড়যন্ত্র চলছে গোটা দুনিয়া জুড়ে, আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ সেটা ঠেকাতে পারবে না।'

'দুনিয়াজুড়ে ষড়যন্ত্র? সেটা ঠেকাতে চান আপনি?' খোঁচা দেয়ার ভঙ্গিতে হেসে উঠল রানা। 'এতটা মানবদরদী হয়ে উঠলেন কবে থেকে? নিজের গবেষণা ছাড়া আর কিছু তো ইম্পরট্যাণ্ট নয় আপনার কাছে!'

'মানবদরদী আমি সবসময়ই ছিলাম, রানা,' গম্ভীর গলায় বলল কুয়াশা। 'আমার ফাইল দেখে থাকলে এমন কথা বলা উচিত নয় তোমার। আর এই বিশেষ ব্যাপারটার সঙ্গে কীভাবে জড়িত হলাম, তা যদি জানতে চাও, এই বিপদ থেকে রক্ষা পেতে হবে তোমাকে।'

'*বিশেষ* ব্যাপারে আগ্রহ নেই আমার,' কাটা কাটা গলায় বলল রানা। 'খাঁচায় ভরে আপনাকে বাংলাদেশে নিয়ে যেতে বলা হয়েছে আমাকে। আপাতত ওটাই আমার লক্ষ্য।'

'যথেষ্ট হয়েছে!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল কুয়াশা। 'আবোল-তাবোল কথা বলে আর সময় নষ্ট করার ইচ্ছে নেই আমার। তোমাকে সতর্ক করে দেয়া দরকার ছিল, করেছি। আমার দায়িত্ব শেষ। সত্য-মিথ্যা যাচাই করতে চাইলে এলিভেটর বা স্টেয়ারকেসে নিজের চেহারাটা একবার দেখিয়ে এসো। সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। রুমে বসে থাকলেও ক্ষতি নেই। আর এগারো মিনিট পরে প্রমাণ নিজেই হাজির হয়ে যাবে তোমার দরজা ভেঙে। আমাকে চাও? ছ'তলায় আছি আমি। পাঁচশ' পাঁচ নম্বর স্যুইটে। যদি বাঁচতে পারো, চলে এসো এখানে। আমি অপেক্ষা করব।'

লাইন কেটে দিল ও।

রানাও নামিয়ে রাখল রিসিভার। চিন্তায় পড়ে গেছে। কতটুকু

বিশ্বাস করা যায় কুয়াশাকে? মেইডের বেশে ভয়ঙ্কর এক খুনিকে ওর কামরায় পাঠিয়েছিল লোকটা। কেন? ওকে বন্দি করার জন্য? নাকি হত্যা করার জন্য? উদ্দেশ্য কী কুয়াশার?

চারজন খুনি হাজির হয়েছে হোটেলে, একজনকে নাকি আটক করেছে সে। কথাটা সত্যি, না মিথ্যে? ঘড়ি দেখল রানা। এক মিনিট পেরিয়ে গেছে টেলিফোনের কথোপকথনের পর। কুয়াশার সতর্কবাণী সত্যি হলে আর মাত্র দশ মিনিট আছে ওর হাতে। রুমে থাকলে ফাঁদে পড়ে যাবে। তারমানে বেরিয়ে পড়তে হবে ওকে। ব্যাপারটা কুয়াশার চাল নয়তো? হয়তো কামরার বাইরেই রয়েছে সত্যিকার ফাঁদ। ওখানেই ওকে ফেলতে চাইছে লোকটা।

ব্যাপার যা-ই হোক, রানা বুঝতে পারছে, এখানে চুপচাপ বসে থাকা চলবে না ওর। অবস্থান ফাঁস হয়ে গেছে, ঘাপটি মেরে পড়ে থেকে লাভ নেই কোনও। রুমের মধ্যে বসে থাকলে কুয়াশাকেও পাওয়া যাবে না। বড় করে শ্বাস নিল ও। ঠিক আছে, বেরিয়ে পড়া যাক। যদি সত্যিই খুনির দল অপেক্ষা করে ওর জন্য, তাদেরকে মোকাবেলা করবে ও। তারপর গ্রেফতার করবে কুয়াশাকে। আজ একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে ওকে।

ভুয়া মেইডের লাশটা বাথরুমে নিয়ে গেল রানা। বাথরুমের দরজা আটকে নবটা ভেঙে দিল ভারী একটা টেবিল-ল্যাম্পের আঘাতে। ভিতরে ঢুকতে হলে এখন পুরো পাল্লা ভাঙতে হবে। এরপর তোয়ালের সাহায্যে পুরো কামরা থেকে নিজের ফিঙ্গারপ্রিণ্ট মুছতে শুরু করল। হাতে সময় কম, কাজটা সুচারুভাবে করা গেল না। মনে খুঁতখুঁতানি নিয়ে গায়ে জ্যাকেট চড়াল ও। তারপর বিছানায় বসে ফোনের রিসিভার তুলল, ডায়াল করল হোটেলের সুইচবোর্ড অপারেটরের কাছে।

'ইয়েস, স্যর।' শোনা গেল নারীকণ্ঠ।

'দুইশ' তেরো থেকে বলছি আমি...' দুর্বল কণ্ঠে বলল রানা, শ্বাস নিচ্ছে জোরে জোরে। পুরোটাই অভিনয়। 'আ... আমার সম্ভবত হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। প্লিজ... সাহায্য করুন...'

কথা শেষ না করেই রিসিভারটা ফেলে দিল ও। পা ঠুকে মেঝেতে পড়ে যাওয়ার আওয়াজ করল।

'স্যর... আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? স্যর!!' ইয়ারপিসে চেঁচাতে শুরু করল অপারেটর।

ওদিকে ফিরেও তাকাল না রানা। মেঝে থেকে নিজের সিগ-সাওয়ার কুড়িয়ে নিল। গুঁজে রাখল কোমরে। তাকাল হাতঘড়ির দিকে।

আর মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি।

আট

ঘাড়ের উপর প্রচণ্ড এক রদ্দা মেরে নিগ্রো খুনিকে অজ্ঞান করে ফেলল কুয়াশা। বাঁধন খুলে এরপর তাকে শুইয়ে দিল মেঝেতে। গা থেকে খুলে নিল জ্যাকেট, গলা থেকে স্কার্ফ। একটা টুপিও পাওয়া গেল জ্যাকেটের ভিতরের পকেটে, ওটা মাথায় দিল ও। চোখে দিল খুনির কালো সানগ্লাস। কয়েক সেকেণ্ডের জন্য নিগ্রোটার সঙ্গী-সাথীকে ধোঁকা দেবার জন্য এ-সাজই যথেষ্ট। হাতের ছড়িটা বাড়তি বোঝা হতে পারত, তবে ওটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে দেয়া যায়। তা-ই করল কুয়াশা। ছড়িটা আসলে

বাড়তি সাপোর্ট, ওটা ছাড়াও প্রায় স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারে ও; পারে দৌড়ঝাঁপ করতেও। অসুবিধে হয় না একটুও।

রানাকে সতর্ক করে দিয়েও স্বস্তি পাচ্ছে না ও। বুঝতে পারছে, তিন-তিনজন প্রফেশনাল খুনির সঙ্গে কিছুতেই পেরে উঠবে না বিসিআই এজেন্ট। সাহায্য প্রয়োজন হবে ওর। তাই তৈরি হচ্ছে কুয়াশা।

ক্লজিটের কাছে গেল ও। ভিতরে বন্দি নবদম্পতির উদ্দেশে বলল, 'এখানেই থাকো তোমরা, কোনও আওয়াজ কোরো না। খুব শীঘ্রি হোটেলের লোকজন এসে উদ্ধার করবে তোমাদেরকে। তার আগে যদি হৈচৈ করো, ফিরে আসব আমি। বিপদ হবে তোমাদের। ক্লিয়ার?'

অস্পষ্ট স্বরে কিছু বলল যুবকটি ভিতর থেকে। ইতিবাচক জবাবই হবে। ঘুরে কামরার দরজার দিকে এগোল কুয়াশা। বেরিয়ে এল করিডোরে। দ্রুত পা চালিয়ে পেরিয়ে এল মেইন এলিভেটর, করিডোরের শেষ প্রান্তে সার্ভিস এলিভেটরের সামনে পৌঁছে থামল। দরজার উপরের ইণ্ডিকেটর 'দুই'-এ স্থির হয়ে আছে। তারমানে এই একজিটের খুনি জায়গামত অপেক্ষা করছে রানার জন্য।

নিজের পিস্তল জ্যাকেটের ডান পকেটে ঢুকিয়ে রাখল কুয়াশা, ডান হাতও ঢোকাল ভিতরে। বাম হাতে টিপে দিল এলিভেটরের বোতাম। দুই নম্বরের আলো নিভে গেল, উপরদিকে উঠতে শুরু করেছে এলিভেটর। স্লাইডিং প্যানেলের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল ও, দরজা খোলার পর ওর চেহারা যেন দেখতে না পায় ভিতরের আরোহী।

কয়েক সেকেণ্ড পর মৃদু আওয়াজ হলো পিছনে—এলিভেটর পৌঁছে গেছে পাঁচতলায়। স্লাইড করে দরজা পুরোপুরি খুলে

যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করল কুয়াশা, তারপর পাঁই করে ঘুরে দাঁড়াল। হাতে বেরিয়ে এসেছে পিস্তল। কিন্তু হতাশ হতে হলো ওকে। কেউ নেই ভিতরে। এলিভেটরে উঠে পড়ল ও। তিনতলার বোতাম চাপল।

'স্যর! স্যর!! দুইশ' তেরোর ওই লোকটা...' ইয়ারপিসে এখনও শোনা যাচ্ছে অপারেটরের কণ্ঠ। 'কাউকে পাঠান ওখানে! আমি অ্যাম্বুলেন্সের জন্য ফোন করছি। ওর সম্ভবত হার্ট অ্যাটাক হয়েছে!'

ফোনের লাইন নিথর হয়ে গেল এরপর, ভেসে এল ডায়াল টোন। তবে গোলমাল শুরু হয়ে গেছে নীচতলায়।

দরজার পাশে অবস্থান নিয়েছে রানা, হাতে ওর সিগ-সাওয়ার পিস্তল। ছিটকিনি খুলে দিয়ে অপেক্ষা করছে। মিনিটখানেক পরেই ছুটন্ত পদশব্দ শোনা গেল করিডোরে। কয়েক মুহূর্ত পরে ঝড়ের বেগে কামরায় ঢুকল একজন বেলবয় আর একজন ওয়েইটার।

'থ্যাঙ্ক গড! দরজা খোলা ছিল...'

কথাটা বলতে বলতে থমকে গেল দু'জনে। পিছনে পিস্তলের হ্যামার টানার শব্দে জমে গেছে। ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল ওরা, মুখোমুখি হলো রানার।

'রিল্যাক্স, কারও কোনও ক্ষতি হবে না,' ওদের দিক থেকে দৃষ্টি না সরিয়ে দরজা বন্ধ করল রানা। 'আমার কথা যদি শোনো আর কী। তুমি...' বেলবয়ের দিকে ইশারা করল ও। 'ইউনিফর্মটা খুলে ফেলো। আর তুমি... ওয়েইটার, ফোন করো নীচে। অপারেটরকে বলো, ম্যানেজারকে উপরে পাঠাতে। ভয় পাবার ভান করবে, বলবে কিছুই ধরার সাহস পাচ্ছ না। তোমার ধারণা, আমি মারা গেছি। বুঝতে পেরেছ?'

মাথা ঝাঁকাল লোকটা। পিস্তল দেখে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে গেছে। তাড়াতাড়ি ফোনের কাছে গিয়ে ডায়াল করল নীচে। ভয় পাবার ভান করতে হলো না, আসলেই ভয় পেয়েছে। অক্ষরে অক্ষরে মেসেজটার পুনরাবৃত্তি করল।

ইউনিফর্ম খুলে ফেলেছে বেলবয়। বাড়িয়ে ধরল রানার দিকে। ওগুলো নিল ও। পরে ফেলল দ্রুত হাতে। ঠিকমত ফিট করল না, তবে কিছু করার নেই এ-মুহূর্তে। ওয়েইটার লোকটা অনেক মোটাসোটা, তার পোশাক রীতিমত ঢলঢল করবে ওর শরীরে।

'টুপিটাও।' বেলবয়ের দিকে হাত বাড়াল ও।

দ্বিরুক্তি না করে মাথা থেকে টুপি খুলে দিল বেলবয়। ওটাও পরল রানা। ভয়ার্ত চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে ওয়েইটার। ফোনে শেষবারের মত আর্তি ছাড়ল, 'প্লিজ, তাড়াতাড়ি! ম্যানেজারকে আসতে বলো এখানে!'

ইশারায় তাকে রিসিভার নামিয়ে রাখতে বলল রানা। তাকাল বেলবয়ের দিকে। বলল, 'ক্লজিটটা কোথায়, জানো তো? ঢুকে পড়ো ওখানে।'

একটু দ্বিধা করল বেলবয়। রানা চোখ রাঙাতেই সাহস হারাল। সুড়সুড় করে গিয়ে ঢুকে পড়ল ক্লজিটে। দরজা টেনে দিয়ে ছিটকিনি আটকে দিল রানা। বেলবয়কে বলল, 'একদম বামে সরে যাও, তারপর টোকা দাও পাল্লায়।'

কয়েক মুহূর্ত পরে মৃদু টুক-টুক শোনা গেল ক্লজিটের পাল্লায়। আদেশ পালন করেছে বেলবয়। ডানদিকটায় একটা গুলি করল রানা। বলল, 'ওটা বুলেট ছিল। যদি কথা না শোনো, পরের গুলিটা ক্লজিটের বামদিকে ঢুকবে। বুঝতে পেরেছ? যা-ই ঘটুক, ভিতরে চুপচাপ বসে থাকবে তুমি। মুখ দিয়ে একটা শব্দও যেন

না বেরোয়।'

'ও মাই গড!' হালকা গোঙানি শোনা গেল ভিতর থেকে। তবে রানা নিশ্চিত, ভূমিকম্প হলেও মুখ দিয়ে আর কোনও আওয়াজ বের করবে না লোকটা।

ওয়েইটারের দিকে ফিরল ও। জিজ্ঞেস করল, 'স্টেয়ারকেসটা কোন্ দিকে?'

'এলিভেটরের পাশে,' কাঁপা কাঁপা গলায় বলল ওয়েইটার। 'রুম থেকে বেরিয়ে ডানে ঘুরতে হবে। করিডোরের একেবারে শেষ মাথায়।'

'আর সার্ভিস এলিভেটর?'

'ওটাও শেষ মাথায়... তবে বামের করিডোরে।'

'মন দিয়ে শোনো কী করতে হবে,' বলল রানা। 'খুব শীঘ্রি ম্যানেজারের পায়ের আওয়াজ শুনতে পাবে তুমি। একা আসবে না, সঙ্গে আরও লোক থাকবে তার। আমি দরজা খুলে দেয়ামাত্র লাফ দিয়ে রুম থেকে বের হবে তুমি, চেঁচাতে শুরু করবে... যত জোরে পারো! তারপর আমার সঙ্গে দৌড়াতে শুরু করবে করিডোর ধরে

'ক্রাইস্ট! কী বলব আমি?'

'বলবে যে, এখানে আর থাকতে চাও না তুমি, পালিয়ে যেতে চাও... এইসব আর কী। মনে হয় না খুব একটা কষ্ট হবে চেঁচাতে।'

'ক্... কিন্তু কোথায় যাব আমি আপনার সঙ্গে? ঘরে আমার বউ আর দুটো বাচ্চা আছে!'

'খুব ভাল। বাড়িতেই চলে যেয়ো তা হলে।'

'কী?'

লোকটার চমকে ওঠাকে পাত্তা দিল না রানা। প্রশ্ন করল,

'লবিতে সবচেয়ে দ্রুত পৌঁছুনো যাবে কোন্ পথে?'

'আ... আমি জানি না।'

'ভেবে দেখো। এলিভেটরে তো অনেক সময় লাগার কথা।'

'সিঁড়ি... সিঁড়ি দিয়ে যেতে হবে।'

'তা হলে সিঁড়িটাই ব্যবহার কোরো।'

বাইরে পায়ের আওয়াজ আর উত্তেজিত কণ্ঠ শোনা গেল। ধীরে ধীরে জোরালো হচ্ছে। পুলিশ, অ্যাম্বুলেন্স আর ইমার্জেন্সি নিয়ে কথা বলছে তিন থেকে চারজন লোক।

'সময় হয়েছে।' বলে এক ঝটকায় রুমের দরজা খুলে ফেলল রানা। ইশারা করল ওয়েইটারকে। 'বেরোও!'

তিনতলায় এলিভেটরের দরজা খুলে যাবার সময় পিছনদিকে সেঁধিয়ে গেল কুয়াশা। পিস্তল তাক করে রাখল দরজার দিকে। কিন্তু সতর্কতার প্রয়োজন ছিল না, ওপাশে কেউ নেই। সন্তর্পণে করিডোরে বেরিয়ে এল ও। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি বোলাল চারদিকে। সামনে দেয়াল ঘেঁষে পড়ে আছে একগাদা ট্রে-টেবিল। তাতে বিভিন্ন রুম থেকে আসা ব্রেকফাস্টের উচ্ছিষ্ট। স্প্রিং লাগানো দুই পাল্লার একটা মেটাল ডোর আছে এই ফ্লোরে, বৃত্তাকার দুটো কাঁচ লাগানো আছে ওতে।

সাবধানে দরজার দিকে এগোল কুয়াশা, কাঁচ ভেদ করে উঁকি দিল অন্যপাশে।

হ্যাঁ, এবার দেখা যাচ্ছে খুনিকে। চশমাঅলা লোক... দুই নম্বর খুনি। ফোন বুদ থেকে একে নিগ্রোর সঙ্গে সঙ্কেত বিনিময় করতে দেখেছে ও। দুইশ' তেরো নম্বরে যাবার করিডোরের মোড়ে ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করছে লোকটা, হাবভাবে চাঞ্চল্য লক্ষ করা যাচ্ছে।

ঘড়ি দেখল কুয়াশা। বারোটা ছাব্বিশ। নির্ধারিত পনেরো মিনিট পেরিয়ে গেছে, তাই ব্যাটার এই অস্থিরতা। ডাইভারশন দরকার। আগুন হলে সবচেয়ে ভাল হয়। কাপড় বা কাগজের স্তূপে আগুন ধরিয়ে করিডোরের মাঝখানে ছুঁড়ে দিলে সেটা চমৎকার ডাইভারশন হিসেবে কাজ করবে। ব্যাপারটা রানারও জানা থাকার কথা। কী করছে ও?

জবাবটা পরক্ষণে পাওয়া গেল। করিডোরের ওপাশে খুলে গেল মেইন এলিভেটরের দরজা। কলকাকলি করতে করতে বেরিয়ে এল তিনজন লোক—প্রথমজনকে চেনে কুয়াশা, ডে-শিফটের ম্যানেজার। তারসঙ্গে কালো ব্যাগ আর স্টেথোস্কোপ-সহ একজন মোটা মানুষ... ডাক্তার নিঃসন্দেহে; শেষজনের ইউনিফর্ম বলছে, সে হোটেল সিকিউরিটি।

হতচকিত খুনিকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল তারা। করিডোর ধরে এগোতে থাকল রানার কামরার দিকে। চোখ ঘোরাতেই স্টেয়ারকেসের দরজা খুলে যেতে দেখল কুয়াশা, লম্বা-চওড়া একজন লোক বেরিয়ে এল করিডোরে, যোগ দিল চশমাঅলার সঙ্গে। এক নম্বর খুনি দ্বিতীয় মেইন এলিভেটরের দরজা খুলে গেল সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের ভিতর, সেখান থেকে দাড়িঅলা তৃতীয় খুনিও বেরিয়ে এল।

তিনজনকে একত্র হয়ে শলা-পরামর্শ করতে দেখল কুয়াশা। হঠাৎ লম্বুর হাতে বেরিয়ে এল একটা গ্রেনেড! প্রমাদ গুনল ও। লোকগুলো মরিয়া। গ্রেনেড ফাটিয়ে খুন করতে চাইছে রানাকে, তাতে দু'চারজন নিরীহ মানুষ মারা গেলেও ক্ষতি নেই! কিছু একটা করা দরকার এখুনি। কিন্তু কী?

হঠাৎ চেঁচামেচির শব্দ শুনে চমকে উঠল কুয়াশা। দুইশ' তেরো নম্বরের দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে একজন ওয়েইটার।

গলা ফাটিয়ে কী যেন বলছে। সবাইকে হতভম্ব করে দিয়ে আচমকা দৌড়াতে শুরু করল সে, সঙ্গে ইউনিফর্ম পরা একজন বেলবয়ও আছে। ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই হকচকিয়ে গেছে, তিন খুনি তাড়াহুড়ো করে পথ আটকাতে চাইল, কিন্তু তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল পলায়নরত দুই হোটেল কর্মচারী। একজন ছুটে গেল সিঁড়ির দিকে। অন্যজন ঢুকে পড়ল এলিভেটরের ভিতরে। কেউ সংবিৎ ফিরে পাবার আগেই বন্ধ হয়ে গেল এলিভেটরের দরজা।

'শিট!' চশমাঅলাকে চেঁচিয়ে উঠতে শুনল কুয়াশা। 'দ্যাট ওঅজ মাসুদ রানা!'

তাই তো! চমকে উঠল কুয়াশা। বেলবয়কে কেমন যেন অন্যরকম লাগল না? রানাই ছিল ওটা... সবাইকে বোকা বানিয়ে চোখের সামনে দিয়ে সটকে পড়েছে ও। দারুণ তো!

'গড ড্যাম ইট!' খেপাটে গলায় বলে উঠল দাড়িঅলা।

'না... দাঁড়াও!' বলে উঠল লম্বু। তাকিয়ে আছে এলিভেটরের কাউন্টারের দিকে। 'নীচে যাচ্ছে না ও। উপরে যাচ্ছে!'

'হোয়াট!'

কুয়াশারও আরেক দফা চমকাবার পালা। উপরে যাচ্ছে মানে? রানা তো চাইলে এখন লবি হয়ে অনায়াসে বেরিয়ে যেতে পারে হোটেল থেকে। উপরে যাচ্ছে কেন? জবাবটা আন্দাজ করতে পারল সঙ্গে সঙ্গে। ওর জন্যে যাচ্ছে! দলকে ওপেন চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে ও, পারলে পাঁচশ' পাঁচ নম্বর কামরায় যেতে। সেটার জবাব দিতেই যাচ্ছে রানা!

'সিঁড়ি দিয়ে যাও!' উত্তেজিত গলায় দুই সঙ্গীকে বলল দাড়িঅলা। 'আমি এখান থেকে কাউন্টারে নজর রাখছি। ও কোথায় থামছে, সেটা রেডিওতে জানাব তোমাদেরকে।'

ঝড়ের বেগে স্টেয়ারকেসের দিকে ছুটে গেল দাড়িঅলা আর লম্বু।

'বের করছি তোমার রেডিওতে জানানো!' বিড়বিড় করল কুয়াশা।

মেটাল ডোর ঠেলে বেরিয়ে এল ও, দৃঢ় পায়ে হাঁটছে চশমাঅলা খুনির দিকে। পায়ের শব্দে মাথা ঘুরিয়ে তাকাল লোকটা, পরিচিত পোশাক দেখে ক্ষণিকের জন্য ঢিল পড়ল সতর্কতায়। চেহারার দিকে তাকিয়ে পরমুহূর্তে আবার সচকিত হয়ে উঠল সে। তাড়াতাড়ি তুলতে শুরু করল পিস্তল।

কিন্তু বেচারাকে সেই সুযোগ দিল না কুয়াশা। দশ গজ দূর থেকে হাত বাড়াল সামনে, হাঁটার ছন্দ বিন্দুমাত্র নষ্ট না করে দুপ দুপ শব্দে দুটো গুলি ছুঁড়ল। প্রতিক্রিয়ার কোনও সময়ই পেল না খুনি, লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। নির্বিকার ভঙ্গিতে লাশটাকে টপকে এল কুয়াশা। দ্বিতীয় মেইন এলিভেটরের দরজা খোলা, ঢুকে পড়ল ভিতরে। রওনা হলো ছ'তলার দিকে।

বেলবয়ের জ্যাকেট আর টুপি খুলে ফেলল রানা, ওগুলো ছুঁড়ে ফেলল এলিভেটরের [illegible]য়। চারতলায় কয়েক সেকেণ্ডের জন্য থামল এলিভেটর। [illegible] এক মেইড সহযাত্রী হলো ওর। হাতভর্তি তোয়ালে। সন্দিহান দৃষ্টিতে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল ওর দিকে, তবে ব্যাপারটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। পাঁচতলায় নেমে গেল সে।

সাততলার বোতাম চাপল রানা। ওটাই হোটেলের টপ ফ্লোর। কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে গেল ওখানে। দরজা খুলতেই দু'জন সুবেশী ভদ্রলোক ঢুকল ভিতরে। গেল বছরের লাভ-ক্ষতি নিয়ে আলোচনা করছে। ব্যবসায়ী নিঃসন্দেহে। এক পলকের জন্য

তাকাল তারা ওর দিকে। দৃষ্টিতে বিতৃষ্ণা ফুটল। দোষ দিতে পারল না রানা, জঘন্য দেখাচ্ছে ওকে। টকটকে লাল দু'চোখ, মুখভর্তি খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পোশাকও অবিন্যস্ত।

'সরি, আমি নামব এখানে,' বলল রানা। দুই ব্যবসায়ীকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এল এলিভেটর থেকে।

লম্বা করিডোরটা শূন্য, কাউকে দেখা যাচ্ছে না আশপাশে। ডানদিকে একেবারে শেষ প্রান্তে রয়েছে দুই পাল্লার মেটাল ডোর, সার্ভিস এলিভেটরের সামনে। একটা পাল্লা মৃদু কাঁপছে। বেল্টে গোঁজা সিগ-সাওয়ারের বাটে হাত দিল রানা, সতর্ক। বাসন-কোসনের ঝনঝনানি শোনা গেল দরজার ওপাশ থেকে, সার্ভিস-ট্রে নিয়ে যাচ্ছে কেউ। শরীরটায় একটু ঢিল দিল রানা, শত্রুপক্ষের লোকজন এভাবে শব্দ করবে না।

বামদিকের একটা কামরা থেকে একজন ক্লিনিং লেডিকে বেরিয়ে আসতে দেখল ও—কামরা পরিষ্কার করেছে, ক্লিনিং কার্ট ঠেলতে ঠেলতে এগিয়ে আসছে ওর দিকে। ভুরু কুঁচকে কয়েক সেকেণ্ড মহিলার দিকে তাকিয়ে থাকল ও। নিশ্চিত হলো, সত্যিই ক্লিনিং লেডি; কুয়াশার পাঠানো দ্বিতীয় কোনও খুনি নয়।

ঠোঁট কামড়াল রানা। পাঁচশ' পাঁচ নম্বর স্যুইটে যেতে হবে ওকে। সরাসরি ছ'তলায় নামেনি, উঠে এসেছে সাততলায়; সরাসরি যেন কুয়াশার ফাঁদে পা দিতে না হয়। পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে, তা অবশ্য ঠিক করেনি এখনও।

ক্লিনিং লেডিকে ব্যবহার করবে কি না, ভাবল একবার। পরমুহূর্তে বাতিল করে দিল আইডিয়াটা। যে চেহারাসুরত হয়েছে ওর, সাহায্য চাইতে গেলে মহিলা উল্টো সন্দেহ করে বসবে ওকে। কী করা যায় তা হলে। মেইন এলিভেটর বা সার্ভিস এলিভেটর ব্যবহার করা যাবে না। হামলার মুখে পড়লে বদ্ধ

জায়গায় কোণঠাসা হয়ে পড়বে। বাকি থাকে সিঁড়ি... শেষ, এবং একমাত্র পথ। সমস্যা হলো, প্রতিপক্ষও আন্দাজ করবে সেটা। একটাই উপায় আছে তার উপর টেক্কা দেবার।

ক্লিনিং লেডি আরেকটা কামরায় ঢুকেছে। বাইরে রয়ে গেছে তার কার্ট। ওদিকে এগিয়ে গেল রানা। কার্ট থেকে কাঁচের দুটো অ্যাশট্রে তুলে নিল, ওগুলো ঢুকিয়ে ফেলল পকেটে। তারপর পা বাড়াল স্টেয়ারকেসের দিকে।

সিঁড়ির ধাপ ধরে সাবধানে নামতে শুরু করল রানা, দেয়াল ঘেঁষে নামছে, খাড়া করে রেখেছে দু'কান। একটু পরেই সিঁড়ির নীচদিক থেকে ভেসে এল পদশব্দ। তাড়াহুড়ো করে উপরদিকে উঠে আসছে কেউ। রেলিঙের কাছে এসে উঁকি দিল ও। পলকের জন্য একটা ছায়া দেখা গেল, দ্রুত উঠে আসছে উপরে।

পকেট থেকে একটা অ্যাশট্রে বের করল রানা, লোকটা এক ফ্লোর নীচে থাকতে ছুঁড়ে দিল ওটা দুই রেলিঙের ফাঁক দিয়ে—ছ'তলার ল্যাণ্ডিঙের কংক্রিটের উপর আছাড় খেয়ে ঝন ঝন শব্দে ভেঙে গেল ওটা। ফলাফল দেখার জন্য অপেক্ষা করল না ও, দ্রুত নেমে এল কয়েক ধাপ, দ্বিতীয় অ্যাশট্রে-টাও ছুঁড়ে দিল। আবারও জোর আওয়াজ করে চৌচির হয়ে গেল ওটা। নীচ থেকে ভেসে এল গালাগাল।

ঝট্পট্ দুই ফ্লোরের মধ্যবর্তী ল্যাণ্ডিঙে নেমে এল রানা। দেয়াল ঘেঁষে শুয়ে পড়ল উপুড় হয়ে। ছ'তলার ল্যাণ্ডিং থেকে ওকে এখন দেখা যাবে না। ও-ও দেখতে পাচ্ছে না জায়গাটা, তবে তাতে অসুবিধে নেই। ভাঙা কাঁচ-ই এখন ওকে সাহায্য করবে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। একটু পরেই ভারী শ্বাস-প্রশ্বাসের আওয়াজ কানে এল ওর। তার পিছু পিছু ভেসে এল আরেকটা আওয়াজ—অ্যাশট্রের ভাঙা টুকরোগুলোর উপর পা

ফেলছে কেউ। জায়গামত লোকটাকে পৌঁছুতে দেবার জন্য একটু দেরি করল ও, তারপরেই ঝট্ করে উঠে বসল।

লম্বা একটা লোক, পরনে ওভারকোট, হাতে একটা অটোমেটিক পিস্তল নিয়ে এগোচ্ছে ছ'তলার স্টেয়ারকেসের দরজার দিকে। চোখের কোণে রানার নড়াচড়ার আভাস পেয়েই পাঁই করে ঘুরল, গুলি করার চেষ্টা করল, কিন্তু রানা অনেক এগিয়ে আছে। একটাই গুলি করল ও, বুলেটের আঘাতে দেয়ালের উপর আছড়ে পড়ল লম্বু। স্থির হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে।

উঠে দাঁড়াল রানা। নামতে শুরু করল সিঁড়ি বেয়ে। আধাআধি যেতেই প্রচণ্ড আওয়াজে কেঁপে উঠল ও, হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল পিস্তলটা। চমকে উঠে নীচে তাকাল; দেখতে পেল, রেলিঙের ফাঁক দিয়ে নীচ থেকে উঁকি দিচ্ছে আরেকজন—বেঁটেখাটো, মুখভর্তি দাড়ি। এর হাতে আরেকটা অটোমেটিক, ব্যারেল দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। স্রেফ কপাল, লোকটার ছোঁড়া গুলি রেলিঙে বাড়ি খেয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে; রানার শরীরের বদলে আঘাত হেনেছে হাতে ধরা সিগ-সাওয়ারের গায়ে।

সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের জন্য স্থির রইল রানা, তারপরেই উল্টো ঘুরে পড়িমরি করে উঠতে শুরু করল সিঁড়ি দিয়ে। পিস্তলটা উঠিয়ে আনার সুযোগ নেই, আগে খুনির নাগাল থেকে সরে যেতে হবে। পিছন পিছন ধাওয়া করে এল দাড়িঅলা। পাঁচতলার ল্যাণ্ডিঙে পৌঁছেই আবার গুলি ছুঁড়ল। এবারও নিশানা ঠিক থাকেনি, তবে একেবারে ব্যর্থও হয়নি সে।

উরুর পিছনে আঘাত লাগায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল রানা। নাকমুখ ঠুকে গেল সিঁড়ির ধাপে। সড়সড় করে নেমে এল ও কয়েক ফুট। চলৎশক্তি হারাল কিছুক্ষণের জন্য। সিঁড়ি ধরে ওর

গায়ের উপর উঠে এল খুনি। এক ঝটকায় চিৎ করল। তারপর পিস্তল তাক করল ওর কপালের দিকে।

'গুড বাই, মাসুদ রানা!' মুখে একটা হিংস্র হাসি এনে বলল লোকটা।

চোখ বন্ধ করে ফেলল রানা, পরক্ষণেই ভেসে এল গুলির আওয়াজ। কপাল এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যায়নি দেখে আবার চোখ মেলল ও।

হাসি মুছে গেছে দাড়িঅলা খুনির মুখ থেকে। অল্পক্ষণের জন্য স্থির হয়ে রইল, তারপরেই কাত হয়ে পড়ে গেল সিঁড়িতে। দৃষ্টিসীমা পরিষ্কার হয়ে যেতেই দীর্ঘদেহী একটা মূর্তিকে দেখতে পেল রানা। ছ'তলার ল্যাণ্ডিঙের দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে, হাতে উদ্যত পিস্তল, ধোঁয়া বেরুচ্ছে ব্যারেল থেকে।

কুয়াশা!

উঠে এল সে রানার কাছে। জিজ্ঞেস করল, 'তুমি ঠিক আছ তো, রানা?'

'আ... আপনি আমার জীবন বাঁচিয়েছেন!' ফিসফিসিয়ে বলল রানা।

'হ্যাঁ,' হাসল কুয়াশা। 'আগেই তো বলেছি, তোমাকে খুন করতে আসিনি আমি। এখন বিশ্বাস হয়েছে কথাটা?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

'গুড,' বলল কুয়াশা। 'এখন ওঠো। পুলিশ আসছে, তার আগেই সরে যেতে হবে আমাদেরকে এখান থেকে।'

এতক্ষণে খেয়াল করল রানা, দূরে কোথাও সাইরেন বাজছে। স্টেয়ারকেসের নীচ থেকে হৈ-হল্লা শোনা গেল। হোটেলের লোকজন সম্ভবত উঠে আসছে খোঁজখবর নিতে। কষ্টে-সৃষ্টে উঠে বসল রানা। দাঁড়াতে গিয়ে পড়ে গেল হুড়মুড় করে।

'এ কী! তুমি তো দেখছি আহত!' রক্ত দেখে বলে উঠল কুয়াশা।

'পায়ে গুলি লেগেছে। হাঁটতে পারব বলে মনে হচ্ছে না।' বলল রানা।

তাড়াতাড়ি রানার উরু পরীক্ষা করল কুয়াশা। বলল, 'সিরিয়াস কিছু না। গুলি বেরিয়ে গেছে মাংস ভেদ করে। ব্যাণ্ডেজ আর ওষুধ লাগালে ঠিক হয়ে যাবে দু'দিনে।' নিজের রুমাল দিয়ে ক্ষতটা বেঁধে দিল ও। 'ওঠো এবার। আমি তোমাকে সাহায্য করছি। পালাতে হবে আমাদেরকে।'

'কেন? আমি তো কিছু করিনি।'

'তারপরেও পুলিশ তোমাকে আটক করবে... মানে যতক্ষণ সবকিছু পরিষ্কার না হচ্ছে আর কী। চারজন খুনি ব্যর্থ হয়েছে, তার মানে এই নয় যে, আরও লোক পাঠাবে না ওরা। পুলিশ কাস্টডিতে কাউকে বাগে পাওয়া কত সহজ, তা আশা করি বুঝিয়ে দিতে হবে না তোমাকে?'

'কিন্তু কেন? কেন আমাকে খুন করতে চাইছে ওরা? আপনিই বা আমাকে সাহায্য করছেন কেন?'

'সবকিছু বলব, কিন্তু এখন নয়। আগে নিরাপদ কোনও জায়গায় যাওয়া দরকার।' রানাকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল কুয়াশা। নিজের কাঁধে ভর দিতে দিল।

'হোটেল থেকে বেরুনোর সব রাস্তা এতক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে, কুয়াশা,' শঙ্কিত গলায় বলল রানা।

'উঁহুঁ,' মাথা নাড়ল কুয়াশা। 'একটা রাস্তা এখনও আছে। আমি ছাড়া কেউ জানে না সেটা।'

'কোথায়?'

'ছাদে। এই বিল্ডিং আর পাশের বিল্ডিংটার মধ্যে একটা কমন

এয়ার-ডাক্ট আছে। ওটা ব্যবহার করব আমরা। ওপাশের বিল্ডিঙে পৌঁছে গেলে বেরিয়ে পড়তে অসুবিধে হবে না। পিছনের গলিতে গাড়ি আছে আমার।'

'এয়ার-ডাক্টের কথা কীভাবে জানেন আপনি?'

'ওয়াশিংটনে এটাই আমার থাকার জায়গা, রানা। কী ধারণা তোমার, সবার চোখ এড়িয়ে কীভাবে আসা-যাওয়া করা যাবে, সেসব না জেনেই সিলেক্ট করেছি হোটেলটা?'

আর কিছু বলল না রানা। কুয়াশার কাঁধে ভর দিয়ে উঠতে শুরু করল সিঁড়ি ধরে। ছাদের দিকে যাচ্ছে। ওর নীরবতা লক্ষ করে কুয়াশা বলল, 'তুমি কি এখনও আমাকে অ্যারেস্ট করার কথা ভাবছ?'

'হ্যাঁ,' স্বীকার করল রানা। 'কিন্তু আপনি আমার জীবন বাঁচিয়েছেন। তার প্রতিদান হিসেবে আর কিছু না হোক, আপনার বক্তব্য শুনব আমি। যা কিছু ঘটে গেল এই হোটেলে, তাতে মনে হচ্ছে সব কথা না শুনলে বিরাট ভুল হবে।'

'খুব ভাল সিদ্ধান্ত,' হাসল কুয়াশা।

নয়

কেবিনটা মেরিল্যাণ্ডের প্রত্যন্ত এলাকায়, পাটুক্সেন্ট নদীর ধারে। তিনদিকে জংলা, অন্যদিকে পানি—একেবারে বিচ্ছিন্ন একটা জায়গা। আশপাশের দু-চার মাইলের ভিতর আর কোনও ঘরবাড়ি

নেই। পুরনো আমলের একটা ভাঙাচোরা কাঁচা রাস্তা দিয়ে কেবল পৌঁছুনো যায় ওখানে।

সেফ-হাউস হিসেবে রানা ব্যবহার করে এই কেবিন। কাগজে-কলমে জায়গাটার মালিক রসায়নের এক প্রফেসর। প্রবাসী বাংলাদেশি তিনি, জর্জটাউনের ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনা করেন, জীবনে কোনোদিন এখানে পা রাখেননি। বেলা তিনটায় ওখানে পৌঁছুল রানা আর কুয়াশা। সঙ্গের পুরনো আমলের টয়োটা সেডান গাড়িটা লুকিয়ে ফেলল ঝোপঝাড়ের ভিতর, ঢেকে ফেলল গাছের ডাল আর পাতা দিয়ে। তারপর পা রাখল কেবিনে।

ভিতরটা সুন্দরভাবে সাজানো। কাঠের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি ভারী বিম আর পুরু দেয়ালের সঙ্গে মানানসই ফার্নিচার শোভা পাচ্ছে ঘর জুড়ে। সামনের কামরায় সোফা আর ইজিচেয়ার মুখ করে রাখা হয়েছে পুরনো আমলের পাথুরে ফায়ারপ্লেসের দিকে, জানালায় ঝুলছে গ্রামীণ চেকের পর্দা। একপাশের দেয়াল ঢাকা পড়ে গেছে মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত উঁচু বুকশেলফের আড়ালে—প্রতিটা তাকে সাজিয়ে রাখা হয়েছে নানা ধরনের বিষয়বস্তুর উপর অসংখ্য বই।

'চমৎকার!' কেবিনের উপর নজর বুলিয়ে মন্তব্য করল কুয়াশা।

'ম্যান্টেলের উপর দেশলাই পাবেন,' বলল রানা। 'ফায়ারপ্লেসে লাকড়িও আছে। আগুন জ্বেলে ফেলুন। আমি খাবার-দাবারের ব্যবস্থা দেখছি।'

'বাহ্, সব দেখছি রেডি!'

'এটাই এ-কেবিনে থাকার একমাত্র নিয়ম। যাবার সময় ফায়ারপ্লেস পরিষ্কার করে নতুন লাকড়ি রেখে যেতে হবে।'

দেশলাই নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসল কুয়াশা। কিছুক্ষণের মধ্যেই

ধরিয়ে ফেলল আগুন। মৃদু তাপ ছড়াতে শুরু করল ফায়ারপ্লেস। ঊরুর ক্ষত থেকে রক্তপাত বন্ধ হয়েছে, আড়ষ্ট হয়ে আছে জায়গাটা, কিন্তু হাঁটতে পারছে এখন রানা। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে গেল কিচেনে। খাবারের কেবিনেট আর ফ্রিজ খুলে দেখল—কয়েকদিন চলবার মত শুকনো খাবারের অভাব নেই। সন্তুষ্ট হয়ে স্টোভ জ্বালল। তাতে চড়িয়ে দিল পানি। তারপর ফিরে এল বসার ঘরে।

কুয়াশা একটা ইজিচেয়ার নিয়ে বসে পড়েছে ফায়ারপ্লেসের সামনে। ঘরে একটা গ্যাসচালিত হিটার আছে, পুরো কেবিনকে তাপ জোগায়—ওটা চালু করল রানা, তারপর এগিয়ে গেল কুয়াশার দিকে।

'এখন আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারব না আমি,' বলল রানা। 'শরীরে শক্তি পাচ্ছি না একদম। বিশ্রাম প্রয়োজন। ঘুম থেকে উঠে নাহয় বসা যাবে একসঙ্গে। কী বলেন?'

'আমার কোনও আপত্তি নেই,' বলল কুয়াশা। 'কিন্তু তোমার পায়ের চিকিৎসা দরকার।'

'ফার্স্ট এইড কিট আছে এখানে। পানিও গরম দিয়েছি। ক্ষতটা পরিষ্কার করে মলম-ব্যাণ্ডেজ লাগিয়ে নেব।'

'আমি সাহায্য করব?'

'দরকার নেই। নিজেই পারব। আপনি বিশ্রাম নিন। কিছু মনে করবেন না, আমি বেডরুমটা নিচ্ছি, আপনাকে সোফায় শুতে হবে।' আঙুল তুলে একটা আলমারি দেখাল রানা। 'ওর ভিতর বালিশ-কম্বল পাবেন। খিদে পেলে কিচেনে শুকনো খাবার আছে।'

'আমাকে নিয়ে ভেবো না,' বলল কুয়াশা। 'তুমি যাও।'

'ঘুম থেকে উঠে আপনাকে পাবো তো এখানে?' সন্দিহান

গলায় বলল রানা।

হাসল কুয়াশা। 'তেমন কোনও ইচ্ছে থাকলে তোমার সঙ্গে এত ঝামেলা করে দেখা করতে আসতাম?'

'তা অবশ্য ঠিক,' স্বীকার করল রানা। 'ঠিক আছে। কয়েক ঘণ্টা পর দেখা হবে আবার।'

গরম পানি নিয়ে বেডরুমে ঢুকল রানা। মেডিসিন কেবিনেট থেকে বের করে আনল ফার্স্ট এইড কিট। তোয়ালে ভিজিয়ে পরিষ্কার করল পা আর কাঁধের ক্ষত। ডিজইনফ্যাক্টেন্ট মাখাল, তারপর পরিষ্কার ব্যাণ্ডেজ বাঁধল দু'জায়গায়। এটুকুতেই ক্লান্তিতে শরীর ভেঙে পড়ার জোগাড়। ঢাকায় ফোন করার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সেটা আর হলো না। শুয়ে পড়ল ও। তলিয়ে গেল অতল ঘুমে।

মৃদু চড় চড় শব্দে ঘুম ভেঙে গেল রানার। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা আর ইন্সটিঙ্কটের বশে সতর্ক হয়ে গেল মুহূর্তে। বালিশের তলায় গোঁজা সিগ-সাওয়ারটা চলে এসেছে হাতে, আলতোভাবে একটা পা ঝুলিয়ে দিয়েছে বিছানার বাইরে। গোলমালের আভাস দেখলেই গড়ান দিয়ে মেঝেতে নেমে যাবার জন্য প্রস্তুত।

কিন্তু ও ছাড়া আর কেউ নেই কামরায়। উত্তরপাশের জানালা গলে চাঁদের আলো ঢুকছে ভিতরে, সাদাটে একটা আভায় ম্লানভাবে আলোকিত হয়ে আছে চারপাশ। অদ্ভুত সুন্দর পরিবেশ। ক্ষণিকের জন্য মনে পড়ল না কোথায় আছে. গভীর ঘুম থেকে জাগলে এমনটা হয় মানুষের। মেঝেতে পা ঠেকানোর সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য ফিরে এল সব স্মৃতি। বিছানার কিনারে পা ঝুলিয়ে উঠে বসল ও।

হাতঘড়ির লিউমিনাস ডায়ালে চোখ বোলাল রানা। ভোর সোয়া চারটে বাজে। প্রায় তেরো ঘণ্টা ঘুমিয়েছে ও। ক্লান্তি তো

কমেইনি, মনে হচ্ছে যেন বেড়ে গেছে আরও। ঘাড় আর পায়ের আড়ষ্টতাও কমেনি। গলা শুকিয়ে খসখসে হয়ে আছে। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল ও, স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করছে। ঘর ভীষণ ঠাণ্ডা হয়ে আছে, হিটার কাজ করছে না বোধহয়। পিস্তল নামিয়ে রেখে দু'হাতের তালু ঘষল, ম্যাসাজ করল শরীরের এখানে-ওখানে। তারপর উঠে দাঁড়াল।

দরজা খুলে কেবিনের সামনের কামরায় উঁকি দিল রানা। কুয়াশা জেগেছে, আধশোয়া হয়ে আছে ফায়ারপ্লেসের সামনে ইজিচেয়ারে, হাতে ধূমায়িত মগ, মাঝে মাঝে চুমুক দিচ্ছে তাতে। চড় চড় শব্দটা আসছে ফায়ারপ্লেস থেকে। নতুন লাকড়ি চড়িয়েছে কুয়াশা। আগুনের তাপে শব্দ করে ফাটছে ভেজা কাঠ।

'গুড মর্নিং!' বেডরুম থেকে বেরিয়ে এসে বলল রানা।

অভ্যাসবশত কোলে রাখা পিস্তলের দিকে হাত চলে যাচ্ছিল কুয়াশার, মাঝপথে থামাল নিজেকে। ঘাড় ফিরিয়ে হাসল। 'গুড মর্নিং, রানা। ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছি নাকি?' ইজিচেয়ারে সোজা হয়ে বসল ও।

'আপনি ভাঙাননি, ভাঙিয়েছে ঠাণ্ডা। ব্যাপার কী? হিটারটা বন্ধ হয়ে গেছে?'

'হুঁ। গ্যাস বোধহয় শেষ। বাধ্য হয়ে নতুন লাকড়ি চড়াতে হয়েছে ফায়ারপ্লেসে।'

'ঘুমাননি?'

'ঘুমিয়েছি, তবে তোমার মত না। বাইরে একটা চোখ রাখতে হয়েছে সারাক্ষণ।'

'দরকার ছিল না। এই কেবিন পর্যন্ত আমাদেরকে ট্র্যাক করা খুব কঠিন।'

'তাও... কখন কী ঘটে যায়, তা তো বলা যায় না। যারা

আমাদের পিছনে লেগেছে, তাদেরকে ছোট করে দেখার উপায় নেই।'

'শুনব সবই, তার আগে একটু শরীর গরম করা দরকার। আপনার হাতে কফি নাকি?'

'হুঁ। কিচেনে পানি গরম করে রেখেছি। বানাতে পারবে, নাকি আমি বানিয়ে আনব?'

'না, না। আমিই পারব।'

কিচেনে চলে গেল রানা। কফি নিয়ে ফিরে এল একটু পর। কুয়াশার মুখোমুখি সোফায় বসে বলল, 'আপনার ব্যাপারে একটা খটকা আছে আমার, কুয়াশা। সামান্য খোঁড়ানো ছাড়া বলতে গেলে একেবারে স্বাভাবিকভাবেই চলতে-ফিরতে দেখছি আপনাকে। অথচ ফাইল বলে, একটা পা নেই আপনার... লিম্পোপো নদীতে কুমিরের আক্রমণে নাকি হারিয়েছেন ওটা।'

'ভুল নয় কথাটা,' কুয়াশা বলল, 'প্লাস্টিকের তৈরি নকল পা ব্যবহার করি আমি।'

'নকল পা দিয়ে স্বাভাবিক হাঁটাচলা বা দৌড়ানো যায় না বলে ধারণা ছিল আমার।'

'এই পা আমার নিজের আবিষ্কার। দুনিয়ার সবচেয়ে উন্নত আর্টিফিশিয়াল লিম্ব। অল্প সময়ের জন্য এই পা দিয়ে একেবারে স্বাভাবিক চলাফেরা করা যায়, দৌড়ঝাঁপও করা যায়। ছড়িও একটা রাখি সঙ্গে, ওটা প্রয়োজন হয় দীর্ঘ সময় পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে, কিংবা হাঁটতে হলে। ওটা মাঝে মাঝে ডাইভারশন হিসেবেও কাজ করে। পঙ্গু লোককে সহজে সন্দেহ করে না কেউ।'

'এ তো খুব ভাল আবিষ্কার! পঙ্গু মানুষের জীবন বদলে দিতে পারে। সারা দুনিয়ার সঙ্গে শেয়ার করছেন না কেন?'

'কারণ আর্টিফিশিয়াল লিম্বের ম্যানুফ্যাচারার, বা মেডিক্যাল কোম্পানিগুলো আমার মত ক্রিমিনালের সঙ্গে কোনও ধরনের সংস্পর্শ রাখতে রাজি নয়। টেকনোলজি নেবার মত চুক্তি করা তো অনেক পরের কথা।'

'হুম! এনিওয়ে, আপনার যদি আপত্তি না থাকে, এবার আমরা কাজের কথা বলতে পারি, কুয়াশা।'

'*আপনি* ডাকাটা বাদ দেয়া যায় না?' বলল কুয়াশা। '*তুমি* করে ডাকলে আমি খুব খুশি হবো, রানা।'

'দুঃখিত,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'বয়সে আপনি আমার চেয়ে বড়, তা ছাড়া এক ধরনের সমীহও আছে আমার আপনার প্রতি।'

'সমীহ নয়, আমি তোমার বন্ধুত্ব চাই, রানা।'

'বন্ধু হবার মত কিছু ঘটেনি এখনও। যতকিছু হোক, আপনি একজন অপরাধী, কুয়াশা। অপরাধীর সঙ্গে বন্ধুত্ব করার ব্যাপারে আমার অনীহা আছে। আপনার মধ্যে ভাল গুণ যেটুকু আছে, তা আমার সমীহ পাবার উপযুক্ত। কিন্তু বন্ধু হতে চাইলে আপনাকে অপরাধের রাস্তা থেকে সরে আসতে হবে।'

'ন্যায়-অন্যায়ের সংজ্ঞার বিষয়ে তোমার-আমার ভিতরে দ্বিমত আছে। মন্দ লোকের জীবন, কিংবা তাদের সম্পদ লুটেপুটে নেয়াকে অন্যায় মনে করি না আমি।'

'ওদেরকে শাস্তি দেবার জন্য আইন আছে... আদালত আছে।'

'আমরা কি এসব নিয়েই তর্ক করব এখন? এরচেয়ে অনেক সিরিয়াস একটা সমস্যা নিয়ে আমি তোমার কাছে এসেছি, রানা।'

'হ্যাঁ, ও-বিষয়েই কথা বলব,' বলল রানা। সিগ-সাওয়ার তুলে তাক করল কুয়াশার দিকে। 'তবে তার আগে আপনার পিস্তলটা

আমাকে দিয়ে দিন।'

'মানে?' ভুরু কোঁচকাল কুয়াশা।

'আপনাকে আমি বিশ্বাস করি না। সব কথা শোনার পর যে সাহায্য করব, এমন কোনও আশ্বাসও দিচ্ছি না। তাই পালাবার চেষ্টা করতে পারেন। এ-অবস্থায় আপনাকে আমি কোনও অস্ত্র রাখতে দিতে পারি না।'

'ধ্যাত্তেরি! তুমি এখনও ওই নিয়েই আছ?'

শান্ত রইল রানা। 'পিস্তলটা, কুয়াশা। তার আগে আমার কাছ থেকে কোনও রকম সহযোগিতা পাবেন না।'

মুখ দিয়ে বিরক্তিসূচক একটা শব্দ করল কুয়াশা। বুঝতে পারছে, টলানো যাবে না রানাকে। কী আর করা, কাঁধ ঝাঁকিয়ে পিস্তলটা বাড়িয়ে ধরল। ওটা নিয়ে কোমরে গুঁজে রাখল রানা। নিজেরটাও নামিয়ে রাখল কোলের উপর।

'এবার আপনার কথা শুরু করতে পারেন,' বলল ও।

'এসবের প্রয়োজন ছিল না,' অসন্তুষ্ট শোনাল কুয়াশার কণ্ঠ।

'আমার মতে... ছিল। যা হোক, কী বলতে চান বলুন। নাকি রাগ করে মুখে তালা আঁটবেন?'

কয়েক মুহূর্ত স্থির দৃষ্টিতে রানাকে দেখল কুয়াশা। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে হেলান দিল চেয়ারে। জিজ্ঞেস করল, '*ফেনিস* নামে কোনও সংগঠনের নাম শুনেছ তুমি?'

একটু ভেবে নিল রানা। বলল, 'অনেক পুরনো একটা গুপ্তসংঘ, তাই না? ভাড়াটে খুনির দল, রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের এক্সপার্ট—কর্সিকার একটা কাউন্সিল ওদেরকে নিয়ন্ত্রণ করত। পঞ্চাশের দশকে সংঘটা বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলে শুনেছি। হঠাৎ ওদের কথা কেন?'

'সংঘটা বিলুপ্ত হয়নি, রানা। গা-ঢাকা দিয়েছিল আসলে।

ইদানীংকালে আবার ফিরে এসেছে... এবার আগের চেয়েও কয়েকগুণ ভয়ঙ্কর হয়ে। পৃথিবীর বড় বড় সমস্ত দেশের সরকারে লোক ঢুকিয়ে দিয়েছে ওরা। নিয়ন্ত্রণ করছে টেরোরিস্ট আর অপরাধীদেরকেও। একটা কিছু উদ্দেশ্য আছে ওদের, সেটা পরিষ্কার নয় এখনও। আমেরিকার জয়েন্ট চিফ অভ স্টাফ, আর রাশার টপ নিউক্লিয়ার ফিযিসিস্ট খুন হয়েছে কিছুদিন আগে... দুটোই ওদের কীর্তি।'

কফির মগের উপর দিয়ে কৌতূহলী দৃষ্টিতে কুয়াশার দিকে তাকাল রানা। বলল, 'আমার কানে এসেছে, ড. ইভানোভিচকে আপনি খুন করেছেন।'

'মিথ্যে কথা,' দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ করল কুয়াশা। 'সব ফেনিসের চালাকি। ওরাই আমাকে ফাঁসিয়ে দিতে চেষ্টা করছে।'

'ফেনিসের খবর আপনি জেনেছেন কীভাবে?' ও জিজ্ঞেস করল। 'বিশ্বাসই বা করছেন কেন?'

'যে-লোক আমাকে এসব বলেছে, তাকে অবিশ্বাস করবার কোনও কারণ নেই। তা ছাড়া আমাকে সবকিছু খুলে বলার পরপরই তাকে খুন করা হয়েছে। কোনোরকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি আমি।'

'কে এই লোক?'

'লিও ভাদিম। কেজিবি-র প্রাক্তন ইনফরমেশন গ্যাদারার।'

কপালে ভাঁজ পড়ল রানার। ভাদিমের ব্যাপারে জানা আছে ওর। 'কর্নেল ভাদিম আপনাকে ফেনিসের ব্যাপারে বলেছে?'

'হ্যাঁ। বেসিক্যালি, ও নিজেও সংঘটার সদস্য ছিল। কাম অন, রানা। ভাল করে ভেবে দেখো, ড. ইভানোভিচকে কেন খুন করব আমি? তিনি আমার গুরু ছিলেন, বাবার মত সম্মান করতাম তাঁকে। আমি বরং তাঁর খুনির ব্যাপারে খোঁজখবর নিচ্ছিলাম।

সেটা পছন্দ হয়নি ফেনিসের। আমাকে মিথ্যে অভিযোগ ফাঁসিয়ে দিয়েছে, খুন করবার চেষ্টা করেছে। এরা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর, রানা। নিজেদের অস্তিত্ব লুকিয়ে রাখার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি রকমের সতর্ক। কাউকে থ্রেট মনে হলেই সরিয়ে দিচ্ছে দুনিয়া থেকে। গতকাল ওরাই তোমাকে খুন করবার জন্য হিট-টিম পাঠিয়েছিল। কারণ ওরা জানত, আমি তোমার সাহায্য নেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

খবরটা হজম করার জন্য একটু সময় নিল রানা। কেন যেন অবিশ্বাস করতে পারছে না ও কুয়াশার কথা। একটু পর জিজ্ঞেস করল, 'ঠিক কী বলেছে আপনাকে লিও ভাদিম?'

সংক্ষেপে মস্কোর সেই সন্ধ্যার কথা খুলে বলল কুয়াশা। শেষে যোগ করল, 'বুঝতেই পারছ, ব্যাপারটা খুবই সিরিয়াস।'

'অভিযোগ গুরুতর, তাতে সন্দেহ নেই,' মাথা ঝোঁকাল রানা। 'কিন্তু প্রমাণ কোথায়? বিভিন্ন দেশের সরকারে ফেনিসের লোক বসে আছে বলছেন, কিন্তু এসব কথা তো অতীতে বহুবার... বহু সংগঠনের ব্যাপারে শোনা গেছে। কখনোই খুব বেশি সত্যতা পাওয়া যায়নি।'

'অন্তত ফেনিসের ব্যাপারে সত্যতা পাওয়া যাবেও না। কেউ মুখ খোলার চেষ্টা করলেই তাকে সরিয়ে দিচ্ছে ওরা। জেনারেল ওয়ার্নার আর ড. ইভানোভিচ তার উজ্জ্বল প্রমাণ।'

'একটা ব্যাপার আমার মাথায় ঢুকছে না—সরকারকে নাহয় জায়গামত লোক বসিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব, টেরোরিস্টদেরকে কীভাবে করছে? এ-কথা বলবেন না যে, দুনিয়ার সমস্ত সন্ত্রাসীদেরকে ওরা সৃষ্টি করেছে।'

'তা বলছি না। তবে নিয়ন্ত্রণ কীভাবে করা হচ্ছে, তা আন্দাজ করতে পারি। টাকা... টাকা দিচ্ছে ওরা সবাইকে। টেরোরিস্টরা টাকার উৎস নিয়ে কখনও মাথা ঘামায় না, পেলেই খুশি।

বিনিময়ে জোগানদাতার কথাও শুনবে।'

'কিন্তু দুনিয়াজুড়ে অস্থিরতা সৃষ্টি করে কী লাভ হচ্ছে ওদের?'

'আমার কোনও ধারণা নেই। ভাদিমও বলতে পারেনি। ও শুধু বলেছে, কর্সিকায় গেলে এর জবাব মিলতে পারে।'

'কর্সিকা? কেন?'

'ওখানে জন্ম হয়েছিল ফেনিসের...'

'হয়তো,' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'কিন্তু আমি যদ্দূর জানি, চল্লিশের দশকে ছড়িয়ে পড়েছিল ওরা। টাকার বিনিময়ে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটাত; কণ্ট্রাক্ট নিত লণ্ডন, নিউ ইয়র্ক, কিংবা বার্লিন থেকে—আন্তর্জাতিক ট্রাফিকের কেন্দ্রবিন্দু ওসব জায়গা। এখনও কর্সিকায় ওদের ঘাঁটি আছে বলে মনে হয় না আমার।'

'তারপরেও ওখানে কোনও না কোনও সূত্র থাকতে বাধ্য। কর্সিকার এক কাউন্টি... গিলবার্তে বারেমির হাতে জন্ম হয়েছিল সংঘটার। অন্তত পর্যন্ত এই একটা নামই নিশ্চিতভাবে জড়ানো গেছে ফেনিসের সঙ্গে। ওর সঙ্গী কারা ছিল? কোথায় গেছে ওরা? এসব কর্সিকায় গেলে জানা সম্ভব।'

'এ-কাজের জন্যই সাহায্য চাইছেন আমার?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'ফেনিসের ব্যাপারে তদন্ত করতে? ওদেরকে ঠেকাতে?'

'হ্যাঁ।' মাথা ঝাঁকাল কুয়াশা।

'কেন সাহায্য করব আপনাকে, সেটা বলতে পারেন?' বাঁকা সুরে বলল রানা। 'যা-ই ঘটাক ফেনিস, যত ষড়যন্ত্র-ই আঁটুক, আপনাকে... কিংবা আর যাকেই ফাঁসাক, তা নিয়ে আমার মাথাব্যথা কীসের?'

'মাথাব্যথাটা নিজের জন্যই হওয়া উচিত, রানা,' গম্ভীর গলায় বলল কুয়াশা। 'ওদের হিটলিস্টে এখন তোমার নামও উঠে

গেছে। যতক্ষণ না ওদেরকে ধ্বংস করতে পারছ, ততক্ষণ কিছুতেই তোমার পিছু ছাড়বে না ফেনিস। কিন্তু না, এ-যুক্তি দেখিয়ে তোমাকে দলে টানতে চাই না আমি। আমি যুক্তি দেখাব মানবতার... ন্যায়ের। পুরো দুনিয়ার জন্য ফেনিস একটা অভিশাপ, রানা। তুমি-আমি ছাড়া ওদের বিপক্ষে দাঁড়াবার মত কেউ আর বেঁচে নেই এ-মুহূর্তে।'

'সারা দুনিয়ার জন্য লড়বেন আপনি? বিশ্বাস করি না।'

'কেন? আমি অমন লোক নই? বৃহত্তর স্বার্থে কিছু করতে পারি না আমি? আগে কখনও করিনি? নাকি সেসবের রেকর্ড নেই বিসিআইয়ের ফাইলে? হ্যাঁ, ব্যক্তিগত একটা স্বার্থ আছে আমার—ড. ইভানোভিচের খুনিদেরকে শাস্তি দিতে চাই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, বাকি পৃথিবীর ব্যাপারে আমার কোনও মাথাব্যথা নেই।'

কুয়াশার কণ্ঠের গভীরতা স্পর্শ করল রানাকে। বুঝতে পারল, বাগাড়ম্বর নয়, সত্যিই আন্তরিক মানুষটা। নীরব হয়ে গেল ও। একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, আপনার কথা বিশ্বাস করলাম আমি। কিন্তু সাহায্য করব কি না, সে-ব্যাপারে এখুনি কিছু বলতে পারছি না। আগে বিসিআই হেডকোয়ার্টারে কথা বলতে হবে আমাকে।'

'জানি,' কুয়াশা বলল। 'ফেনিসের বিরুদ্ধে কাজ করতে হলে বিসিআই-এর সাহায্য এবং অনুমতি... দুটোই প্রয়োজন হবে তোমার। ওরা আমাদের পিছনে থাকলে সুবিধেও পাওয়া যাবে হয়তো। সেজন্যেই সরাসরি তোমার সঙ্গে যোগাযোগ না করে মেসেজ পাঠিয়েছিলাম ওখানে।'

'একটু অপেক্ষা করুন,' বলে উঠে দাঁড়াল রানা। 'প্লিজ, কোনও চালাকি নয়, আমার চোখ থাকবে আপনার উপর।' পায়ে

পায়ে পিছিয়ে রুমের একপ্রান্তে চলে গেল ও, কুয়াশার শ্রবণসীমার বাইরে। পকেট থেকে বের করে আনল নিজের সেলফোন। ডায়াল করল বিসিআই চিফের প্রাইভেট নাম্বারে। স্ক্র্যাম্বলড্ লাইন ওটা, কারও পক্ষে আড়ি পাতা সম্ভব নয়।

একবার মাত্র রিং হলো, তারপরেই শোনা গেল গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর। 'ইয়েস?'

দিব্যচোখে রানা দেখতে পেল, প্রায়ান্ধকার রুমটায় বসে আছেন মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান, চুরুটের ধোঁয়ায় ভরে আছে ঘরটা। কাঁচাপাকা ভুরুর নীচে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা এত দূর থেকেও যেন অনুভব করতে পারছে ও। পুরোটাই কল্পনা, তারপরেও বুকটা কেন যেন ঢিব ঢিব করতে থাকল। কোনোরকমে নার্ভাসনেসটা কাটিয়ে বলল, 'রানা, স্যর। সুসংবাদ আছে, কুয়াশা এখন আমার কবজায়।'

'ফরগেট কুয়াশা,' বললেন রাহাত খান, সিরিয়াস শোনাচ্ছে তাঁর গলা। 'কী ঘটেছে ওখানে, বলো তো? আমেরিকানরা এভাবে খেপে উঠেছে কেন?'

'খেপে উঠেছে?' বিস্মিত গলায় বলল রানা।

'হ্যাঁ। তোমার নামে হুলিয়া জারি করেছে এফবিআই। পুরস্কার ঘোষণা করেছে গ্রেফতার করবার জন্য।'

'কী! কেন?'

'বিশ্বাস করবে কি না জানি না,' তিক্ত গলায় বললেন রাহাত খান, 'জেনারেল গ্রেগরি ওয়ার্নারকে খুনের অভিযোগ আনা হয়েছে তোমার বিরুদ্ধে!'

'জয়েন্ট চিফ অভ স্টাফকে?' চমকে উঠল রানা। এতক্ষণে বুঝতে পারল কুয়াশার কথার গুরুত্ব... পেল ফেনিসের ক্ষমতার প্রমাণ। 'এ-সব মিথ্যে, স্যর!'

'তা আমরা সবাই জানি। কিন্তু কথা হলো, কেন ফাঁসাচ্ছে তোমাকে? কার বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছ তুমি?'

'কুয়াশা যে-ব্যাপারে আমার সাহায্য চাইছে, তার সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে, স্যর।' ফেনিসের বিষয়ে সবকিছু খুলে বলল রানা।

'হুম!' রানা কথা শেষ হলে বললেন রাহাত খান। 'ব্যাপারটা সত্য বলেই মনে হচ্ছে। আমেরিকান আর রাশান সরকারের বড় বড় পদে ফেনিসের লোক আছে, নইলে তোমাকে বা কুয়াশাকে কিছুতেই ফাঁসাতে পারত না... তাও আবার একই কায়দায়। তোমাদেরকে সরাবার জন্য যে-রকম মরিয়া হয়ে উঠেছে ওরা, তাতে তো আর কিছু ভাবা চলে না।'

'কী করব তা হলে, স্যর?'

'অফিশিয়ালি এ-মুহূর্তে তোমাকে কোনও অ্যাসাইনমেণ্ট দিতে পারি না আমি। কিন্তু নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য যে-কোনও পদক্ষেপ নেবার অধিকার তোমার আছে। তাতে যদি একটা গুপ্তসংগঠনের বিপক্ষে লড়তে হয়, লড়বে না?'

চিফের ইশারা বুঝে নেয়া কঠিন নয়। বলল, 'কুয়াশার ব্যাপারে কী করব, স্যর? যদি বলেন তো ওকে বাংলাদেশে পৌঁছে দিয়ে কাজে নামতে পারি।'

'তোমার কি সেরকমই ইচ্ছে?'

একটু দ্বিধায় পড়ে গেল রানা। শেষ পর্যন্ত সত্যি কথা বলল, 'না, স্যর। ও নির্দোষ। ফেনিসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যদি আমার পাশে থাকে, তা হলে সুবিধে হবে। সমস্যা একটাই—কাজ শেষে... মানে যদি শেষ করতে পারি আর কী... ও আবার গায়েব হয়ে যাবে।'

'ওটা ঠেকানো যায় না?'

'কী জানি, স্যর। জেলে পাঠানো হবে না, এ-ধরনের

প্রতিশ্রুতি দিলে হয়তো বা আত্মসমর্পণ করবে। আমি শিয়োর না।'

'কুয়াশাকে জেলে পাঠানোর ইচ্ছে আমারও নেই। ওর মত প্রতিভাকে চোদ্দোশিকের পিছনে আটকে রাখলে দেশের কোনও উপকার হবে না। তারচেয়ে যদি ওকে শুধরে নিয়ে কাজের সুবিধে দেয়া যায়, তাতেই সবার লাভ।'

'তা হলে কী করব, স্যর?'

'ব্যাপারটা আপাতত তোমার হাতে ছেড়ে দিচ্ছি, রানা। বিসিআই-এর জন্য এ-মুহূর্তে কুয়াশার চেয়ে তোমার গুরুত্ব অনেক বেশি। মিথ্যে অভিযোগ নিয়ে তুমি পালিয়ে বেড়াও, তা চাই না আমরা কেউই। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের জন্য কী করবে, কাকে সঙ্গে নেবে, সেটা তোমার ব্যাপার।'

'বুঝতে পেরেছি, স্যর।'

'আর হ্যাঁ, ফেনিসের খবর নেয়ার জন্য এখুনি কর্সিকায় যাবার দরকার আছে বলে মনে হয় না। আগে আশপাশে খোঁজ নাও। আমেরিকায় যদি ওদের সামান্যতম চিহ্নও থাকে, সেটা জর্জ বলতে পারবে। এ-পরিস্থিতিতে সাহায্যও করতে পারবে ও। যোগাযোগ করো ওর সঙ্গে।'

ন্যাশনাল আণ্ডারওয়াটর অ্যাণ্ড মেরিন এজেন্সির চিফ, অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের কথা বলছেন রাহাত খান, বুঝতে পারল রানা। জবাব দিল, 'ঠিক আছে, স্যর।'

'সাবধানে থেকো, এমআরনাইন,' বললেন রাহাত খান। 'শুভকামনা রইল।'

কথা শেষ করে ফিরে এল রানা।

'তোমার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে সুসংবাদ আছে,' হালকা গলায় মন্তব্য করল কুয়াশা।

'সুসংবাদ-দুঃসংবাদ... দুটোই।' বলল রানা। 'এফবিআই আমার নামে জেনারেল ওয়ার্নারের খুনি হিসেবে হুলিয়া জারি করেছে। আর উপায় নেই, ষড়যন্ত্রটার পিছনে কারা জড়িত, তা বের করতে হবে আমাকে। তাই আপনাকে সাহায্য করব আমি। কিন্তু এক শর্তে। আপনাকে কথা দিতে হবে, কাজটা শেষ হলে আমার সঙ্গে ফিরে যাবেন দেশে। আপনি একজন প্রতিভাবান বিজ্ঞানী, কুয়াশা... বাংলাদেশের জন্য অমূল্য এক সম্পদ। অন্যায়ের পথে ছোটাছুটি করে নিজেকে অপচয় করা মানায় না আপনাকে। চিফের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার—আপনি যদি নিজেকে শুধরে নেন, তা হলে গবেষণার জন্য সব ধরনের সাহায্য করব আমরা। আপনার সমস্ত ক্রিমিনাল রেকর্ড মুছে ফেলা হবে। বিসিআইয়ের তত্ত্বাবধানে গবেষণা করবেন আপনি; যত ফাণ্ড লাগে, আমরা তা ম্যানেজ করে দেব। রাজি আছেন?'

'লোভনীয় প্রস্তাব,' স্বীকার করল কুয়াশা। 'কিন্তু তোমরা যে কথা রাখবে, তার গ্যারান্টি কী?'

'আমার উপরে বিশ্বাস রাখতে হবে আপনাকে। একই কথা খাটে আমার বেলাতেও—আপনার মুখের কথায় আস্থা রাখতে হবে আমাকে। ভদ্রলোকের চুক্তি হবে আমাদের মধ্যে... ওয়ার্ড অভ অনার।'

মাথা নিচু করে একটু ভাবল কুয়াশা। তারপর বলল, 'ঠিক আছে, আমি রাজি। তবে ছোট্ট একটা শর্ত আমারও আছে—গবেষণা আমি নিজের ইচ্ছে অনুসারে করব। কোনও ধরনের তদারকি বা আদেশ-নির্দেশ দেয়া যাবে না।'

'অন্যায় কোনও আবদার না করলে বাধা পাবেন না।'

'যেমন?'

'মানুষকে গিনিপিগ বানানোর কথা বলছি। ওসব চলবে না।

অন্যান্য গবেষকরা যেভাবে কাজ করে, সেভাবেই কাজ করতে হবে আপনাকে। প্রয়োজন হলে ল্যাব-অ্যানিমেলের উপর টেস্টিং চালাবেন।'

'যুক্তিসঙ্গত প্রস্তাব। আমার কোনও আপত্তি নেই।'

'গুড,' সোফায় বসে পড়ল রানা। কুয়াশাকে ফিরিয়ে দিল ওর পিস্তল। 'এবার হাতের কাজটা নিয়ে মাথা ঘামানো যাক।'

'কর্সিকায় যাবার কথা বলছ?' জিজ্ঞেস করল কুয়াশা।

'না। ওটা পরে করলেও চলবে। আগে আমরা অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের সঙ্গে দেখা করব। আমার বসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু তিনি, আমাকে বিশেষ স্নেহ করেন। বিশ্বস্ত, এবং হাইলি কানেক্টেড মানুষ। আমেরিকায় ফেনিসের ব্যাপারে কোনও ক্লু থাকলে সেটা তাঁর কাছে পাওয়া যাবে।'

'নুমার ডিরেক্টরের কথা বলছ?' ভ্রূকুটি করল কুয়াশা। 'উনি একটা গবেষণাধর্মী সংস্থার প্রধান। ফেনিসের খবর উনি জানবেন কী করে?'

'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন শুধু নুমার ডিরেক্টর নন,' ব্যাখ্যা করল রানা। 'একইসঙ্গে তিনি ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সের চিফ এবং প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত উপদেষ্টা। আর কিছু না হোক, আমাকে ফাঁসানোর পিছনে কে কলকাঠি নেড়েছে, তা বের করতে পারবেন। ওই লোকই ফেনিস পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারবে আমাদেরকে।'

'মন্দ নয় আইডিয়াটা,' সায় দিল কুয়াশা। 'কখন দেখা করবে অ্যাডমিরালের সঙ্গে?'

'আজই। সকাল হোক, তারপর ফোন করব ওঁকে।'

'ততক্ষণ পর্যন্ত?'

'ভোর হতে দেরি নেই, খিদেও পেয়েছে। চলুন ব্রেকফাস্ট

সেরে নিই।'

'বেশ,' ইজিচেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল কুয়াশা। 'চা কিন্তু আমি বানাব!'

দশ

কেবিন থেকে সবচেয়ে কাছের ফোন-বুদটা তিন মাইল দূরে। কাঁচা রাস্তা ধরে একেবারে হাইওয়ে পর্যন্ত যেতে হয়। সেলফোনের বদলে ওটাকেই যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নিল রানা। এতে ওর অবস্থান ফাঁস হবার ঝুঁকি থাকে না। পুরনো টয়োটা সেডানটা চালিয়ে সকাল সাড়ে ন'টায় ওখানে গেল ও, রিং করল নুমা হেডকোয়ার্টারে, অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের প্রাইভেট নাম্বারে।

কয়েকটা রিং হতেই সাড়া দিলেন অ্যাডমিরাল। রানার কণ্ঠ শুনে উত্তেজিত গলায় বললেন, 'রানা! কোথায় তুমি?'

'দুঃখিত, অ্যাডমিরাল। সেটা এ-মুহূর্তে জানাতে পারছি না।'

'হুম, বুঝতে পারছি। বড্ড ঝামেলার মধ্যে আছ তুমি, সিআইএ আর এফবিআই পাগলা কুকুর হয়ে গেছে তোমাকে বাগে পাবার জন্য।'

'ওদেরকে উস্কানি দিচ্ছে কে, সেটা জানেন?'

'উঁহুঁ। পরিস্থিতি গরম হয়ে আছে, তোমার প্রতি আমার দুর্বলতার কথা সবার জানা। নাক গলাবার সুযোগ পাচ্ছি না।

তবে চোখ-কান খোলা রেখেছি। কিছু জানতে পারলেই বলব তোমাকে। আসলে ঘটছেটা কী, রানা?'

'বসের সঙ্গে কথা হয়নি আপনার?'

'ভোরবেলা ফোন করেছিল, কিন্তু বিস্তারিত ভেঙে বলেনি। তোমার কাছ থেকে জেনে নিতে বলেছে সব।'

'আপনার সঙ্গে আমার দেখা হওয়া প্রয়োজন, অ্যাডমিরাল। আজই। ফোনে সব কথা বলা যাবে না।'

'নিশ্চয়ই। কীভাবে দেখা করতে চাও?'

'সেটা পরে বলছি। তার আগে সামান্য খোঁজখবর নিতে হবে আপনাকে। ফেনিস নামে চল্লিশ দশকে একটা গুপ্তসংঘ ছিল, ওটার ব্যাপারে কিছু কি জানা আছে আপনার...'

সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, রাত ন'টায় দেখা করবেন অ্যাডমিরাল—রক *ক্রিক পার্ক*-এর পুবপাশে, মিসৌরি অ্যাভিনিউ-এর একজিট থেকে এক মাইল উত্তরে। গাড়ি রাখার একটা জায়গা আছে ওখানে, আরোহীরা পায়ে হাঁটা পথ ধরে পার্কের ভিতরে ঢুকতে পারে জায়গাটা থেকে। অ্যাডমিরাল জানিয়ে দিলেন, আসার আগে ফেনিস সম্পর্কে যতদূর সম্ভব তথ্য জোগাড় করে আনবেন। প্রয়োজন ছিল না, তবু তাঁকে সতর্ক থাকার জন্য বলে দিল রানা।

দিনের বাকি সময়টা নিস্তরঙ্গভাবে কেটে গেল। কেবিনের মধ্যেই রইল রানা আর কুয়াশা। কথাবার্তা খুব একটা হলো না ওদের মধ্যে। এখনও পুরোপুরিভাবে বিশ্বাস করতে পারছে না কেউ কাউকে। এত অল্প সময়ে দুই জগতের দু'জন মানুষের মধ্যে সেটা আসারও কথা নয়। বন্ধুত্ব এবং বিশ্বাস অর্জনের জন্য এখনও অনেক পরীক্ষা দিতে হবে ওদের দুজনকে।

সারাটা দিন বুকশেলফ থেকে নানা ধরনের বই নামিয়ে পড়ল

কুয়াশা। রানা বসে রইল রেডিও-র সামনে—কাঁটা ঘুরিয়ে একের পর এক স্টেশনের খবর শুনল। এক্সেলসিয়র হোটেল নিয়ে কোনও সংবাদ প্রচার হয় কি না, সে-দিকে নজর। হলো ঠিকই, কিন্তু খুবই গুরুত্বহীনভাবে। সাধারণ হত্যাকাণ্ড হিসেবে বিবরণ দিল সংবাদপাঠকরা, পুলিশের ধারণা ড্রাগ-রিলেটেড ক্রাইম। তিক্ত একটা হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে। ঘটনা ধামাচাপা দেয়ায় ফেনিসের জুড়ি নেই। তিন-তিনজন মানুষ খুন হয়েছে হোটেলে, তারপরেও কোনও রকম আলোড়ন সৃষ্টি হতে দেয়নি!

বিকেল চারটের দিকে নদীর ধারে হাঁটতে বেরুল রানা। কুয়াশাকে ডাকল সঙ্গে যাবার জন্য, কিন্তু রাজি হলো না সে। অগত্যা একাই বেরুতে হলো ওকে। ফিরে এল ঘণ্টাখানেক পর।

রানাকে কেবিনে ঢুকতে দেখে এগিয়ে এল কুয়াশা। বলল, 'একটু আগেভাগেই রক ক্রিক পার্কে চলে গেলে কেমন হয়? জায়গাটা সার্ভে করে রাখা যাবে, আমাদের অজান্তে কেউ অ্যামবুশ পেতে বসে থাকতে পারবে না।'

'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে অবিশ্বাস করবার প্রশ্নই ওঠে না,' মাথা নাড়ল রানা।

'আমি ওঁর কথা বলছি না। যাদের কাছ থেকে ভদ্রলোক ফেনিসের খোঁজখবর নিচ্ছেন, তাদের কথা বলছি। কীভাবে বুঝব, ওদের কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করবে না?'

'আমাদের সঙ্গে যে দেখা করতে আসবেন, সেটা কাউকে বলবেন না অ্যাডমিরাল,' আশ্বস্ত করল রানা। 'তবে সতর্ক থাকলে ক্ষতি নেই। ঠিক আছে, পনেরো মিনিটের মধ্যেই রওনা হব আমরা। রাস্তায় একটা ডাইনার পড়বে, ওখানে ডিনার সেরে নেয়া যাবে।'

কথামত বেরিয়ে পড়ল ওরা। লম্বা পথ পাড়ি দিয়ে সাড়ে

সাতটা নাগাদ পৌঁছুল রক ক্রিক পার্কের সীমানায়, পার্কিং এরিয়ায়। জায়গাটা শূন্য, আর কোনও যানবাহন নেই। গাড়ি থেকে নেমে পার্কের ভিতর ঢুকে পড়ল দু'জনে। দু'ভাগ হয়ে গিয়ে আশপাশের অনেকখানি এলাকা ভালমত তল্লাশি করল। তবে কোনও মানুষের দেখা পেল না। আজ সন্ধ্যায় বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, সম্ভবত এ-কারণেই পার্কের সৌন্দর্য উপভোগ করতে আসেনি কেউ।

এক ঘণ্টা পর পূর্ব-নির্ধারিত একটা স্পটে আবার মিলিত হলো দু'জনে। রিপোর্ট দেবার ভঙ্গিতে কুয়াশা জানাল, 'কিচ্ছু দেখিনি আমি। পুরো এলাকা একেবারে ফাঁকা।'

'হুম, আমারও একই কথা,' ঘড়ির লিউমিনাস ডায়ালে চোখ বোলাল রানা। 'সাড়ে আটটা বেজে গেছে। আমি গাড়ির কাছে যাচ্ছি, আপনি এখানেই থাকুন। অ্যাডমিরাল এলে প্রথমে আমি কথা বলব। তারপর সঙ্কেত দেব আপনাকে।'

'কীভাবে? পার্কিং লট এখান থেকে অন্তত দুইশ' গজ দূরে।'

'ম্যাচ জ্বালব একটা।'

'গুড আইডিয়া।'

পার্কিং এরিয়ার দিকে হাঁটতে শুরু করল রানা।

ন'টা বাজার দু'মিনিট বাকি থাকতেই হাইওয়ে একজিট ধরে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের লিমাজিনকে। ধীর গতিতে পার্কিং এরিয়ায় ঢুকল বিশাল গাড়িটা, রানার গাড়ির বিশ ফুট তফাতে পৌঁছে থেমে গেল। ড্রাইভিং সিটে শোফার আছে দেখে একটু তটস্থ হয়ে গেল রানা—একজন সঙ্গী নিয়ে এসেছেন অ্যাডমিরাল; তবে মানুষটাকে চিনতে পেরে কেটে গেল ভয়। নাম চার্লি, প্রাক্তন মেরিন সার্জেন্ট—অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের সঙ্গে গত দশ বছর ধরে আছে। শুধু শোফার নয়,

নুমা চিফের ব্যক্তিগত দেহরক্ষীও সে। রানার সঙ্গে ভাল পরিচয় আছে। সৎ এবং বিশ্বস্ত বলেই তাকে জানে রানা।

ছায়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রানা, এগিয়ে গেল লিমাজিনের দিকে। ড্রাইভিং সিট থেকে নেমে পিছনের দরজার কাছে গেল চার্লি। হাতে একটা ফ্ল্যাশলাইট রয়েছে তার, এক মুহূর্তের জন্য সেটা জ্বেলে আলো ফেলল এগোতে থাকা ছায়ামূর্তির মুখে। তারপর আবার নিভিয়ে ফেলল। ভাল করেই চেনে সে রানাকে।

'হ্যালো, চার্লি!' কাছে গিয়ে বলল রানা।

'নাইস টু মিট ইউ, মি. রানা,' মুখে সৌজন্যসূচক হাসি ফুটিয়ে বলল চার্লি। 'অনেকদিন পর দেখছি আপনাকে।'

'হ্যাঁ। নাইস টু মিট ইউ।'

'অ্যাডমিরাল আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।' পিছনের দরজা খুলে ধরল চার্লি।

'জানি। একটা কথা... কয়েক মিনিট পর গাড়ি থেকে নেমে আমি একটা ম্যাচ জ্বালব। ওটা আসলে সঙ্কেত... পার্কের ভিতর থেকে আরেকজন এসে যোগ দেবে আমাদের সঙ্গে।'

'কোনও অসুবিধে নেই। অ্যাডমিরাল আমাকে জানিয়েছেন, আপনারা দু'জন থাকবেন এখানে।'

'আমি আসলে তোমার সিগারেট খাওয়ার অভ্যাসের কথা বলছি, চার্লি। আমি বেরুনোর আগে সিগারেট ধরিয়ো না। ম্যাচ জ্বলতে দেখলে ভুল সঙ্কেত পাবে আমার সঙ্গী। অ্যাডমিরালের সঙ্গে একান্তে কিছুটা সময় চাই আমার।'

'আমি যে সিগারেট খাই, সেটা মনে আছে আপনার?' একটু অবাক হয়ে বলল চার্লি। 'স্মরণশক্তি বটে! সতর্ক করে দিয়ে ভাল করেছেন। আমি সত্যিই একটা ধরাবার কথা ভাবছিলাম।'

'সরি, একটু অপেক্ষা করতে হবে।' বলে লিমাজিনের পিছনের সিটে উঠে পড়ল রানা, হাত দিয়ে টেনে বন্ধ করে দিল দরজা।

গম্ভীর মুখে বসে আছেন অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। হাতে জ্বলন্ত সিগার। ওকে দেখতে পেয়ে চোখদুটো একটু উজ্জ্বল হলো, হাত মেলালেন আন্তরিক ভঙ্গিতে।

'আর ইউ ও.কে., মাই সান?' রানার ঘাড়ের ব্যাণ্ডেজ দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন অ্যাডমিরাল।

'সিরিয়াস কিছু না,' জানাল রানা। তারপর বিব্রত কণ্ঠে যোগ করল, 'সরি, অ্যাডমিরাল। আপনাকে আবার ঝামেলায় ফেলে দিয়েছি...'

'কীসের ঝামেলা?'

'ইয়ে... দু'দিন পর পর একেকটা বিপদে পড়ি, আর সাহায্য চাই আপনার... নিশ্চয়ই খুব বিরক্ত হন আপনি?'

'কী যে বলো না! আমার জন্য, নুমার জন্য... এমনকী সারা দুনিয়ার জন্য তুমি অতীতে যতকিছু করেছ, তার তুলনায় তোমার জন্য কী-ই বা করতে পেরেছি আমি? থাক্, বাদ দাও ওসব। কাজের কথায় এসো। কুয়াশা কোথায়?'

'পার্কের ভিতরে অপেক্ষা করছে, আমি সিগনাল দিলে আসবে। চারপাশে নজর রাখছে ও, খানিক আগে পুরো এলাকায় তল্লাশিও চালিয়েছি আমরা।'

'ওসবের কোনও দরকার ছিল?'

'আপনার ফোনে আড়ি পাতা হতে পারে। রিস্ক নিতে চাইনি আমরা।'

'আমার টেলিফোনে কেউ আড়ি পাততে পারে না, রানা। স্পেশ্যালি এনক্রিপ্টেড লাইন ওটা।'

'তা-ও... সতর্ক থাকা ভাল না? এবার কাজের কথা। কিছু জানতে পেরেছেন আপনি?'

'ফেনিস সম্পর্কে?' সিটে হেলান দিয়ে সিগারে টান দিলেন অ্যাডমিরাল। 'না... এবং হ্যাঁ। না বলছি এই অর্থে যে, গোটা আমেরিকার কোনও ইন্টেলিজেন্স নেটওয়ার্কের গত পঞ্চাশ বছরের ডেটাবেজে সংঘটার উল্লেখ নেই। প্রেসিডেন্ট আমাকে গ্যারান্টি দিয়েছেন এর, তাঁকে বিশ্বাস করি আমি। ফেনিসের কথা শুনে উনি বরং চমকে গেছেন, চাইছিলেন ব্যাপারটার তদন্ত করার জন্য এখুনি ব্যবস্থা নিতে। আমি বুঝিয়ে-শুনিয়ে নিরস্ত করেছি তাঁকে। যদি প্রেসিডেন্টের ঘনিষ্ঠ কেউ সত্যিই ফেনিসের চর হয়ে থাকে, তা হলে তাঁর জীবনসংশয় দেখা দেবে। এ-মুহূর্তে ও-ধরনের ঝুঁকি নেয়া যায় না।'

'আমার ব্যাপারে কিছু বলেছেন প্রেসিডেন্টকে?'

'চেষ্টা করেছি বলার, কিন্তু সুবিধে করতে পারিনি। এফবিআই নাকি অকাট্য প্রমাণ পেয়েছে তোমার অপরাধের, প্রেসিডেন্ট তাই কোনও রকমের তদবির শুনতে রাজি নন।'

'হুম। ফেনিসের ব্যাপারে *হ্যাঁ*-ও তো বললেন, সেটা কী?'

'হার্ড এভিডেন্স নেই, কিন্তু ভাসা ভাসা কিছু আভাস পেয়েছি সংঘটার। ইন্টেলিজেন্স জগতের সবচেয়ে পুরনো পাঁচজন মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি। ওদের মধ্যে তিনজন ফেনিস সম্পর্কে জানে, সংঘটা আবার উদয় হয়েছে শুনে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ওরা, ওদেরকে প্রতিহত করার জন্য আগ বাড়িয়ে সাহায্য করতে চেয়েছে। কিন্তু বাকি দু'জনের প্রতিক্রিয়া একেবারে অন্যরকম—ফেনিসের নাম-ই নাকি শোনেনি ওরা। ব্যাপারটা একেবারে অবিশ্বাস্য—নিরেট তথ্যপ্রমাণ না থাকতে পারে, অন্তত নাম তো জানা থাকার কথা। একটু খোঁচাখুঁচি করতেই রীতিমত

দুর্ব্যবহার করেছে ওরা আমার সঙ্গে। খুবই অদ্ভুত আচরণ। বন্ধু মনে করতাম ওদের দু'জনকে, অথচ ফেনিসের প্রসঙ্গ তোলায় আমার প্রতি অসৌজন্য দেখাতে বাধল না ওদের!'

'এই দু'জনের নাম দিতে পারেন আমাকে?'

'নিশ্চয়ই...' বলতে বলতে ভুরু কুঁচকে উঠল অ্যাডমিরালের। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে লিমাজিনের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা—গাছপালার ফাঁক দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে ঝিলিক দিয়ে উঠছে আলো। একের পর এক ম্যাচের কাঠি জ্বালছে কেউ।

কপালে ভাঁজ পড়ল রানার—ম্যাচ জ্বেলে সঙ্কেত দেবার কথা ওর, কুয়াশা জ্বালছে কেন? ভাল করে তাকাতেই একটা ছন্দ লক্ষ করল আলোর মধ্যে—মোর্স কোড! তাতে উল্লেখ করা হচ্ছে একটা মাত্র শব্দ—*বিপদ!*

ঝট্ করে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের দিকে ফিরল রানা।

'কী হয়েছে?' নুমা চিফের চোখে বিভ্রান্ত দৃষ্টি।

'আপনার ফোন লাইনটা আসলে কতখানি নিরাপদ, অ্যাডমিরাল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হাণ্ড্রেড পার্সেন্ট!' জোর কণ্ঠে জানালেন হ্যামিলটন। 'কেউ আড়ি পাতার চেষ্টা করলেও সেটা জানতে পারি আমি।'

সুইচ টিপে জানালার কাচ নামাল রানা। ডাকল শোফারকে, 'চার্লি, এদিকে এসো।' কাছে এলে জানতে চাইল, 'তোমাদেরকে কেউ ফলো করেছে?'

'না, মি. রানা,' মাথা নাড়ল চার্লি। 'পিছনে সারাক্ষণ একটা চোখ রেখেছি আমি। অ্যাডমিরাল সতর্ক করে দিয়েছিলেন। গাছের ওখানের ম্যাচ জ্বালছে কে? আপনার বন্ধু নাকি?'

'হ্যাঁ। ওর ধারণা, আমরা ছাড়াও আরও লোক হাজির হয়েছে এখানে।'

'অসম্ভব!' বলে উঠলেন হ্যামিলটন। 'কেউ ফলো করেনি আমাদেরকে, এই মিটিঙের খবরও ফাঁস হবার উপায় ছিল না। যদি কেউ এখানে এসে থাকে, সেটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। আফটার অল, এটা একটা পাবলিক পার্ক।'

'কিছু মনে করবেন না, স্যর, ব্যাপারটা অত সহজ নয়। কোনও হেডলাইট দেখিনি আমরা, গাড়িও দেখা যাচ্ছে না আশপাশে। যে-ই এসে থাকুক, নিজেকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। পার্কে বেড়াতে আসা সাধারণ মানুষের আচরণ নয় ওটা।'

'কিন্তু কীভাবে পৌঁছুল এখানে?'

'ফলো করার অনেক টেকনিক আছে। আপনার গাড়িতে কোনও ধরনের হোমিং ডিভাইস ফিট করা হয়েছে কি না, রওনা হবার আগে সেটা চেক করে দেখেছেন?'

'গুড গড!' আঁতকে উঠলেন হ্যামিলটন। 'এখন কী করা?'

দরজা খুলে নেমে পড়ল রানা। চার্লিকে বলল, 'গাড়িতে উঠে ইঞ্জিন চালু করো। আমি হোমিং ডিভাইস সরাবার ব্যবস্থা করছি। তারপর সবাই কেটে পড়ব এখান থেকে। পার্কিং লট থেকে বেরুনোর সময় উত্তরদিকের রাস্তার পাশে একটু থেমো।'

'আপনার বন্ধুর কী হবে?'

'ওর জন্যেই থামতে বলছি। দরজা খুলে ধরব আমি, ও যাতে দৌড়ে এসে উঠে পড়তে পারে গাড়িতে।'

'এক মিনিট, মি. রানা,' বাধা দিয়ে বলল চার্লি। 'বিপদ যদি দেখা দেয়, কারও জন্য থামব না আমি। না আপনার জন্য... না আপনার কোনও বন্ধুর জন্য। একটাই দায়িত্ব আমার: অ্যাডমিরালকে রক্ষা করা। অন্য কারও জন্য ঝুঁকি নেয়া সাজে না আমার।'

'তর্ক কোরো না, চার্লি!' গরম গলায় বলল রানা। 'যা করতে

বলছি, ভেবে-চিন্তেই বলছি।'

'ওর কথা শোনো, চার্লি!' বলে উঠলেন হ্যামিলটন।

'ইয়েস, স্যর। আপনি যা বলেন।'

তাড়াতাড়ি লিমাজিনের পিছনে গিয়ে শুয়ে পড়ল রানা, ঢুকে গেল গাড়ির তলায়। হোমিং ডিভাইস ফিট করার জন্য ট্রাঙ্কের তলার অংশটাই সবচেয়ে আদর্শ। চার্লির ফ্ল্যাশলাইটটা নিয়ে এসেছে, ওটা জ্বেলে খুঁজতে শুরু করল জিনিসটা। কয়েক সেকেণ্ড পরেই গর্জে উঠল ইঞ্জিন, ড্রাইভিং সিটে উঠে কথামত স্টার্ট দিয়েছে চার্লি। শব্দটা হবার সঙ্গে সঙ্গে নরক ভেঙে পড়ল চারপাশে।

অন্ধকার ভেদ করে শক্তিশালী একটা আলোকরশ্মি আছড়ে পড়ল অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের বিশাল গাড়িটার উপর। পরমুহূর্তে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে গর্জে উঠল মেশিনগান। রানা তখনও হোমিং ডিভাইসটা খুঁজে পায়নি; দু'পাশে গাড়ির পিছনের চাকার কর্কশ আওয়াজ শুনল, হুট করে লিমাজিনটা সরে গেল ওর শরীরের উপর থেকে। গুলির প্রথম ধারায় এরই মধ্যে ওটার ডানপাশের কাঁচ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে। শরীরে সৃষ্টি হয়েছে বেশ ক'টা ফুটো।

উন্মুক্ত পার্কিং লটের মাঝখানে চিৎ হওয়া অবস্থায় নিজেকে নাঙ্গা মনে হলো রানার। আত্মরক্ষার উপায় নেই, এই বুঝি বুলেটের মুষলধারা ওকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে! কিন্তু বাস্তবে তা ঘটল না। আততায়ী যে-ই হোক, লিমাজিনকে ঠেকানো তার প্রধান লক্ষ্য; ক্রমাগত গুলি ছুঁড়ছে গাড়িটাকে টার্গেট করে।

নিয়ন্ত্রণ হারানোর ভঙ্গিতে লিমাজিনকে এদিক-ওদিক দোল খেতে দেখল রানা, মুখ ঘুরিয়ে পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য চার্লি যুদ্ধ করছে স্টিয়ারিং হুইল নিয়ে। শেষ পর্যন্ত তীক্ষ্ণ

একটা চক্কর খেয়ে ঘুরে গেল বটে, কিন্তু কর্কশ শব্দ তুলে বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন। হেডলাইটের আলোয় দু'জন মানুষকে গাড়ির দিকে ছুটে আসতে দেখল রানা, হাতে অটোমেটিক রাইফেল। দেরি করল না ও, গড়ান দিয়ে ফায়ারিং পজিশনে গেল, সিগ-সাওয়ার তাক করে নিমেষে গুলি ছুঁড়ল লোকদুটোকে লক্ষ্য করে।

ভারী বুলেটের আঘাতে ছুটন্ত অবস্থায় হুমড়ি খেল দুই খুনি, মুখ থুবড়ে আছড়ে পড়ল কংক্রিটের উপর। অক্কা পেয়েছে সঙ্গে সঙ্গে।

আরেকদফা গুলিবর্ষণ করল মেশিনগান—দাঁড়িয়ে থাকা লিমাজিনের বামপাশের কাঁচ এবার গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে ঝরে পড়ল। চেসিসটা মোরব্বার মত গর্ত হয়ে যেতে বসেছিল, কিন্তু পিস্তলের একটা সিঙ্গেল শটের শব্দ শোনা গেল, পরমুহূর্তে থেমে গেল মেশিনগানের গর্জন।

ঘাড় ফিরিয়ে গুলির উৎসের দিকে তাকাল রানা। কুয়াশা ছুটে আসছে ওদিক থেকে। চেঁচিয়ে বলল, 'ব্যাটাকে ঘায়েল করেছি আমি, রানা। তবে আরও লোক আছে ওদের। আমাদের গাড়িটা নিয়ে এসো! পালাতে হবে আমাদেরকে।'

ওর কথার সত্যতা প্রমাণের জন্যই যেন দূর থেকে ভেসে এল উত্তেজিত চেঁচামেচির আওয়াজ। একটা গাড়ির ইঞ্জিন জ্যান্ত হয়ে উঠল কোথাও।

ফ্যাল ফ্যাল করে বিধ্বস্ত লিমাজিনের দিকে তাকাল রানা। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন... কী অবস্থা ওঁর?

রানার মনের কথা পড়তে পারছে কুয়াশা। বলল, 'আমি দেখছি অ্যাডমিরালকে। তুমি গাড়ি নিয়ে এসো।'

দু'দিকে ছুটল দু'জনে—কুয়াশা লিমাজিনের দিকে, রানা ওদের গাড়ির দিকে। কপাল ভাল, ওটা এখনও অক্ষত আছে।

ইঞ্জিন চালু করে সবেগে আগে বাড়ল, ব্রেক কষল লিমাজিনের পাশে এসে। খুলে দিল দরজা।

লিমাজিন থেকে ধরাধরি করে অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে বের করে আনল কুয়াশা আর চার্লি। জ্ঞান হারিয়েছেন নুমা চিফ, সারা শরীর রক্তাক্ত, গুলি লেগেছে নিঃসন্দেহে; আঘাত কতটা গুরুতর, তা বোঝা যাচ্ছে না। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো চার্লি অনেকটাই অক্ষত, ভাঙা কাঁচের টুকরোয় শরীরের বিভিন্ন জায়গা কেটে যাওয়া ছাড়া আর কিছু হয়নি। মেশিনগানের সমস্ত গুলি লিমাজিনের প্যাসেঞ্জার সিট লক্ষ্য করে ছোঁড়া হয়েছে, শোফারকে নিয়ে মাথা ঘামায়নি আততায়ী।

গাড়ির পিছনের সিটে অ্যাডমিরাল-সহ চার্লিকে উঠিয়ে দিল কুয়াশা। নিজে বসল রানার পাশে। নিচু গলায় বলল, 'মুভ! ভদ্রলোককে যত দ্রুত সম্ভব হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে আমাদের।'

ঘাড় ফেরাল রানা, আর ঠিক সেই সময় ঝোপ-ঝাড় ফুঁড়ে পার্কিং লটে বেরিয়ে এল দুটো মার্সিডিজ। এক সেকেণ্ডের বেশি দেখল না ও, হ্যাণ্ডব্রেক রিলিজ করে মেঝের সাথে চেপে ধরল অ্যাকসেলারেটর, ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এল পার্কিং লট থেকে। ছুটতে শুরু করল হাইওয়ে ধরে

বামদিকের রিয়ারভিউ মিররে তাকাল রানা। মার্সিডিজ দুটো পিছু নিয়েছে, মাত্র তিনশো মিটার দূরে ওগুলো। পরমুহূর্তে দৃশ্যটা চুরমার হয়ে গেল একঝাঁক বুলেট ছুটে এসে আয়নার কাঁচ গুঁড়িয়ে দেয়ায়।

'মেঝের সাথে সেঁটে থাকো!' চার্লির উদ্দেশে চিৎকার করল রানা।

সিটের সামনে, মেঝের উপর অ্যাডমিরালকে নিয়ে কুণ্ডলী

পাকাল চার্লি। আহত মানুষটাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে রেখেছে।

সামনের সিটে কুঁকড়ে যতটা সম্ভব ছোট হয়ে গেছে কুয়াশা। 'এটার টপ স্পিড কত?' জানতে চাইল ও।

'পুরনো আমলের টয়োটা... আশি-নব্বুইয়ের উপরে যাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না।' জবাব দিল রানা। 'কেন, পিছনের ওগুলো কী?'

ঝট করে ঘুরল কুয়াশা, দরজার উপর ঝুঁকে উঁকি দিল পিছনে। 'সামনে থেকে দেখে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কোন্ মডেলের মার্সিডিজ, তবে সম্ভবত থ্রি হাণ্ড্রেড এস.ডি.এল.।'

'ডিজেল?'

'টার্বো চার্জড ডিজেল, ঘণ্টায় দুশো বিশ কিলোমিটার ছুটতে পারে।'

পায়ের চাপ দিয়ে মেঝের সাথে সেঁটে ধরল রানা ক্লাচ। গিয়ার বদলে পাঁচ নম্বরে দিল। 'নাগালের বাইরে থাকার চেষ্টা করব। আপনি গুলি ছুঁড়ে ওদেরকে পিছাতে বাধ্য করুন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে জানালা দিয়ে শরীর বের করে দিল কুয়াশা। এক ঝাঁক গুলি ছুঁড়ল একটা মার্সিডিজকে লক্ষ্য করে। মাজল্ থেকে মাত্র পাঁচটা বুলেট বেরুল, অ্যামুনিশন ক্লিপ খালি হয়ে গেছে। আরেকটা ক্লিপের সন্ধানে পকেট হাতড়াতে শুরু করল, কিন্তু পেল না। ছোটাছুটির সময় নিশ্চয়ই পড়ে গেছে পার্কে।

'আমার অ্যামিউনিশন শেষ,' জানাল ও।

এক হাতে সিগ-সাওয়ারটা বাড়িয়ে ধরল রানা। 'গুলিতে কাজ হচ্ছে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু ওরা পাল্টা গুলি করছে না কেন, বুঝতে পারছি না। বোধহয় অ্যামিউনিশন বাঁচাচ্ছে।'

'উঁহুঁ, আমাদেরকে মাঝখানে রেখে স্যাণ্ডউইচ তৈরি করতে

চাইছে,' বলল রানা। 'যাতে মিস না করে।' রাস্তার দিকে চোখ, তবে মাথার ভিতর পালানোর পথ খোঁজার কাজ চলছে দ্রুত। 'বুঝেশুনে ফায়ার করুন। স্পেয়ার ক্লিপ নেই আমার কাছে। চার্লি, তোমার কাছে পিস্তল আছে?'

'সরি, মি. রানা,' জানাল অ্যাডমিরালের শোফার কাম দেহরক্ষী। 'তাড়াহুড়োয় আমারটা লিমাজিনের গ্লাভ কম্পার্টমেন্টে ফেলে এসেছি।'

'কী করা যায় তা হলে?' জিজ্ঞেস করল কুয়াশা।

আসার আগে এই এলাকার ম্যাপ স্টাডি করে এসেছে রানা। স্মরণ করল কী দেখেছে। বলল, 'সামনে একটা স্কি-রিসোর্ট পড়বে। ট্রেইল পাবো রাস্তার পাশে, স্কি রান-এর চূড়ায় উঠে গেছে। পিছনের ওদেরকে যদি কিছুটা সময় আটকে রাখা যায়, তা হলে জঙ্গলের ভিতর ঢুকে যেতে পারব। গাছপালার ভিতর দিয়ে বেশি জোরে ছুটতে পারবে না ওরা, হয়তো পালাতে পারব ওদেরকে ফাঁকি দিয়ে। হাইওয়েতে থাকলে বাঁচার কোনও আশা নেই।'

'সামনে কতদূর?'

'পরের বাঁকের কাছাকাছি'

'কিন্তু হাইওয়ে ছাড়লে আমাদের স্পিডও কমবে,' বলল কুয়াশা। 'উল্টো বিপদ দেখা দেবে না তো?'

'এরচেয়ে ভাল কোনও আইডিয়া থাকলে বলতে পারেন।'

পিছনদিকে তাকাল কুয়াশা। মাত্র পঁচাত্তর মিটার দূরে শত্রুরা, দূরত্ব প্রতি মুহূর্তে কমছে। বুঝতে পারল, আর কোনও বিকল্প নেই। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'ঠিক আছে, রানা। তোমার প্ল্যানই ফলো করব আমরা। গাড়িকে একটা সরলরেখায় ধরে রাখো, আমি দেখছি ওদের কতটা ক্ষয়ক্ষতি করা যায়।'

এগারো

খোলা জানালা দিয়ে ঊর্ধ্বাঙ্গের প্রায় পুরোটাই বের করে দিল কুয়াশা। শরীর ঘুরিয়ে মুখোমুখি হলো সামনের মার্সিডিজের, স্থির হাতে সিগ-সাওয়ার তাক করল ওটার দিকে। নিশানা ঠিক করেই গুলি ছুঁড়তে শুরু করল যন্ত্রের মত। এক সারিতে উইণ্ডশিল্ডের এক মাথা থেকে অন্যমাথা পর্যন্ত বুলেট ঢোকাচ্ছে।

ব্রেকে চাপ দিল মার্সিডিজের ড্রাইভার, বন বন করে হুইল ঘোরাল লাইন অভ ফায়ার থেকে সরে যাবার জন্যে, মাথাও নামিয়ে ফেলল। রিঅ্যাকশনটা যথেষ্ট দ্রুত হলো না, হাজারটা টুকরো হয়ে গেল উইণ্ডশিল্ডের কাঁচ, ছড়িয়ে পড়ল গাড়ির ভিতরে। দ্বিতীয় মার্সিডিজের ড্রাইভার ঠিক পিছনেই ছিল; সামনে কী ঘটছে, দেখতে পায়নি। প্রথম গাড়ির টেইললাইট হঠাৎ করে লাল হয়ে উঠতে দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল সে। পিছনে থেকে প্রথম মার্সিডিজকে ধাক্কা দেয়ার সময় অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল, দেখল ধাক্কা খেয়ে ঘুরে যাচ্ছে গাড়িটা, চোখের পলকে উল্টো দিকে অর্থাৎ তার দিকে মুখ করল সেটা। থেমে গেল দুটো গাড়িই।

'কাজ হয়েছে!' খুশি-খুশি গলায় বলল কুয়াশা। শরীর ঢুকিয়ে নিল টয়োটার ভিতরে।

নির্বিকার রইল রানা। বলল, 'শক্ত হোন, বাঁকের কাছে এসে

পড়েছি।'

স্পিড কমাল ও, সরু একটা তুষার ঢাকা পথে ঘুরিয়ে নিল টয়োটাকে। পথটা আঁকাবাঁকা, একের পর এক সরু বাঁক, তারপর আবার চওড়া হয়ে শেষ পর্যন্ত পৌঁছেছে পাহাড়ের চূড়ায়।

পিচ্ছিল, অমসৃণ পথ। ভারী গাড়িটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ইঞ্জিনের উপর খুব ধকল যাচ্ছে। স্প্রিংবহুল চেসিস ঝাঁকি খাচ্ছে অনবরত। একবার ডান, পরক্ষণে বামে কাত হয়ে পড়ছে টয়োটা, ঘন ঘন। হঠাৎ একবার প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল গাড়ি, রানার মনে হলো চারটে চাকাই শূন্যে লাফ দিয়েছে। মাটিতে নামার পর একদিকে এত বেশি কাত হয়ে গেল, প্রায় উল্টে যাচ্ছিল। ওদের ভাগ্যের জোরে সিধে হলো আবার। ছ'মিনিট পর জঙ্গলটাকে পিছনে ফেলে এল ওরা। রাস্তার দু'ধারে এখন বড়বড় বোল্ডার আর গভীর তুষার।

বনেটের ভিতর থেকে বাষ্প উঠছে, আগেই দেখেছে রানা। টেমপারেচার গজের কাঁটাও উঠে গেছে 'হট' লেখা ঘরে। 'গাড়ির অবস্থা কাহিল, কুয়াশা,' জানাল ও। 'যে-কোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে।'

'আরও বড় বিপদ দেখা দিয়েছে,' শুকনো গলায় বলল কুয়াশা। 'পিছনের বন্ধুরা ফিরে এসেছে।'

এত ব্যস্ত ছিল রানা, অনুসরণকারীদের খবর রাখার সময় পায়নি। দুর্ঘটনা সামলে নিয়ে দুটো মার্সিডিজই আবার নতুন উদ্যমে টয়োটাকে ধাওয়া শুরু করেছে। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাবারও অবসর পেল না ও—এক ঝাঁক বুলেটের আঘাতে গুঁড়িয়ে গেল রিয়ার উইণ্ডো, সামনের উইণ্ডশিল্ড ফুটো করে বেরিয়ে গেল ঝাঁকটা। চোখের সামনে তিনটে ফুটো দেখতে পেল রানা, কিনারাগুলো এবড়োথেবড়ো।

'ধ্যাৎ!' বিরক্ত কণ্ঠে বলল কুয়াশা।

চুলের কাঁটার মত তীক্ষ্ণ একটা বাঁক নিল রানা, গাড়ি সিধে করার সময় চুরি করে তাকাল ধাওয়ারত মার্সিডিজগুলোর দিকে। দৃশ্যটার মধ্যে বিপদের উপাদান যথেষ্ট পরিমাণেই রয়েছে।

সামনের মার্সিডিজ এঁকেবেঁকে ছুটে আসছে। টয়োটার চাকা তুষারের ওপর গভীর গর্ত তৈরি করেছে, সেই গর্তের ফাঁদে পড়ার কোনও ইচ্ছে নেই ড্রাইভারের, উন্মাদের মত সারাক্ষণ হুইল ঘোরাচ্ছে সে। প্রতিটি বাঁকে পিছলে রাস্তা থেকে সরে যাওয়ার ঝুঁকি নিতে দ্বিধা করছে না।

যা দেখল, মোটেও খুশি হতে পারল না রানা। মাঝখানের দূরত্ব দ্রুত কমছে। ওরা মাত্র পঞ্চাশ মিটার পিছনে। পছন্দ হলো না অটোমেটিক রাইফেল হাতে লোকটাকেও, সামনের মার্সিডিজের ভাঙা উইণ্ডশিল্ডের ফাঁক দিয়ে ব্যারেল বের করে ওদের দিকে লক্ষ্যস্থির করার চেষ্টা করছে সে।

'গেট ডাউন!' চেঁচাল রানা, হুইলের নীচে মাথা লুকাল, ড্যাশবোর্ডের কিনারা দিয়ে কোনও রকমে দেখতে পাচ্ছে সামনের রাস্তা।

কথাটা মুখ থেকে বেরুতে যা দেরি, টয়োটার গায়ে আঘাত করল এক ঝাঁক বুলেট। গাড়ির ট্রাঙ্কের ডালা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে উড়ে গেল। পরের ঝাঁকটা ফুটো করল ছাদকে। নিজের অজান্তেই মাথা আরও নামিয়ে নিল রানা। পিছনের দরজা থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল কজাগুলো, দরজাটাও উড়ে গেল বাতাসে ডানা মেলে। একটা গাছের সাথে ঘষা খেলো টয়োটা। বৃষ্টির মত ঝরল কাঁচের টুকরো। গা জ্বালাপোড়া অনুভব করল রানা, উপলব্ধি করল—ভাঙা কাঁচের আঘাতে কেটে গেছে শরীরের বিভিন্ন জায়গা। কুয়াশারও একই দশা।

‘সবাই ঠিক আছেন?’ চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল ও।

‘আমাদের নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না,’ উত্তেজিত গলায় বলল কুয়াশা। ‘ড্রাইভিঙে মন দাও।’

টয়োটার রেডিয়েটর থেকে বাষ্প এবার সশব্দ প্রতিবাদ জানাচ্ছে। ইঞ্জিনের শক্তি কমছে, টের পেল রানা। সামনে শেষ বাঁক, তারপর চূড়া। গাড়িটাকে ঘোরানোয় মন দিল ও। পিছনের বাম্পারে প্রায় সেঁটে আছে প্রতিপক্ষরা।

অতিরিক্ত উত্তাপে ইঞ্জিনের বেয়ারিংগুলো চিৎকার করছে। আরও এক ঝাঁক বুলেট বামদিকের পিছনের ফেণ্ডার গুঁড়িয়ে দিল, চ্যাপ্টা করে দিল টায়ারটাকে। টয়োটার পিছনের অংশ রাস্তা থেকে নেমে যেতে চাইছে, ধরে রাখার জন্যে হুইলের সাথে যুদ্ধ করছে রানা। দু’পাশে অসংখ্য বোল্ডার, গাড়ি ধাক্কা খেলে ছাতু হয়ে যাবে আরোহীরা।

হুডের নীচ থেকে নীল ধোঁয়া বেরুতে দেখে রানা বুঝল, মারা যাচ্ছে টয়োটা। রাস্তার কিনারায় পড়ে থাকা একটা পাথরকে এড়াতে পারেনি ও, অয়েল প্যানে খোঁচা লাগায় গর্ত তৈরি হয়েছে, ইঞ্জিনের নীচ থেকে ঝর-ঝর করে ঝরছে তেল। অয়েল প্রেশার গজ দ্রুত শূন্যের ঘরে নেমে এল। পাহাড়চূড়ায় পৌছুনোর আশা ত্যাগ করাই ভাল।

পিছলানো চাকা নিয়ে সামনের মার্সিডিজ শেষ বাঁকটা ঘুরতে শুরু করল। টয়োটার হুইল শক্ত করে ধরে অনবরত ঘোরাচ্ছে রানা। ধাওয়ারত শত্রুদের চেহারায় উল্লাস কল্পনা করতে পারল ও, তারা বুঝে ফেলেছে পালানোর কোনও উপায় নেই শিকারের।

চারদিকে উদ্‌ভ্রান্তের মত তাকিয়ে আশ্রয়ের কোনও সন্ধান দেখল না রানা। পা সম্বল করে কোথাও বেশিদূর যাওয়ারও প্রশ্ন ওঠে না। রাস্তার একদিকে তুষার আর বোল্ডার, আরেকদিকে ঝপ্

করে নেমে গেছে গভীর খাদ, মাঝখানের সরু রাস্তায় আটকা পড়েছে ওরা। ইঞ্জিন অচল হয়ে পড়ছে, একেবারে দাঁড়িয়ে পড়ার আগেই ঘটে যাবে যা ঘটার।

মরিয়া হয়ে উঠল রানা, গায়ের জোরে যত দূর যায়, চেপে ধরল অ্যাকসেলারেটর, বিড়বিড় করে ডাকল সর্বশক্তিমানকে। প্রার্থনার জোরেই কি না কে জানে, হঠাৎ বদলে গেল ইঞ্জিনের আওয়াজ, সামনের চাকাগুলো দেবে গেল তুষারের ভিতর, পরমুহূর্তে ছেড়ে দেয়া স্প্রিঙের মত সামনে লাফ দিল টয়োটা, একবারের চেষ্টাতেই উঠে এল চূড়ায়।

পিছনে নীল ধোঁয়া আর সাদা বাষ্পের মেঘ উঠল, খোলা স্কি রান-এর মাথায় পৌঁছে গেছে ওরা। লক্ষ করল রানা, ওর দিকের ঢালটা রশি দিয়ে আলাদা করে রাখা হয়েছে। বিপজ্জনক বলে এদিকে কাউকে স্কি করতে নিষেধ করা হয়েছে, রশির সাথে ঝুলে থাকা রঙিন বোর্ডগুলোয় তাই লেখা।

'রাস্তার এটাই শেষ মাথা,' হতাশ কণ্ঠে বলল কুয়াশা।

'উঁহুঁ, রাস্তা এখনও আছে,' আশ্চর্যরকম ঠাণ্ডা রানার কণ্ঠ।

ঝট্ করে ওর দিকে তাকাল কুয়াশা। তারপরেই তার চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল। 'তুমি কি ভাবছ... ইয়া মাবুদ, না!'

মার্সিডিজ দুটো পৌঁছে গেল, প্রতিপক্ষ থুতু ছুঁড়লেও ওদের গায়ে লাগবে। টয়োটার দু'পাশে চলে এসেছে প্রায়। হুইলে মোচড় দিল রানা, গাড়িটাকে নামিয়ে দিল স্কি-রানের বিপজ্জনক ঢালে।

জমাট বাঁধা শক্ত বরফের ওপর দিয়ে তীরবেগে নামতে শুরু করল টয়োটা, প্রতি মুহূর্তে আরও বাড়ছে গতি। হুইলটা আলতোভাবে ছুঁয়ে আছে রানা, প্রায় ঘোরাচ্ছেই না। ব্রেকের উপরেও কোনও চাপ দিচ্ছে না। একটু এদিক ওদিক হলেই

চরকির মত ঘুরতে শুরু করবে টয়োটা। যদি আড়াআড়িভাবে পিছলাতে শুরু করে, অবধারিত পরিণতি হবে ঘন ঘন ডিগবাজি খাওয়া, পাহাড়ের গোড়ায় পৌঁছুবে কিছু ভাঙা হাড় আর লোহালক্কড়।

ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল টয়োটার আরোহীরা।

বুলেটে ঝাঁঝরা পিছনের চাকার রাবার খসে যাওয়ায় ভাগ্যকে ছোট্ট একটা ধন্যবাদ দিল রানা। চুপসে যাওয়া টায়ার থেকে মুক্ত হয়ে কাঠামোর জোড়া কিনারা বরফের গায়ে ভালভাবে কামড় বসাতে পারছে, ভারসাম্য রক্ষায় সাহায্য পাচ্ছে ও।

স্পিডোমিটারের কাঁটা সত্তরের ঘরে উঠে গেল, এই সময় তুষারের এক ঝাঁক অতিকায় স্তূপ ছুটে আসতে দেখল ও। আলতো স্পর্শে ট্রেইল থেকে সামান্য সরিয়ে দিল রানা গাড়িটাকে, চলে এল মসৃণ বরফে। আপনা থেকেই শরীরের পেশি শক্ত হয়ে গেল, ঝাঁকি খাবার জন্যে তৈরি। এক চুল এদিক-ওদিক হলে ছাতু হয়ে যাবে সবাই ওরা

একপাশে অনেকগুলো তুষার স্তূপ, আরেক পাশে সারি সারি গাছ, মাঝখান দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ। কোনোটার সাথে ঘষা লাগল না, সরু পথ ধরে পরিষ্কার বেরিয়ে এল টয়োটা। চওড়া, বাধাহীন ঢালে বেরিয়ে এসেই ঝট করে পিছন দিকে তাকাল রানা।

প্রথম মার্সিডিজের ড্রাইভার কাণ্ডজ্ঞানের চমৎকার পরিচয় দিল। স্তূপগুলোকে এড়াবার জন্যে টয়োটার ফেলে আসা চাকার দাগ অনুসরণ করল সে। দ্বিতীয় মার্সিডিজের ড্রাইভার হয় ওগুলোকে দেখেনি, বা বিপজ্জনক বলে মনে করেনি। নিজের ভুল বুঝতে পারল অনেক দেরিতে, ব্যস্ততার সাথে সংশোধনের জন্যে গাড়িটাকে ঘন ঘন ডানে বাঁয়ে ঘোরাল সে। এভাবে তিন কি চারটে স্তূপকে এড়াতে পারল লোকটা, তারপর একটার সঙ্গে

মুখোমুখি ধাক্কা খেলো। গাড়ির সামনের অংশ তুষারের ভিতরে ঢুকে গেল, উঁচু হলো পিছনটা। নব্বই ডিগ্রি কোণ সৃষ্টি করে ঝুলে থাকল সেটা। তারপর শুরু হলো ডিগবাজি খাওয়া। নিরেট বরফে পড়ল, খাড়া হলো, আবার পড়ল, আবার খাড়া হলো—প্রতিবার গাড়ি থেকে কিছু না কিছু ছিটকে পড়ছে, শুধু আরোহীরা বাদে, কারণ ডিগবাজি খাওয়ায় চ্যাপ্টা হয়ে গেছে বডি, জ্যাম হয়ে গেছে দরজা। গাড়ি থেকে ছিটকে পড়লে আরোহীরা হয়তো প্রাণে বেঁচে যেত।

মাউন্টিং থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল ইঞ্জিন, ছিটকে জঙ্গলের দিকে চলে গেল। চাকা, ফ্রন্ট সাসপেনশন, রিয়ার-ড্রাইভ ট্রেন, এক এক করে সবগুলো চেসিস থেকে বেরিয়ে ঢাল বেয়ে সবেগে নামতে শুরু করল।

'একটা খতম!' খুশি খুশি গলায় বলল কুয়াশা। 'গুড জব, রানা।'

'খুশি হবার কিছু নেই,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল রানা। 'সামনে তাকান।'

চমকে উঠল কুয়াশা। ট্রেইলে উঁচু হয়েছে একটা স্কি জাম্প, নেমেছে একশো মিটার দূরে। তুষার ঢাকা র‍্যাম্প ঠিক কোথায় পাহাড়ের গায়ে মিশেছে, দেখার অবসর নেই রানার। কোনোরকম ইতস্তত না করে স্টার্টিং ড্রপ-অফ-এর দিকে টয়োটার মুখ ঘোরাল ও।

'লাফ দেবে, না?' তাজ্জব কুয়াশা প্রশ্ন করল।

'শক্ত হয়ে বসুন। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলতে পারি।'

'আছে নাকি যে হারাবে?'

কমপিটিশনের জন্যে যে-ধরনের কাঠামো তৈরি করা হয়, এটা তার চেয়ে অনেক ছোট। তবে র‍্যাম্পটা টয়োটাকে ধারণ

করার জন্যে যথেষ্ট চওড়া, খানিকটা জায়গা পড়েও থাকবে। ক্রমশ উঁচু হয়েছে ঢালটা, তারপর সমতল খানিকটা বিস্তৃতি, সবশেষে দেবে গেছে র‍্যাম্প, ত্রিশ মিটার এগিয়ে গ্রাউণ্ড-এর বিশ মিটার উপরে হঠাৎ করে শেষ হয়ে গেছে।

স্টার্টিং গেটের দিকে গাড়ি তাক করল রানা, টয়োটার চওড়া বডির আড়ালে লুকিয়ে রাখল স্কি-জাম্প। সাফল্য নির্ভর করছে সময়জ্ঞান আর প্রয়োজন মত স্টিয়ারিং হুইল ঘোরানোর উপর।

একেবারে শেষ মুহূর্তে, সামনের চাকা স্টার্টিং লাইন পেরোবার আগেই, স্টিয়ারিং হুইলে মোচড় দিল রানা। টয়োটার পিছনটা ঘুরে গেল, চরকির মত পাক খেতে শুরু করে র‍্যাম্পটাকে এড়িয়ে গেল গাড়ি। টয়োটার আকস্মিক অস্থিরতা লক্ষ করে ঘাবড়ে গেল মার্সিডিজের ড্রাইভার, সংঘর্ষ এড়াবার জন্যে সরলরেখা থেকে সরিয়ে নিল গাড়িকে, স্টার্টিং গেট দিয়ে ভিতরে ঢুকল নিখুঁতভাবে।

টয়োটাকে সোজা পথে ফিরিয়ে আনার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে রানা, ঘাড় ফিরিয়ে মার্সিডিজের দিকে তাকাল কুয়াশা। সমস্ত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কিনারা থেকে নেমে গেল গাড়িটা। মুহূর্তের জন্যে সেটাকে আকাশের গায়ে ডানাবিহীন মোটাসোটা একটা পাখির মত লাগল। র‍্যাম্পের কিনারা ছাড়ার মুহূর্তে ঘণ্টায় একশো বিশ কিলোমিটার বেগে ছুটছিল ওটা। নীচে পড়ে প্রথমে ওটা চ্যাপ্টা হলো, তারপর গড়িয়ে নামার সময় খুলে খুলে পড়ল একেকটা পার্টস্। পাইন গাছের সারিতে ধাক্কা খাওয়ার আগেই আরোহীরা সবাই ভর্তা হয়ে গেছে।

'বড় বেশি ঝুঁকি নিয়েছ,' বলল কুয়াশা। 'আরেকটু হলে আমরাও আকাশে উড়তাম!'

'এত ভয় পেলে চলে?' এই প্রথমবারের মত হালকা হাসি

ফুটল রানার ঠোঁটে।

র‍্যাম্প থেকে স্কি-রিসোর্টের বিল্ডিংগুলোর দূরত্ব বেশি নয়। রাতের বেলা বলে স্কিয়ার নেই, তবে রিসোর্টে নাইট শিফটের কর্মচারী আর সিকিউরিটি গার্ডেরা আছে। অ্যাকসিডেন্টের আওয়াজ শুনে ছুটে আসতে দেখা গেল ওদেরকে।

টয়োটার হেডলাইট নিভিয়ে দিল রানা। মানুষগুলোর দৃষ্টি এড়িয়ে ভিন্ন একটা পথে রিসোর্টের পার্কিং লটে নিয়ে গেল ভগ্নপ্রায় গাড়িটাকে এবং তিন মিনিটের মধ্যে ওখান থেকে একটা ভ্যান চুরি করল। সবাই দুর্ঘটনায় আহতদের সাহায্য করতে চলে গেছে, কাজটাতে বাগড়া দেবার মত কেউ আর নেই। ভ্যানে করে অ্যাডমিরালকে নিয়ে নিকটস্থ হাসপাতালে পৌঁছুতে লাগল মাত্র দশ মিনিট।

ইমার্জেন্সির নার্সেরা যখন নুমা চিফকে স্ট্রেচারে তুলে তাড়াহুড়ো করে ভিতরে নিয়ে যাচ্ছে, তখন চার্লির হাত টেনে ধরল রানা। বলল, 'আমরা আর যেতে পারব না ওখানে। তুমি বাকিটা সামলাতে পারবে তো?'

'নিশ্চয়ই!' বলল শোফার। 'ধন্যবাদ, মি. রানা। আপনি আর আপনার বন্ধু আমার প্রাণ বাঁচিয়েছেন। সম্ভবত অ্যাডমিরালেরও।'

'তা-ই যেন হয়,' বিড়বিড় করল রানা। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় মুখ শুকিয়ে গেছে। 'তুমি যাও।'

হাত মিলিয়ে হাসপাতালের ভিতর চলে গেল চার্লি।

'ডাক্তাররা কতদূর কী করতে পারবে, জানি না,' বলল কুয়াশা। 'কিন্তু ওখানে ভদ্রলোক নিরাপদ নন। খুনিরা এ-পর্যন্ত চলে আসতে পারে।'

'জানি,' বলল রানা। পকেট থেকে সেলফোন বের করে ডায়াল করল নুমার ডেপুটি চিফ জর্জ রেডক্লিফের নাম্বারে।

সংক্ষেপে জানাল কী ঘটেছে। শেষে যোগ করল, 'অ্যাডমিরালকে সরিয়ে নিতে হবে আপনার... গোপন কোনও জায়গায়, কাকপক্ষীও যেন টের না পায় সেটা কোথায়।'

'আমি এখুনি ব্যবস্থা নিচ্ছি, রানা,' বললেন রেডক্লিফ। 'দশ মিনিটের মধ্যে হাসপাতালে আমাদের নিজস্ব সিকিউরিটি পৌঁছুবে। অ্যাডমিরালের দায়িত্ব এখন আমার। তুমি শুধু খুঁজে বের করো, এসব কারা ঘটালো।'

'আমি কথা দিচ্ছি, মি. রেডক্লিফ, প্রতিশোধ নেব এর। বিদায়।'

হাসপাতালের সামনে থেকে সরে এল রানা-কুয়াশা। ভ্যানে চড়ে ফিরে চলল ওদের কেবিনের দিকে। অনেকক্ষণ কোনও কথা হলো না দু'জনের মাঝে। শেষে নীরবতা ভেঙে কুয়াশা বলল, 'আমি বুঝতে পারছি না, ওরা আমাদের খোঁজ পেল কীভাবে? অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের কাছ থেকে আমাদের খবর ফাঁস হবে না বলে গ্যারাণ্টি দিয়েছিলে তুমি!'

'তা হয়ওনি,' বলল রানা। 'ওঁর গাড়িতে সম্ভবত হোমিং ডিভাইস ফিট করে রেখেছিল ওরা। অ্যাডমিরালের পিছু পিছু যেভাবে হাজির হলো, তাতে অমনটাই মনে হয়। ফেনিসের ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েছেন আজ সারাদিন, নিশ্চয়ই নজরে পড়ে গেছেন ওদের। ওরা তাই ডিভাইস লাগিয়ে রেখেছিল লিমাজিনে।'

'হোমিং ডিভাইস! তুমি দেখেছ?'

'খোঁজার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু সময় তো পেলাম না!'

'আর কোনও ব্যাখ্যা থাকতে পারে না?' বাঁকা সুরে বলল কুয়াশা। 'যন্ত্রের বদলে কাজটা তো মানুষেরও হতে পারে।'

'নিজের উপর গুলি চালানোর জন্য বুঝি খুনিদেরকে ডেকে এনেছেন অ্যাডমিরাল? ওদের এক নম্বর টার্গেট ছিলেন উনি, লক্ষ

করেননি?'

'অ্যাডমিরাল না, ওঁর শোফারের কথা বলছি আমি। একটা গুলিও লাগেনি ওর গায়ে। ব্যাপারটা অস্বাভাবিক না?'

'গুলি আমাদের গায়েও লাগেনি,' যুক্তি দেখাল রানা। 'ওটা স্রেফ ভাগ্যের ব্যাপার। খামোকা চার্লিকে সন্দেহ করার কোনও মানে হয় না। ও অ্যাডমিরালের অনেক পুরনো লোক।'

'কী জানি, আমার মনটা খুঁতখুঁত করছে।'

'অবাক হচ্ছি না। কাউকেই বিশ্বাস করেন না আপনি।'

'সেজন্যেই আজও বেঁচে আছি,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল কুয়াশা। 'যাক গে, অ্যাডমিরালের পিছনে যেভাবে লেগেছিল ওরা, তাতে তো মনে হলো উনি কোনও গোপন খবর জেনে গেছেন। তোমাকে বলতে পেরেছেন কিছু?'

'ফেনিসের সঙ্গে কানেকশন থাকতে পারে, এমন দু'জন সন্দেহজনক লোকের নাম বলতে চেয়েছিলেন। পেরে ওঠেননি।'

'তারমানে আমেরিকায় কোনও ক্লু পাবার সম্ভাবনা শেষ। কর্সিকাতেই যেতে হবে আমাদের।'

'হুঁ, আর কোনও পথ নেই।' মাথা ঝাঁকাল রানা। 'যেখানে ফেনিসের শুরু, সেখান থেকেই শুরু করতে হবে তদন্ত। যাব আমরা কর্সিকায়, তবে একসঙ্গে নয়। একসঙ্গে থাকলে ঝুঁকি বাড়বে। দু'দিকে ছড়িয়ে পড়লে আমাদেরকে ট্র্যাক করা কঠিন হয়ে যাবে শত্রুদের জন্য।'

'ভাল প্রস্তাব,' সায় দিল কুয়াশা।

'কর্সিকার ঠিক কোথায় যেতে হবে, তা জানেন?'

'দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে, পোর্তো ভেচিয়োর সামান্য উত্তরে। খোঁজ নিয়েছি আমি... ওখানেই কাউন্ট গিলবার্তো বারেমির জমিদারি ছিল।'

'ঠিক আছে। ওখানেই আবার মিলিত হব আমরা—আজ থেকে তিন-চারদিন পর... নির্ভর করছে ঘুরপথে কর্সিকায় পৌঁছুতে কতটা সময় লাগবে, তার ওপর। যে-ই ওখানে আগে পৌঁছাক, স্থানীয় যে-কোনও সরাইখানায় উঠবে। তা হলে অন্যজন সহজে খুঁজে নিতে পারবে তাকে। কী বলেন?'

'আমার কোনও আপত্তি নেই।'

'আমেরিকা থেকে বেরুবার সমস্ত ব্যবস্থা আছে তো আপনার? নাকি সাহায্য লাগবে?'

'না, সেটা দরকার নেই,' বলল কুয়াশা। 'ওসব অ্যারেঞ্জমেণ্ট করাই আছে আমার। তোমারও নিশ্চয়ই আছে।'

'হ্যাঁ।'

আবার নীরবতা নেমে এল ভ্যানের ভিতর।

'রানা,' হঠাৎ বলল কুয়াশা, 'এই প্রথম তোমাকে ব্যাপারটা নিয়ে সিরিয়াস হতে দেখছি আমি।'

'না হয়ে উপায় নেই, কুয়াশা,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনকে খুন করার চেষ্টা করেছে ফেনিস... আমার পিতৃসম একজন মানুষকে! এরপর আর চুপ করে থাকা যায় না।'

'ড. ইভানোভিচ-ও অমনই একজন মানুষ ছিলেন আমার কাছে,' কুয়াশা বলল। 'আশা করি আমার আবেগটা এবার তুমি বুঝতে পারছ?'

'পারছি। মস্ত ভুল করেছে ওরা, তার উপযুক্ত প্রতিফলও পাবে। আসুন প্রতিজ্ঞা করি, ওদেরকে জড়-সহ উপড়ে ফেলব আমরা... আপনি আর আমি!'

রানার কাঁধে হাত রাখল কুয়াশা। 'ঠিক এই কথাটা ভেবেই তোমার সাহায্য চেয়েছি আমি। আমার জগতে স্বাগতম, রানা।'

বারো

একগুঁয়ের মত উঁচু উঁচু ঢেউয়ের সারির বুক চিরে মন্থরগতিতে এগোচ্ছে কাঠের তৈরি পুরনো এক ফিশিং বোট, প্রবল আক্রোশে তাকে ঠেকাতে চেষ্টা করছে রুদ্র সাগর। চাবুকের মত আঘাত হানছে খোলের এখানে-ওখানে, ক্ষণে ক্ষণে নোনা পানির ঝাপটায় ভিজে যাচ্ছে বোটের সর্বাঙ্গ। পাটাতনের উপরে মাছ-ধরা জাল নিয়ে ব্যস্ত জেলেদের সারা শরীরে এখন লবণের প্রলেপ। ভোরের বাতাসে হি হি করে কাঁপছে ওরা।

মাছ ধরার এই কার্যক্রমের সঙ্গে যোগ দেয়নি একজন মাত্র মানুষ। দড়ি টানছে না সে, জাল বা বড়শি ধরছে না; যোগ দিচ্ছে না জেলেদের শাপ-শাপান্ত, কিংবা সস্তা রসিকতাতে। তার বদলে হুইলহাউসের ভিতরে একটা চেয়ার পেতে বসে আছে সে—একহাতে থার্মোস-ভরা কফি, অন্যহাতে একটা জ্বলন্ত সিগারেট, মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে টান দিচ্ছে। পরনে নোংরা, ছেঁড়া পোশাক—ইটালিয়ান, কিংবা ফ্রেঞ্চ প্যাট্রোল বোট উদয় হলে সহজে মিশে যেতে পারবে জেলেদের সঙ্গে। অন্যথায় ওকে নিজের মত থাকতে দিতে হবে, এমনটাই চুক্তি হয়েছে বোটের লোকজনের সঙ্গে। আপত্তি করেনি কেউ, কাজটার জন্য নামহীন এই আগন্তুক এক লাখ লিরা দিচ্ছে... ক্যাপ্টেন পাবে বাড়তি দশ হাজার। গরীব জেলেদের জন্য এ অনেক টাকা! স্যান

ভিনসেনজোর এক পিয়ার থেকে মানুষটাকে তুলে নিয়েছে ওরা। পরদিন ভোরে কর্সিকার উদ্দেশে রওনা হবার কথা ছিল, কিন্তু আগন্তুকের নির্দেশে মাঝরাতেই ইটালির উপকূল ত্যাগ করেছে বোটটা।

জেলেদের জানা নেই, রহস্যময় এই আরোহীর নাম মাসুদ রানা।

সিগারেটটা শেষ হয়ে এসেছে, পায়ের তলায় পিষে ওটাকে নেভাল রানা। শেষবারের মত কফিতে চুমুক দিয়ে থার্মোসের মুখ বন্ধ করল। তারপর আড়মোড়া ভাঙল উঠে দাঁড়িয়ে। বেরিয়ে এল হুইলহাউস থেকে। রাতভর অত্যাচারের পর এই প্রথম কিছুটা শান্ত হয়ে এসেছে সাগর। কুয়াশার মাঝ দিয়ে আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে তটরেখা। বিরূপ প্রকৃতিকে পরাস্ত করে বেশ ভালই এগিয়েছে বোট। ক্যাপ্টেনের মতে, খুব শীঘ্রি দেখা পাওয়া যাবে সলেনযারার; তার এক ঘণ্টা পর সেইন্ট লুসি আর পোর্তো ভেচিয়োর মাঝামাঝি জায়গায় ওকে নামিয়ে দিতে পারবে তারা। ঝামেলার কোনও সম্ভাবনা নেই, পাথুরে উপকূলের মাঝে প্রচুর ইনলেট আছে, বেশিরভাগই নির্জন। ওর যে-কোনও একটায় সবার অলক্ষে ঢুকে পড়তে পারবে বোট।

হুইলহাউসের ভিতর থেকে নিজের হ্যাভারস্যাক নিয়ে এল রানা, ঝুলাল পিঠে। ওটার ভিতরে জামা-কাপড় ছাড়াও কয়েক দেশের ভুয়া পাসপোর্ট, নকল আইডেন্টিফিকেশন আর নগদ টাকা রেখেছে ও। হারিয়ে গেলে, বা চুরি হয়ে গেলে মহা-ঝামেলায় পড়ে যাবে।

'সেনিয়র!' ক্যাপ্টেনকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল, ময়লা দাঁত বের করে হাসছে। ইটালিয়ান ভাষায় বলল, 'এক্কো... সলেনযারা! সি অ্যারিভেরেমো সুবিতো... ট্রেন্তা মিনুতি। নর্দ দি

পোর্তো ভেচিয়ো।'

'বেনিসিমো, ক্যাপিতান,' পাল্টা জবাব দিল রানা। 'গ্রাৎসি।'

'প্রেগো!' বলে হুইলহাউসে ঢুকে গেল লোকটা, বোট চালানোর দায়িত্ব তুলে নিল নিজহাতে।

আধঘণ্টার মধ্যে ডাঙায় পৌঁছুবে রানা—কর্সিকার সেই পাহাড়ি এলাকায়, যেখানে ফেনিসের জন্ম হয়েছে। সংঘটার সৃষ্টির ব্যাপারে কারও মনে কোনও সন্দেহ নেই; কিন্তু পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত ওরা যে ভাড়াটে খুনি সরবরাহ করত—এ-তথ্যটাই প্রশ্নবিদ্ধ। ফেনিস সম্পর্কে বাকি পৃথিবীর জ্ঞান এত কম যে বোঝা মুশকিল—ওদের গল্পের কতখানি সত্যি, আর কতখানি মিথ। ফেনিসের কিংবদন্তি একই সঙ্গে বাস্তব এবং কল্পিত। পুরোটাই এমন এক রহস্যের আবরণে মোড়া, যার উৎস সম্পর্কে জানা নেই কারও। কর্সিকার পাগলাটে কাউন্ট গিলবার্তো বারেমির ডাকে নাকি গড়ে উঠেছিল এই সংঘ—একাদশ শতাব্দীর হাসাসিন গোত্রকে যেভাবে জন্ম দিয়েছিলেন শেখ হাসান ইবনে আল-সাবাহ। দুটোর মধ্যে এই মিল দেখে সন্দিহান হয়ে উঠতে হয়, হয়তো পুরোটাই এক আধুনিক রূপকথা।

বাস্তবেও কোনও প্রমাণ নেই। আজ পর্যন্ত কোনও আদালতে ফেনিসের বিপক্ষে সাক্ষী দেয়নি কেউ; এমন কোনও খুনি ধরা পড়েনি, যার সঙ্গে সংঘটার যোগাযোগের আলামত পাওয়া গেছে। কেউ যদি কখনও কোথাও স্বীকারোক্তি দিয়েও থাকে, তা জনসমক্ষে আসেনি। যা আছে, তা স্রেফ গুজব... লোকের কানকথা। প্রকাশ্যে কেউ কোনোদিন ফেনিস সম্পর্কে উচ্চবাচ্য করেনি, দুনিয়ার সমস্ত দেশের সরকার আর আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাও আশ্চর্য রকমের নীরব এই বিশেষ সংঘটার অস্তিত্বের বিষয়ে। এই নীরবতাই রানাকে কৌতূহলী করে তুলেছে—ওটা কি

ইচ্ছাকৃত, নাকি জোর খাটিয়ে সবাইকে বাধ্য করা হচ্ছে মুখ বন্ধ রাখার জন্য?

এখন পর্যন্ত যা কিছু ঘটে গেছে, তাতে দ্বিতীয় সম্ভাবনাটাই জোরালো। ওকে আর কুয়াশাকে খুন করার চেষ্টা করেছে ফেনিস, ব্যর্থ হওয়ায় ফাঁসিয়ে দিয়েছে মিথ্যে দুটো হত্যাকাণ্ডের অভিযোগে। অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন খোঁজখবর নেবার চেষ্টা করেছিলেন, তাই তাঁর প্রাণের উপরেও হামলা চালানো হয়েছে। কপাল ভাল, বেঁচে গেছেন নুমা চিফ; তবে অবস্থা সঙ্গীন। আমেরিকা ছাড়ার আগে জর্জ রেডক্লিফের সঙ্গে আরেক দফা কথা বলে এসেছে রানা, জানতে পেরেছে—সফল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে অ্যাডমিরালের শরীর থেকে গুলি বের করে নিতে পেরেছে ডাক্তাররা, তবে পুরোপুরি আশঙ্কামুক্ত নন তিনি এখনও। অপারেশনের পর তাঁকে সরিয়ে নেয়া হয়েছে অত্যন্ত গোপন এক স্থানে। এমনকী রানার পক্ষেও তাঁর সঙ্গে এখন আর যোগাযোগ করা সম্ভব হবে না। যোগাযোগ করে লাভও নেই, চেতনানাশক দিয়ে রাখা হয়েছে অ্যাডমিরালকে, অন্তত সপ্তাহখানেক পর্যন্ত তাঁর জ্ঞান ফেরানো ঝুঁকিপূর্ণ। তারপরেও কথাবার্তা বলার মত শক্তি ফিরে পেতে অনেক সময় লাগবে। যে-দু'জন মানুষকে তিনি সন্দেহ করেছেন, তাদের নাম আর এক্ষুণি জানা যাবে না।

কর্সিকা-ই এখন একমাত্র ভরসা। ফেনিসের জন্মভূমি থেকে সূত্র সংগ্রহ করতে হবে রানাকে। তাই বিসিআই হেডকোয়ার্টারে সংক্ষিপ্ত একটা রিপোর্ট পাঠানোর পর ছদ্ম-পরিচয়ে আমেরিকা ত্যাগ করেছে ও, লণ্ডন আর প্যারিস হয়ে গতকাল পৌঁছেছে স্যান ভিনসেনজো-তে। তিনদিন পেরিয়ে গেছে ইতিমধ্যে, যাত্রার শেষ পর্যায়ে রয়েছে এখন রানা। খুব শীঘ্রি পা রাখবে ভূমধ্যসাগরের মাঝখানে কর্সিকা দ্বীপের মাটিতে।

যাত্রাপথের বড় একটা সময় বিমান আর ফিশিং বোটে বসে বসে কাটানোয় চিন্তাভাবনা করার সুযোগ পেয়েছে রানা, ঠিক করে নিতে পেরেছে আশু-কর্মপদ্ধতি। নিরেট যে-দুটো তথ্য আছে, তার উপর ভিত্তি করেই তদন্ত শুরু করতে হবে ওকে। তথ্যদুটো হলো: গিলবার্তো বারেমি নামে সত্যিই একজন কাউন্ট ছিলেন, এবং তাঁর অধীনে একদল লোক ছিল, যারা নিজেদেরকে *কাউন্সিল অভ ফেনিস* বলে পরিচয় দিত। এর বাইরে নিরন্তর পরিবর্তিত হয়েছে পৃথিবী, দেশে দেশে ঘটেছে ক্ষমতার সহিংস পালাবদল। মানবজাতির ইতিহাসে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড নতুন কোনও বিষয় নয়। কিন্তু ওগুলোর পিছনে কারও না কারও হাত থাকে—বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ক্ষমতাসীন সরকারের। সরকার যখন হত্যাকাণ্ডের জন্য খুনি ভাড়া করে, তার পিছনে সূত্র পাওয়া খুব মুশকিল। সফল হবার পর খুনিদের সঙ্গে আলাদা এক বন্ধনও সৃষ্টি হয় নিয়োগকর্তাদের। এভাবেই হয়তো ধীরে ধীরে ক্ষমতাবান হয়ে উঠেছে ফেনিস।

লণ্ডনে থেমে রানা এজেন্সির মাধ্যমে ফেনিসের ফাইল জোগাড় করে নিয়েছে রানা। ডিটেইলড্ কিছু নেই, তবে ওটা পড়ে নানা ধরনের আইডিয়া এবং গুজবের ব্যাপারে পরিষ্কার একটা ধারণা হয়েছে ওর। আন্তর্জাতিক ইন্টেলিজেন্স কমিউনিটির ছোট্ট একটা অংশ মনে করে, চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকের অসংখ্য রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী ফেনিস। সারায়েভো থেকে মেক্সিকো সিটি, টোকিয়ো থেকে বার্লিন... এমন কোনও জায়গা নেই, যেখানে ওরা কাজ করেনি। পঞ্চাশের দশকে কভার্ট ইন্টেলিজেন্সের বিস্তৃতির ফলে সংঘটার বিলুপ্তি ঘটেছে বলে মনে করা হয়। রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের জন্য ভাড়াটে খুনির প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছিল তখন। বড় বড় দেশের সরকার তাদের নিজস্ব

ইণ্টেলিজেন্স এজেন্সির ছায়া সংগঠনের মাধ্যমে ঘটাতে পারত ওসব। ফেনিসের বিলুপ্তির পিছনে আরেকটা গুজবও আছে—ওদেরকে নাকি গ্রাস করে নিয়েছে সিসিলিয়ান মাফিয়া।

এ-সবই হচ্ছে মাইনরিটি রিপোর্ট। অফিশিয়ালি ইন্টারপোল, এমআই-সিক্স এবং সিআইএ-র ভাষ্য হলো, ফেনিসের ক্ষমতা সম্পর্কে যা কিছু জানা যায়, তার সবই অতিকথন। ইটালিয়ান এবং ফ্রেঞ্চ রাজনৈতিক মহলের ছোটখাট কিছু ব্যক্তিত্বকে হয়তো হত্যা করেছে ওরা, কিন্তু সেগুলোর একটাও উল্লেখযোগ্য নয়। সংঘটা স্রেফ একজন পাগলাটে মানুষ এবং তার অনুসারীদের সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়, যারা প্রচলিত সমাজব্যবস্থায় বিশ্বাসী ছিল না। উগ্রবাদী এমন সংগঠন দুনিয়ায় ভূরি ভূরি পাওয়া যাবে। এদেরকে খামোকাই নাকি বড় করে দেখানোর চেষ্টা করছে দুষ্ট কিছু লোক।

হুইলহাউস থেকে ক্যাপ্টেনের কণ্ঠ ভেসে আসাতে চিন্তায় ছেদ পড়ল রানার।

'কুইনদিসি মিনুতি!' চেঁচিয়ে জানাল লোকটা। 'আনদারে এন্ত্রো কোস্তা।'

'গ্রাৎসি, ক্যাপিতান,' ধন্যবাদ জানাল রানা।

'প্রেগো।'

আবার চিন্তার সাগরে ডুবে গেল রানা। ফেনিস! এ কি সম্ভব? একটা মাত্র সংগঠন কি সারা পৃথিবীর সমস্ত সন্ত্রাসবাদ আর অপরাধ-জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে? সবখানে সৃষ্টি করতে পারে অস্থিরতা?

হয়তো বা পারে। কোনও ধরনের প্রমাণ না থাকার পরেও ওকে এবং কুয়াশাকে যেভাবে দু'দুটো দেশের সর্বোচ্চ আইনপ্রয়োগকারী সংস্থার মাধ্যমে ফাঁসিয়ে দেয়া হয়েছে, তাতে

সংগঠনের ক্ষমতার ব্যাপারে কোনও রকম সন্দেহ রাখার অবকাশ নেই। প্রয়াত লিও ভাদিমের কথাই বোধহয় ঠিক—ফিরে এসেছে ফেনিস, নতুন এক কাউন্সিল নিয়ে। এবার ওরা আগের চেয়ে অনেকগুণ ভয়ঙ্কর... অনেকগুণ শক্তিশালী। নির্দিষ্ট কোনও লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছে। কী সেটা, জানা নেই; তবে ভাল কিছু যে নয়, তা তো পরিষ্কার। এ-কারণেই ঠেকাতে হবে ওদেরকে—নিজেকে এবং কুয়াশাকে নির্দোষ প্রমাণ করতে হবে, ওদের দুজনের ঘনিষ্ঠ দুই পিতৃসম ব্যক্তিত্বের উপর হামলার প্রতিশোধ নিতে হবে। তার জন্য ভেদ করতে হবে ফেনিস নামের দুর্জ্ঞেয় রহস্যটাকে।

কর্সিকা থেকে জোগাড় করতে হবে প্রথম সূত্র। বহু বছর আগে গিলবার্তো বারেমি যখন সূচনা ঘটায় কাউন্সিলের, কারা ছিল তার সহচর? কোথায় গেছে তারা? জানতে হবে রানাকে। কাউন্সিল অভ ফেনিসের পুরনো সদস্যদের গন্ধ শুঁকে বের করবে ও এখনকার নাটের গুরুকে।

'আতুয়ালমেন্তে!' চিৎকার শোনা গেল ক্যাপ্টেনের। 'ল্য অ্যাক্সেসো রোচিও!' বনবন করে ঘোরাচ্ছে হুইল। বোটের নাক ঘুরে যেতে শুরু করল সরু এক খালের দিকে। খোলা দরজা দিয়ে রানার দিকে তাকাল সে। 'অ্যাঙ্কোরা সিঙ্কে মিনুতি, সেনিয়র। ল্য তেরা দি কর্সিকা।'

'গ্রাৎসি, ক্যাপিতান।' তৃতীয়বারের মত ধন্যবাদ জানাল রানা।

কর্সিকায় পৌঁছে গেছে ওরা।

পাথুরে, পাহাড়ি পথ ধরে ছুটে চলেছে কুয়াশা; ঝোপঝাড়ের আড়াল ব্যবহার করছে নিজের দেহটাকে অনুসরণকারীদের দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রাখার জন্য। দূরত্ব বাড়াবার কোনও চেষ্টা করছে

না ও, চাইছে না পিছনের লোকগুলো ব্যর্থ হয়ে ফিরে যাক। তার বদলে ওদেরকে বিভ্রান্তির মাঝে ফেলে ছত্রভঙ্গ করে দিতে চাইছে। বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে ওদের একজনকে বন্দি করার মতলব, তার কাছ থেকে হয়তো অনেক প্রশ্নের জবাব মিলবে।

কর্সিকার ব্যাপারে লিও ভাদিমের ধারণাই ঠিক। পোর্তো ভেচিয়োর উত্তরের এই পাহাড়ি এলাকায় সত্যিই লুকিয়ে আছে রহস্য। দু'দিনেরও কম লেগেছে কুয়াশার সেটা আবিষ্কার করতে। একদল রক্তলোলুপ মানুষ এখন ওকে তাড়া করে ফিরছে পাহাড়ের ভিতর—বাধা দিতে চাইছে রহস্যটা উদ্‌ঘাটনের কাজে। চার রাত আগে কর্সিকা ছিল স্রেফ একটা অনুমান, ফেনিসের তথ্য পাবার শেষ খড়কুটো। পোর্তো ভেচিয়ো ছিল দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলের সামান্য এক শহর, ওর পিছনের পাহাড়গুলো ছিল অজ্ঞাত অঞ্চল। এখন সব বদলে গেছে।

পাহাড়ি অঞ্চলটা এখনও অজ্ঞাত, তবে মানুষগুলোর আচরণে ভয়াবহ এক পরিবর্তন এসেছে। শুরু থেকেই একটু অদ্ভুত লেগেছে ওদেরকে—অন্তর্মুখী, অতিথিবিমুখ। বিদঘুটে এক উচ্চারণে কথা বলে ওরা, আলাপ চালানো মুশকিল, কিন্তু সেটাই ওদের আচরণের একমাত্র ব্যাখ্যা হতে পারে না। কুয়াশাকে দেখামাত্র সন্দেহের চোখে তাকায় ওরা, ফেনিস বা বারেমি নামদুটো উচ্চারণ করলেই চেহারায় মেঘ জমে। জোরাজুরি করলে কথাই বন্ধ করে দেয়। হাবভাবে মনে হয়, নামদুটো নিষিদ্ধ শব্দ—অচেনা মানুষের সামনে উচ্চারণ করা বারণ।

চারদিন আগে হলে ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য ঠেকত কুয়াশার কাছে, কিন্তু এখন প্রত্যক্ষ প্রমাণ রয়েছে ওর কাছে। কাউন্ট গিলবার্তো বারেমির ফেনিস এখানকার পাহাড়ি আদিম জনতার মাঝে পবিত্র এক প্রতীক... বিকল্প এক ধর্ম! কোনও ভুল নেই

এতে, কারণ ফ্যানাটিকের মত আচরণ করছে লোকগুলো। ফেনিসের গোমর রক্ষা করার জন্য এরা প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত।

চারদিনে দুনিয়া বদলে গেছে কুয়াশার। শিক্ষিত, আধুনিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আর লড়ছে না ও এখন; লড়ছে প্রাচীন ধ্যান-ধারণায় বিশ্বাসী, অতীতের ছায়ায় বসবাসরত গেঁয়ো মানুষের বিরুদ্ধে। এদের চালচরিত্র আর প্রেরণা বোঝা দুষ্কর। তাই মরিয়া হয়ে উঠেছে অনুসরণকারীদের মধ্যে অন্তত একজনকে হাতের মুঠোয় পাবার জন্য।

কুয়াশার ধারণা, তিনজন পিছু নিয়েছে ওর। সামনে, পাহাড়ের চূড়া পর্যন্ত ঢালটা অনেক দীর্ঘ... অনেক চওড়া। পুরোটা ঢাকা পড়ে আছে নানা প্রজাতির গাছপালা, ঝোপঝাড় আর ছোট-বড় পাথরে। ওর খোঁজে চিরুনি-তল্লাশি চালাতে চাইলে ছত্রভঙ্গ হতে হবে ওদেরকে, আর তখুনি একজনকে ঘায়েল করার ইচ্ছে ওর। যদি যথেষ্ট সময় পায়, লোকটার পেট থেকে বের করে নেবে ওর প্রশ্নের জবাব। সাদাসিধে, গেঁয়ো একটা মানুষের উপর অত্যাচার চালাবার কোনও ইচ্ছে নেই ওর; কিন্তু আপাতত এ-ছাড়া আর কোনও পথ খোলা রাখেনি ওরা। গতকাল রাতে ওর দরজায় উদয় হয়েছিল *লুপো* শটগান-হাতে এক ছায়ামূর্তি, শেল ছুঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিয়েছিল বিছানাটাকে; ভেবেছিল কুয়াশা শুয়ে আছে ওখানে। প্রাণ বাঁচানোর জন্য পালাতে হয়েছে ওকে। মাথায় জ্বলছে আগুন। শটগানঅলাকে হাতে পেলে সবচেয়ে ভাল হয়, প্যাঁদানি দেয়ার সময় বিবেকের কোনও দংশন অনুভব করবে না ও।

বুনো ফার গাছের একটা ঝাড়ের পিছনে এসে থামল কুয়াশা। নকল পায়ে এত ছোটাছুটি পোষাচ্ছে না, বিশ্রাম দরকার। জিরিয়ে নেবার ফাঁকে নজর বোলাল ও ফেলে আসা পথের দিকে। ঢালের

অনেক নীচে জ্বলছে ফ্ল্যাশলাইটের ম্লান আলোকরশ্মি। একটা, দুটো... তিনটে। ছড়িয়ে পড়ল আলোগুলো। একদম বাঁয়ের মানুষটা উঠে আসছে ওর দিকে। আন্দাজ করল কুয়াশা, দশ মিনিট লাগবে লোকটার ফার গাছের কাছে পৌঁছুতে। ততক্ষণ আরাম করা যেতে পারে। একটা গাছের গোড়ায় ধপ্ করে বসে পড়ল ও।

কীভাবে কী ঘটল, সব স্বপ্নের মত লাগছে কুয়াশার। এই তো... দু'দিন আগে, বিকেল পাঁচটায় ও ছিল রোমের লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি এয়ারপোর্টে, ছোট একটা বিমান চার্টার করছিল বোনিফাসিয়ো-তে আসবার জন্য। জায়গাটা কর্সিকার দক্ষিণ উপকূলের ডগায়। সন্ধে সাতটায় বোনিফাসিয়ো-তে ল্যাণ্ড করে বিমান, এয়ারফিল্ড থেকে একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে সরাসরি চলে এসেছিল ও পোর্তো ভেচিয়োর উত্তরে পাহাড়ি এলাকায়। উঠেছিল স্থানীয় এক সরাইখানায়। গন্তব্যের কথা শুনে ট্যাক্সি ড্রাইভার বেশ অবাক হয়েছিল। জানিয়েছিল, এলাকাটা একেবারেই অনুন্নত, সভ্যতার ছোঁয়া লাগেনি। কী এক অজ্ঞাত কারণে স্থানীয় লোকজন নাকি আধুনিকতাকে এড়িয়ে চলে। তখুনি সতর্ক হওয়া উচিত ছিল ওর।

হয়নি কুয়াশা, বরং যেচে বিপদ ডেকে এনেছে। রানা কখন আসবে, তার ঠিক-ঠিকানা নেই, তাই ভেবেছিল একাই তদন্তের কাজ কিছুটা এগিয়ে রাখবে। রাতের খাওয়া শেষে তাই ও আলাপ জুড়ে দিয়েছিল সরাইমালিকের সঙ্গে।

'আমি একজন হিস্টোরিয়ান,' বলেছিল ও। 'আপনাদের এই এলাকার এক পুরনো জমিদারের ব্যাপারে তথ্য-সংগ্রহের জন্য এসেছি। তাঁর নাম কাউন্ট গিলবার্তো বারেমি।'

'হিস্টোরিয়ান?' ভুরু কুঁচকে গিয়েছিল সরাইমালিকের। 'কোন্

ইউনিভার্সিটির সঙ্গে আছেন?'

'ইউনিভার্সিটি না, প্রাইভেট ফাউণ্ডেশন। তবে আমাদের গবেষণায় সব ইউনিভার্সিটির উপকার হয়।'

'নাম কী ফাউণ্ডেশনের?'

'অর্গানিয্যাযিয়োন অ্যাকাডেমিকা। রোমে আমাদের অফিস। আমার সেকশনের কাজ—ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত সারডিনিয়া আর কর্সিকার বিস্তারিত ইতিহাস সংগ্রহ করা। যদ্দূর শুনেছি... পোর্তো ভেচিয়োর উত্তরাংশ কাউন্ট বারেমি নিয়ন্ত্রণ করতেন। কথাটা কি সত্যি?'

'হ্যাঁ। এখানকার বেশিরভাগ জমির মালিক ছিলেন তিনি, সেনিয়র। খুব ভাল মানুষ... প্রজাদের ভালমন্দের দিকে কড়া নজর রাখতেন।'

'শুনে খুশি হলাম। কর্সিকার ইতিহাসে তাঁকে একটা জায়গা দিতে চাই। কিন্তু কোত্থেকে যে শুরু করব, তার কিছুই বুঝতে পারছি না।'

কথাটা শুনে সন্দেহ জমা হয়েছিল সরাইমালিকের চোখে। তারপরেও নির্বিকার কণ্ঠে সে বলেছিল, 'শুরু করতে পারেন ভিলা বারেমি-র ধ্বংসস্তূপ থেকে। রাতটা পরিষ্কার, চাঁদ উঠেছে আকাশে। চাঁদের আলোয় খুব সুন্দর লাগে জায়গাটা। আপনি চাইলে পথ দেখাবার জন্য একজন লোক দিতে পারি আমি... মানে, যদি জার্নির কারণে ক্লান্তি বোধ না করেন আর কী!'

'না, না,' তাড়াতাড়ি বলেছিল কুয়াশা। 'একটুও ক্লান্ত নই আমি।'

পাহাড়ি এলাকার অনেকখানি ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ওকে... যেখানে ভৌতিক অবয়ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এককালের সুসমৃদ্ধ জমিদারির কঙ্কাল। প্রায় এক একর জায়গা নিয়ে গড়া

হয়েছিল প্রাসাদোপম বাড়িটা, ভাঙাচোরা দেয়াল আর হেলে পড়া চিমনি ছাড়া কিছুই এখন আর অবশিষ্ট নেই। আগাছার তলায় আঁচ করা যায় বিশাল এক বৃত্তাকার ড্রাইভওয়ের চিহ্ন। বাড়ির দু'পাশ দিয়ে গেছে নুড়ি বিছানো হাঁটাপথ, ফুলের কেয়ারির সীমানাগুলো মুখ ব্যাদান করে রেখেছে জংলা ঘাসের মাঝ থেকে; যেন মনে করিয়ে দিচ্ছে—এক সময় অপূর্ব এক বাগান ছিল ওখানে।

পাহাড়ি এক সমতলের উপর, চাঁদের আলোয় কাউন্ট বারেমির বাড়ির ধ্বংসস্তূপ দেখে অদ্ভুত এক অনুভূতি হয়েছিল কুয়াশার। পাগলাটে ওই মানুষটার স্মারকচিহ্ন যেন ওটা—কালের প্রভাবে স্রেফ বাহ্যিক অবয়ব ধ্বংস হয়েছে, কিন্তু ভিতরে লুকিয়ে থাকা অশুভ ক্ষমতা কমেনি একটুও। তার প্রমাণ হিসেবেই যেন পিছনে অচেনা কণ্ঠস্বর শুনেছিল ও, লক্ষ করেছিল—ওর পথপ্রদর্শক ছেলেটা উধাও হয়ে গেছে। তার বদলে উদয় হয়েছিল রুক্ষ চেহারার দুটো লোক, দায়সারা ভঙ্গিতে অভিবাদন জানিয়ে রীতিমত জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিয়েছিল। প্রায় একঘণ্টা ওকে জেরা করেছে লোকগুলো, বিরক্তিতে একবার মনে হয়েছিল দু'ঘা বসিয়ে ব্যাটাদেরকে বেহুঁশ করে ফেলে। কিন্তু তাতে কাজের কাজ কিছুই হবে না বলে সব সহ্য করে গেছে কুয়াশা। হিস্টোরিয়ানের গপ্পোটা ধরে রেখেছে ও, কিছুতেই টলেনি। শেষ পর্যন্ত ওকে প্রত্যাশিত উপদেশটাই দিয়েছে ওরা।

'যেখান থেকে এসেছ, সেখানেই ফিরে যাও, সেনিয়র। জানার মত কিছু নেই এখানে, কেউ কিছু বলতে পারবে না। বহুকাল আগে মহামারী লেগেছিল এই এলাকায়। সে-সময়কার লোকজন মরে সাফ হয়ে গেছে। তোমাকে সাহায্য করবার মত কেউ অবশিষ্ট নেই।'

'সবাই মরে কীভাবে?' বলেছিল কুয়াশা। 'খুঁজলে পুরনো আমলের দু'একজনকে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে। আমি চেষ্টা করতে চাই।'

'খামোকা কষ্ট কোরো না। বলছি তো, কেউ তোমার প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে না। দেখো ভায়া, আমরা সাদাসিধে মানুষ... চাষাভুষো। অচেনা লোক এলে জীবনযাত্রায় ব্যাঘাত ঘটে। চলে যাও তুমি।'

'পরামর্শটা আমার মাথায় রইল...'

'ওসব শুনতে চাই না। তোমার ভালর জন্যই বলছি, সেনিয়র... ফিরে যাও!'

হুমকিটাকে পাত্তা দেয়নি কুয়াশা, ফিরে এসেছিল সরাইখানায়। পরদিন ভোরে আবার গিয়েছিল ধ্বংসস্তূপ দেখতে, তারপর ঘুরতে শুরু করেছিল পুরো এলাকায়। চোখের সামনে যত খামার দেখেছে, সবগুলোতে ঢুঁ মেরেছে, খামারের চাষীদের সঙ্গে কথা বলে জানতে চেয়েছে কাউন্ট বারেমি আর ফেনিস সম্পর্কে। জবাব পায়নি কোথাও, অসহযোগিতা এবং চরম বৈরিতা সহ্য করেছে নীরবে। টের পেয়েছে, সারাক্ষণ ওকে অনুসরণ করা হচ্ছে। মানুষের নীরবতা এবং বিচলিত চেহারা লক্ষ করে আরেকটা ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেছে—শুধু পিছনে নয়, ওর সামনেও লোক আছে। আগেভাগে সবখানে গিয়ে সতর্ক করে দিচ্ছে তাঁরা—ছড়িঅলা আগন্তুকের কাছে যেন কেউ মুখ না খোলে।

সেই রাতে... মানে গতকাল রাতে খাবারের টেবিলে বসে থাকা অবস্থায় সরাইমালিক এগিয়ে এসেছিল ওর দিকে। কাঁচুমাঁচু মুখে জানিয়েছিল, 'দুঃখিত, সেনিয়র। আপনাকে এখানে আর থাকতে দিতে পারছি না আমি। কামরাটা আরেকজনের কাছে

ভাড়া দিয়ে ফেলেছি।'

ভাবলেশহীন চেহারায় তার দিকে তাকিয়েছিল কুয়াশা। বলেছিল, 'দুঃখজনক। তবে কামরার দরকার নেই, রাত কাটানোর জন্য স্রেফ একটা আর্মচেয়ার হলেই চলবে আমার। খাট যদি দিতে পারেন তো আরও ভাল হয়। সকালবেলা এমনিতেই চলে যাব বলে ভাবছি। যা খুঁজছিলাম, তা পেয়ে গেছি।'

'কী সেটা, সেনিয়র?'

'শীঘ্রি জানতে পারবেন। আমার পরে আরও লোক আসবে এখানে। প্রপার ইকুইপমেন্ট আর ল্যাণ্ড রেকর্ড-সহ। নিখুঁত... সত্যিকার গবেষণাধর্মী তদন্ত হবে এখানে। যা ঘটে গেছে আপনাদের এলাকায়, তা খুবই ইন্টারেস্টিং! মানে... অ্যাকাডেমিক দৃষ্টিকোণ থেকে আর কী।'

ভীত একটা দৃষ্টি ফুটেছিল সরাইমালিকের চোখে। 'কালই চলে যাবেন? বেশ... রাতটা তা হলে আর বাইরে থাকার প্রয়োজন নেই। কামরায় চলে যান, আমি ম্যানেজ করে নেব।'

এর ঠিক ছ'ঘণ্টা পর শটগান হাতে উদয় হয়েছিল সেই লোক—ব্যারেল কাটা শটগান, স্থানীয়রা একে বলে *লুপো*... মানে, নেকড়ে। গুলি ছুঁড়েছিল ওর বিছানা লক্ষ্য করে, শপথবাক্যের মত উচ্চারণ করেছিল একটা কথা: *'পার নস্ত্রো সার্কোলো!'* মানে, আমাদের চক্রের জন্য! তারপর পালিয়ে গিয়েছিল ঊর্ধ্বশ্বাসে। কাপড় রাখার আলমারির ভিতর থেকে সব দেখেছে কুয়াশা। শটগানের গগনবিদারী আওয়াজে সরাইখানায় কোনও আলোড়ন সৃষ্টি হয়নি, কেউ দেখতে আসেনি কী ঘটেছে।

এরপর পরিস্থিতির ভয়াবহতা বুঝতে অসুবিধে হবার কথা নয়। জানালা গলে সরাইখানা থেকে পালিয়ে এসেছে কুয়াশা।

পোর্তো ভেচিয়ো-মুখী কাঁচা রাস্তা ধরে এগিয়েছে ও। কিছুদূর যাবার পর রাস্তার পাশে ঝোপের আড়ালে সিগারেটের আগুন দেখেছে। ঘাপটি মেরে কেউ বসে আছে ওখানে, আটকে রেখেছে পথ। রাস্তা ছেড়ে ঝোপঝাড়ের আড়ালে কুয়াশাও ঢুকে পড়েছে তখন, অপেক্ষা করেছে। অপেক্ষা না করে উপায় ছিল না, রানার আসবার কথা। ওই রাস্তা ধরেই আসবে বিসিআই এজেন্ট, তাকে সতর্ক করে দিতে হবে।

পরদিন... মানে আজ বিকেল তিনটে পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে কুয়াশা, রানার চিহ্নও দেখেনি। ওখানে বসে থাকা আর সম্ভব হয়নি রাস্তা ধরে লাঠিসোটা আর আগ্নেয়াস্ত্র হাতে একদল মানুষকে এগোতে দেখায়। বোঝাই যাচ্ছিল, ওকে খুঁজে বের করে চিরতরে মুখ বন্ধ করার জন্য বেরিয়েছে লোকগুলো।

কয়েক ভাগে ভাগ হয়ে গেছে সার্চ পার্টি, শুরু করেছে তল্লাশি। পাহাড়ি মাচেটি নিয়ে ঝোপঝাড় কাটতে কাটতে দু'জন ওর ত্রিশ ফুটের মধ্যে চলে এসেছিল। স্রেফ কপাল ভাল থাকায় ওকে দেখতে পায়নি। অগত্যা সরে যেতে হয়েছে কুয়াশাকে, শুরু করতে হয়েছে ইঁদুর-বেড়াল খেলা। সূর্য ডোবার আগ পর্যন্ত বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে ধাওয়াকারীদের মাঝে। কখনও একদিকে উদয় হয় ওর পদচিহ্ন, পরক্ষণে আবার ঠিক উল্টোদিকে। এক পর্যায়ে ধাওয়াকারীদের মনে হলো জলাভূমির মত একটা জায়গায় ঘিরে ফেলা গেছে শত্রুকে, ওখানে পৌঁছুনোর পর চমকে উঠে দেখল—কয়েকশ' গজ দূরে, পাহাড়ি ঢাল ধরে খোলা এলাকার দিকে চলে যাচ্ছে মানুষটা। জলাভূমিতে আসলে যায়-ইনি সে। এভাবে সবাইকে ঘোল খাইয়ে বেড়িয়েছে ও গত কয়েকটা ঘণ্টা।

আঁধার নামার পর কৌশল বদলেছে কুয়াশা, তার ফলশ্রুতিতে বর্তমান অবস্থানে পৌঁছেছে। লুকিয়ে আছে একটা পাহাড়চূড়ার

কাছে, ফার গাছের ঝাড়ের আড়ালে। অপেক্ষা করছে ফ্ল্যাশলাইট হাতে এগোতে থাকা নিঃসঙ্গ শত্রুর জন্য। সহজ প্ল্যান অনুসরণ করেছে ও, তিন ধাপে বাস্তবায়িত করেছে সেটাকে। প্রথমে সৃষ্টি করেছে ডাইভারশন। হামলাকারীদের বড় অংশটাকে সরিয়ে দিয়েছে দূরে। এরপর এক্সপোজারের মাধ্যমে ছোট একটা দলকে নিয়ে এসেছে নিজের কাছে। সবশেষে সেপারেশনের মাধ্যমে দলের সদস্যদেরকে বিচ্ছিন্ন করেছে পরস্পরের কাছ থেকে। পরিকল্পনার সফল সমাপ্তি ঘটতে চলেছে খুব শীঘ্রি। দেড় মাইল দূরে, বনের ভিতর থেকে লাফিয়ে ওঠা অগ্নিশিখা তার প্রমাণ। গত এক ঘণ্টায় তিনটে জায়গায় মরা ডাল-পাতা জড়ো করে আগুন জ্বেলে দিয়েছে ও। দাবানলের আতঙ্কে এখন ওগুলো নেভানোয় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে সবাই, সত্যিকার অর্থে ধাওয়া চালিয়ে যাচ্ছে হাতে গোনা কয়েকজন লোক। তাদেরই একজন নিঃসঙ্গভাবে এগিয়ে আসছে ওর দিকে... ওর পাতা ফাঁদে।

ফার গাছের ঝরা পাতার সমুদ্রে শরীর সেঁধিয়ে দিল কুয়াশা, শুয়ে পড়ল উপুড় হয়ে। একটু পরেই পদশব্দ ভেসে এল সামনে থেকে, পৌঁছে গেছে লোকটা। মাথা সামান্য উঁচু করে উঁকি দিল ও—চেহারা বোঝা যাচ্ছে না, মাঝারি গড়নের একজন মানুষ, দু'হাতে ধরে রেখেছে একটা মান্ধাতা আমলের রাইফেল। গাছের ঝাড়ের ভিতরে ঢুকেই দ্রুত ফ্ল্যাশলাইট ঘোরাল চারদিকে, কিছু দেখতে না পেয়ে আবার এগোতে শুরু করল। লোকটাকে কয়েক গজ এগিয়ে যেতে দিল কুয়াশা, ওর দিকে পিঠ এসে যেতেই নিঃশব্দ বেড়ালের মত উঠে দাঁড়াল, চোখের পলকে পৌঁছে গেল শত্রুর পিছনে, পিস্তলের বদলে হাতে নিয়ে এসেছে ছড়িটা।

আওয়াজ শুনে দ্রুত ঘুরতে শুরু করল লোকটা। ছড়ির বাঁকা অংশটা আটকে একটানে তার হাত থেকে রাইফেল কেড়ে নিল

কুয়াশা, তারপর হাত মুঠো করে প্রচণ্ড এক আঘাত হানল সোলার প্লেক্সাসে। বাতাসের অভাবে খাবি খেতে খেতে মাটিতে বসে পড়ল লোকটা, মুখ দিয়ে আওয়াজ বেরুচ্ছে না। লাথি মেরে তাকে চিৎ করল কুয়াশা, চড়ে বসল বুকের উপর। লোকটার কোমরে একটা খাপবদ্ধ ছুরি আছে, সেটা খুলে নিয়ে ফলাটা ঠেকাল প্রতিপক্ষের গলায়।

'তুমি আর আমি একান্তে কিছুটা সময় কাটাব, বন্ধু,' ইটালিয়ানে বলল কুয়াশা। 'বেশ কিছু প্রশ্ন আছে আমার, সেগুলোর জবাব দেবে তুমি। যদি ঠোঁটে তালা আঁটো, তোমার ছুরিটাই চালাব তোমার গলায়। চেহারার এমন দশা করব, জন্মদাত্রী মা-ও চিনতে পারবে না লাশটা। বুঝতে পেরেছ কী বলছি?'

আতঙ্কিত ভঙ্গিতে চোখ পিটপিট করল লোকটা।

'গুড, উঠে দাঁড়াও,' বুকের উপর থেকে সরে গেল কুয়াশা। 'খবরদার, আওয়াজ কোরো না।'

একসঙ্গে উঠে দাঁড়াল দু'জনে। পরমুহূর্তেই মড়মড় শব্দ শোনা গেল খুব কাছ থেকে—শুকনো ডালে পা ফেলেছে কেউ। ঝট্ করে ঘুরে দাঁড়াল কুয়াশা... এবং উপলব্ধি করল, সবাইকে বোকা ভাবা মোটেই উচিত হয়নি ওর। ওকে টেক্কা দেবার মত একজন হলেও আছে চাষাভুষোদের মাঝে। নীচের ঢালে কোনও গাছের ডালে নিজের ফ্ল্যাশলাইট বেঁধে রেখে এসেছে লোকটা, বাতাসের দোলায় নড়েছে আলোকরশ্মি, কুয়াশার কাছে মনে হয়েছে নীচেই বুঝি তল্লাশি চালাচ্ছে লোকটা। বাস্তবে অন্ধকারের আড়াল নিয়ে চেনা পথ ধরে উপরে উঠে এসেছে সে, যেদিক থেকে হামলা আশা করেনি, সেখান দিয়ে উদয় হয়েছে ভূতের মত।

মাটিতে পড়ে থাকা ফ্ল্যাশলাইটের আভায় পরিচিত

অবয়বটাকে দ্বিতীয়বারের মত দেখতে পেল কুয়াশা। প্রথমবার দেখেছিল সরাইখানায়... ওর কামরার দরজায়। হাতের লুপো শটগান তখন তাক করা ছিল বিছানার দিকে, কিন্তু ওটা এখন স্থির হয়ে আছে ওর বুক বরাবর।

'কাল রাতে আমাকে তুমি ফাঁকি দিয়েছ, সেনিয়র,' বলে উঠল মানুষটা। 'কিন্তু এখানে সে-সুযোগ পাবে না।'

'তুমি ফেনিসের লোক?' রাগী গলায় জিজ্ঞেস করল কুয়াশা।

জবাব দিল না মানুষটা। তার বদলে উচ্চারণ করল তার পুরনো মন্ত্র, 'পার নস্ত্রো সার্কোলো!'

মরিয়া হয়ে ঝাঁপ দিল কুয়াশা। লুপোর ডাবল-ব্যারেলের বিস্ফোরণের আওয়াজে কেঁপে উঠল গোটা পাহাড়।

তেরো

বোটের গানেল টপকে অগভীর পানিতে নেমে পড়ল রানা, কোমর পর্যন্ত ডুবে গেল তাতে। পানি ভেঙে তীরের দিকে এগোল ও, দু'হাতে হ্যাভারস্যাক আর ডাফল ব্যাগ উঁচু করে ধরেছে। সৈকত বলতে কিছু নেই খালের পারে, ছোট-বড় নানা আকারের পাথর দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে দু'ধার—ভাঙন ঠেকানোর জন্য। ওখানে পৌঁছে দ্রুত খোলা জায়গা পেরুল রানা, ঢুকে পড়ল গাছপালার ভিতরে। বোটের ক্যাপ্টেন সতর্ক করে দিয়েছে—তীরের কাছটায় টহল দেয় পুলিশ। কাউকে সন্দেহ হলেই আটক করে। ঘুষ দিলে

মুক্তি মিলবে, এমন গ্যারাণ্টি নেই।

মাটিতে হাতের বোঝা নামিয়ে রাখল রানা, ডাফল ব্যাগের ভিতর থেকে বের করল কর্ডের ট্রাউজার, এক জোড়া অ্যাঙ্কেল বুট, গাঢ় রঙের সোয়েটার, আর একটা উলের জ্যাকেট। সবই সেকেণ্ড হ্যাণ্ড, প্যারিস থেকে কিনেছে। এ-পোশাকে ওকে স্থানীয় অধিবাসীর মত দেখাবে। কাপড় বদলে নিল ও, ভেজা পোশাক একটা পলিথিন ব্যাগে পুরে ঢুকিয়ে রাখল ব্যাগের ভিতর। হাঁটতে শুরু করল ঢালু পথ ধরে, দ্বীপের মূল সড়কের দিকে। বিভিন্ন কাজে কর্সিকায় অতীতে কয়েকবারই এসেছে রানা, রাস্তাঘাট মোটামুটি চেনা আছে। দূর থেকে ভিলা বারেমির ধ্বংসস্তূপও দেখেছে একবার। তখন অবশ্য জানত না, কতবড় রহস্য জড়িয়ে আছে ওটার সঙ্গে।

রাস্তায় পৌঁছে টুপিটা কপালের উপর একটু টেনে দিল রানা। হাঁটতে হাঁটতে ভাবল কুয়াশার কথা। কোথায় লোকটা? কর্সিকায় নিরাপদে পৌঁছুতে পেরেছে তো? এখন কি পোর্তো ভেচিয়োর পাহাড়ি এলাকায় অপেক্ষা করছে ওর জন্য? খুব শীঘ্রি জানা যাবে জবাব। স্থানীয় লোকজনের মাঝে ওর মত বিদেশি একজন আগন্তুককে খুঁজে পেতে কষ্ট হবে না।

ঘড়ি দেখল রানা। বেলা সাড়ে এগারোটা বাজে। জ্যাকেটের ভিতর থেকে একটা ম্যাপ বের করে নিজের লোকেশন আন্দাজ করার চেষ্টা চালাল। সেইন্ট লুসি থেকে সম্ভবত আড়াই মাইল দক্ষিণে আছে ও। সোজা পশ্চিমে গেলে কাউন্ট বারেমির এলাকা। তবে ওখানে যাবার আগে একটা বেস অভ অপারেশন দরকার; এমন একটা জায়গা, যেখানে নিজের বাড়তি জিনিসপত্র লুকিয়ে রেখে যেতে পারবে। হোটেল বা সরাইখানা হলে চলবে না, ওসব জায়গায় ওর মত অচেনা মানুষকে দেখে মনে রাখবে সবাই।

জায়গাটা হতে হবে নির্জন; বনের ভিতরে হলেই ভাল হয়। কাছাকাছি পানির উৎস আর ছোটখাট দু'একটা দোকান থাকা দরকার, যা-তে সহজে খাবার জোগাড় করা যায়। কতদিন পোর্তো ভেচিয়োয় থাকতে হবে, বলা যায় না। সবই নির্ভর করছে ও আর কুয়াশা কতদিনে ফেনিস সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে, তার ওপর।

কিছুদূর এগোবার পর একটা পায়ে হাঁটা পথ দেখতে পেল ও, দ্বীপের মূল সড়কের পাশ থেকে শুরু হয়ে পশ্চিমদিকে চলে গেছে। সম্ভবত পশুচারণের জন্য রাখালেরা ব্যবহার করে ওটা, একেবারে সরু, গাড়ি যেতে পারবে না। হ্যাভারস্যাকের স্ট্র্যাপ ভাল করে এঁটে নিল, ডান হাত থেকে বাম হাতে নিল ডাফল ব্যাগ, তারপর ওই পথে নেমে পড়ল রানা।

দুপুর পৌনে একটা নাগাদ দ্বীপের ছ'মাইল ভিতরে ঢুকে পড়ল ও। আঁকাবাঁকা পথে এগিয়েছে, খোলা জায়গায় বেশিক্ষণ থাকেনি। অবশেষে যা খুঁজছিল, তা পেয়ে গেল। পাহাড়ির ঝর্ণার কিনারে বনের একটা অংশ আচমকা উঁচু হয়ে উঠেছে, বড় বড় কর্সিকান পাইন আর ঝোপ-জঙ্গল মিলে সবুজ এক প্রাচীর সৃষ্টি হয়েছে ওখানে। মানুষ এবং জিনিসপত্র... দুটোই লুকানোর জন্য আদর্শ। দক্ষিণ-পশ্চিমে, মাইলখানেক দূর দিয়ে গেছে আরেকটা পথ—উঠে গেছে পাহাড়ি ঢাল বেয়ে। ম্যাপ মিলিয়ে নিল রানা; নিশ্চিত হলো, ওই পথ ধরে পৌঁছুনো যাবে কাউন্ট বারেমির এলাকায়। খুব বেশি সময়ও লাগবে না।

ঝর্ণা পেরিয়ে পাইন গাছের তলায় চলে গেল ও। ডাফল ব্যাগ থেকে ছোট একটা শাবল বের করে মাটি খুঁড়তে শুরু করল। গর্তের ভিতর লুকিয়ে ফেলল ব্যাগ আর হ্যাভারস্যাক। তার আগে বদলে নিল কাঁধ ও পায়ের ব্যাণ্ডেজ। ধুয়ে নিল হাত-মুখ। সঙ্গে

আনা বিস্কিট দিয়ে লাঞ্চ সারল। তারপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল গাছের ছায়ায়। বিশ্রাম না নিলে শরীর আর চলতে চাইছে না।

ঘুম এল না সহজে, নানা রকম চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে রইল মন। শেষ পর্যন্ত যখন চোখ মুদল, দুঃস্বপ্ন দেখল ঘুমের মাঝে।

হঠাৎ জেগে উঠল রানা। নড়ল না সঙ্গে সঙ্গে, নিঃসাড়ে পড়ে থেকে বোঝার চেষ্টা করল ঘুম ভাঙার কারণ। খেয়াল করল, বেলা পড়ে এসেছে। ঘড়িতে বিকেল চারটে বাজে। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়া রোদের তেজ কমে গেছে অনেক। আকাশে আতঙ্কিত ভঙ্গিতে ডানা ঝাপটাচ্ছে অনেকগুলো পাখি, ওগুলোর আওয়াজেই আসলে নিদ্রাভঙ্গ হয়েছে ওর। কিন্তু পাখিগুলো এমন করছে কেন?

ধীরে ধীরে উঠে বসল রানা, পরমুহূর্তে শুনতে পেল নতুন আওয়াজ। বনের ভিতরে ছোটাছুটি করছে মানুষ, আবছাভাবে তাদের উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ভাসছে বাতাসে। কপালে ভাঁজ পড়ল ওর। কেউ ওকে দেখে ফেলেছে? তা কী করে হয়? উবু হয়ে ঝোপের পাশে গেল ও, পাতা সরিয়ে উঁকি দিল সন্তর্পণে।

একশো গজ দূরে, ঝর্ণার অন্য পাড়ে স্থানীয় দু'জন যুবককে দেখতে পেল রানা—মাচেটি চালাতে চালাতে বেরিয়ে এসেছে জঙ্গল ভেদ করে। দু'জনেরই কোমরে ঝুলছে পিস্তল। পানির ধারে পৌঁছে থেমে গেল ওরা, ব্যস্তভাবে নজর বোলাল চারপাশে, হাবভাবে মনে হলো কিংকর্তব্য ঠিক করতে পারছে না। শিকারী নাকি? বুনো হরিণ শিকারে বেরিয়েছে?

রানার ধারণাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করে শোনা গেল চিৎকার। দুই যুবকের কণ্ঠ থেকে ভেসে আসেনি সেটা, এসেছে বনের ধারের ফাঁকা মাঠ থেকে।

'ইল্ উয়োমো। একোলো! ইল্ ক্যাম্পো!!'

বুনো পশু না, মানুষ শিকারে বেরিয়েছে ওরা! চিৎকার শুনেই পিস্তল হাতে নিয়ে দুই যুবক যেভাবে ছুটে চলে গেল, তাতে বোঝা গেল, শিকারকে দেখামাত্র খুন করে ফেলবে। কিন্তু কাকে খুঁজছে ওরা? কুয়াশাকে?

কেন যেন বাঙালি বিজ্ঞানীর নামটাই মাথায় এল রানার। অদ্ভুত একটা অনুভূতি হলো সঙ্গে সঙ্গে, ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে উঠল—অনুমানটা ভুল নয়। কিন্তু কেন? কুয়াশা কি এরই মধ্যে কিছু জেনে ফেলেছে?

পাইন গাছের আড়ালে এসে পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে ভাবল রানা। রাস্তা ধরে পোর্তো ভেচিয়োতে চলে যেতে পারে, কুয়াশার জন্য অপেক্ষা করতে পারে ওখানে। লুকিয়ে থাকার জন্য ঝর্ণার ধারের এ-জায়গাটা আদর্শ, অনায়াসেই সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাটিয়ে দিতে পারবে এখানে, এরপর অন্ধকারের আড়াল ব্যবহার করে পোর্তো ভেচিয়োয় পৌঁছুতে কষ্ট হবে না। সমস্যা হলো, অনেকটা সময় বসে থাকতে হবে এতে; অথচ কী ঘটেছে, তা জানার জন্য ছটফট করছে মন। একটাই বিকল্প আছে সামনে—শিকারীদেরকে অনুসরণ করা, কম সময়ে কুয়াশাকে নাগালে পাবার এটাই সহজ উপায়। ওটাই করবে বলে সিদ্ধান্ত নিল রানা।

বিকেল সাড়ে পাঁচটায় প্রথমবারের মত কুয়াশার দেখা পেল ও—পাহাড়ি এক ঢাল ধরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে। অস্তায়মান সূর্যের আলোয় আবছাভাবে আলোকিত দীর্ঘ দেহটা লক্ষ্য করে কয়েকটা গুলি ছুঁড়ল উত্তেজিত জনতা, কিন্তু লাগাতে পারল না। একটু পরেই মুচকি হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে—কুয়াশার কৌশল বুঝতে পেরে। পালাবার চেষ্টা করছে না লোকটা, বরং শত্রুদের মাঝে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে দিয়ে একজনকে কবজা করতে চাইছে। মন্দ নয়

বুদ্ধিটা, দুঃসাহসিকও বটে—শত্রুর এলাকায় শত্রুকেই আটক করা! কেউ আশা করবে না ব্যাপারটা।

লম্বা লম্বা ঘাসে ঢাকা সমভূমির মাঝখানে ঘাপটি মেরে আশপাশের এলাকা জরিপ করল রানা। সন্ধ্যার বাতাসে বার বার নুয়ে পড়ছে ঘাসের ডগা, উন্মুক্ত হয়ে যাচ্ছে দৃষ্টিসীমা—সুবিধেই হলো এতে। কুয়াশার পরবর্তী পদক্ষেপ, সেইসঙ্গে কোথায় ওকে ইন্টারসেপ্ট করা যায়—বোঝার চেষ্টা করল। উত্তরদিকে যাচ্ছে লোকটা, মাইলখানেক গেলে পর্বতসারির গোড়ায় পৌঁছুবে। থামবে ওখানেই, কারণ পাহাড়ের উপরে উঠে কোনও লাভ হবে না। তারমানে আবার ফিরে আসবে সে, দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে এগোবে, যাতে ধাওয়াকারীদের সামনে পড়ে না যায়। ওদিকেই কোথাও ডাইভারশন সৃষ্টি করবে, বিশৃঙ্খলার মাঝে পাতবে ফাঁদ, আটক করবে কাউকে।

ওই সময়টাতেই কুয়াশাকে ইন্টারসেপ্ট করতে হবে। আগে করা গেলে ভাল হতো, কারণ ফাঁদ নিয়ে যখন সে ব্যস্ত থাকবে, তখন যে-কোনও ধরনের অ্যাপ্রোচ ঝুঁকিপূর্ণ। ওকে শত্রু ভেবে বসতে পারে কুয়াশা। কিন্তু আর কোনও উপায়ও নেই। ডাইভারশন এবং কনফিউশন ছড়াবার জন্য ছোটাছুটি করছে কুয়াশা, তার মাঝে ওর ধারেকাছে পৌঁছুনো সম্ভব নয়। তাই হামাগুড়ি দিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে এগোতে শুরু করল রানা।

ধীরে ধীরে দূর পাহাড়ের আড়ালে মুখ লুকাল সূর্য। গোটা এলাকার ছায়াগুলো দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর... গাঢ় থেকে গাঢ়তর হলো। পাহাড়ি এলাকা ঢেকে যেতে শুরু করল নিকষ অন্ধকারে। কিন্তু কুয়াশার কোনও চিহ্ন দেখতে পেল না রানা। যেখানে তাকে আশা করছে ও, সেখানকার পেরিমিটারের ভিতর ঘোরাফেরা করতে থাকল। সন্ধ্যার আবছায়া পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিচ্ছে

চোখ, কান খাড়া করে রেখেছে অস্বাভাবিক শব্দ শোনার জন্য। কিন্তু না, নেই কুয়াশা।

চলাচলের সুবিধার্থে কাঁচা রাস্তার দিকে গেছে নাকি লোকটা? অমন কাজ করে থাকলে মস্ত বোকামি করেছে। পুরো এলাকা এখন জ্যান্ত হয়ে আছে সার্চ-পার্টির হট্টগোলে। ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে সবাই চিরুনি-তল্লাশি চালাচ্ছে—একেক দলে দুই থেকে ছ'জন মানুষ, প্রত্যেকে সশস্ত্র—ছুরি, বন্দুক বা মাচেটি... কিছু না কিছু আছে সবার কাছে। আর আছে ফ্ল্যাশলাইট। আলোকরশ্মিগুলো ডানে-বামে ঘুরছে, ক্ষণে ক্ষণে ভেদ করছে পরস্পরকে, যেন অত্যাধুনিক সিকিউরিটি সিস্টেমের ইণ্টারসেক্টিং লেজার। ঢাল ধরে আরও উঁচুতে উঠে যেতে শুরু করল রানা। ফ্ল্যাশলাইটের আলোকরশ্মিগুলোই এখন বাঁচাচ্ছে ওকে উন্মত্ত, খুনে কর্সিকানদের হাত থেকে। ওগুলো দেখেই ও বুঝতে পারছে, কখন এগোতে হবে, কখনই বা থেমে যেতে হবে।

দুটো আলোকরশ্মির মাঝখান দিয়ে পথ করে ছুটছিল রানা, আচমকা থেমে গেল গরগর করতে থাকা একটা পশুকে দেখতে পেয়ে—চোখ বড় করে ওটা তাকিয়ে আছে ওর দিকে। ছুরি বের করে ফেলেছিল রানা, থেমে গেল প্রাণীটার পরিচয় টের পেয়ে। সাধারণ এক পোষা কুকুর—পশুচারণের সময় গরু-ছাগল আর ভেড়ার পালকে একাট্টা রাখার জন্য ব্যবহার করে রাখালরা। মোটেই হিংস্র নয়। কাছে গিয়ে সতর্কভাবে কুকুরটার গায়ে হাত বোলাল ও, বাধা পেল না। গরগরানি থেমে গেল, গুটিসুটি মেরে মাটিতে বসে পড়ল প্রাণীটা। ফ্ল্যাশলাইটের আলো এগিয়ে আসছে দেখে তাড়াতাড়ি ওখান থেকে সরে গেল রানা।

মাটিতে অর্ধেক দেবে থাকা একটা বড় বোল্ডারের পিছনে পৌঁছে থামল ও। দম ফিরে পাবার জন্য অপেক্ষা করল একটু,

তারপর বোল্ডারের পাশ দিয়ে উঁকি দিল নীচে। পাহাড়ি ঢাল আর প্রান্তরে পাগলের মত নেচে বেড়াচ্ছে শত শত আলোকরশ্মি, সার্চ-পার্টির অবস্থান বোঝা যাচ্ছে পরিষ্কার। ওর কাছাকাছি নেই একটাও। আবছাভাবে একটা সরাইখানার কাঠামো দেখতে পেল দূরে, ওটার সামনে দিয়ে গেছে পায়ে হাঁটা পথ। সরাইখানার একশো গজ দক্ষিণে চওড়া রাস্তা—পোর্তো ভেচিয়োতে যেতে হয় ওটা দিয়ে। মশাল আর ফ্ল্যাশলাইটের ভিড় দেখে বোঝা গেল, রাস্তাটা অবরোধ করে রেখেছে কর্সিকানরা।

নরক-গুলজার চলছে পুরো এলাকা জুড়ে। রানার কানে ভেসে আসছে মানুষের উত্তেজিত চিৎকার, কুকুরের ডাক আর ঝোপঝাড়ের মাঝে মাচেটি চালানোর আওয়াজ। অদ্ভুত, ভীতিকর এক দৃশ্য—একটা দেহও দেখা যাচ্ছে না, অন্ধকারের মাঝে শুধু নেচে বেড়াচ্ছে আলোর রেখা, অদৃশ্য সুতোয় বেঁধে ওগুলো নিয়ে যেন খেলা করছে কেউ।

কিছুক্ষণ পর হঠাৎ নতুন এক আলো দেখা গেল বনভূমির মাঝে। সাদাটে নয়, হলুদ-কমলা। আগুন জ্বলে উঠেছে পোর্তো ভেচিয়োর রাস্তার একপাশে। ডাইভারশনের সূচনা করেছে কুয়াশা। চমৎকার ফলও মিলল। হৈ-হৈ করে কর্সিকানরা ছুটতে শুরু করল আগুনের দিকে।

নিজের জায়গা ছেড়ে নড়ল না রানা। বোঝার চেষ্টা করল, এই ডাইভারশনকে কীভাবে ব্যবহারের চেষ্টা করছে কুয়াশা। এরপর কী করবে সে? কীভাবে ফাঁদ পাতবে? তিন মিনিট পরেই পেয়ে গেল জবাব। বনের আরেক অংশে লাফ দিয়ে উঠল আগুনের শিখা—পোর্তো ভেচিয়োর রাস্তা থেকে সিকি মাইল বাঁয়ে। একটার জায়গায় দুটো ডাইভারশন সৃষ্টি হয়েছে এবার, বিভক্ত করে দিয়েছে কর্সিকানদেরকে। তল্লাশিতে ব্যাঘাত

ঘটেছে—আগুন নেভানোর দিকে এখন সবার মনোযোগ; পাহাড়ি অরণ্যে দাবানল শুরু হলে মহা-বিপদ!

আগুনের আভায় কর্সিকানদের দেখতে পাচ্ছে রানা, পাগলের মত ছোটাছুটি করছে তারা। আরেকটা আগুন লাফিয়ে উঠল—এবারেরটা আরও বড়, প্রথম দুটোর প্রায় চারশ' গজ দূরে। কুয়াশার তৃতীয় ডাইভারশন। আগুনের লেলিহান শিখার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছড়িয়ে পড়ল বিশৃঙ্খলা। কুয়াশা কোনও ঝুঁকি নিচ্ছে না। কাউকে যদি ফাঁদে ফেলতে না-ও পারে, গোলমালের সুযোগ নিয়ে সহজেই পালিয়ে যেতে পারবে।

বোল্ডারের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল রানা, হামাগুড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল ঢাল বেয়ে। মাটির সঙ্গে প্রায় মিশিয়ে রেখেছে শরীর, এগোচ্ছে সরীসৃপের মত। তীক্ষ্ণ করে রেখেছে নজর। হঠাৎ রাস্তা থেকে একশো গজ পশ্চিমে এক টুকরো আলো জ্বলে উঠল, দেশলাই জ্বেলেছে কেউ। এক সেকেণ্ড জ্বলল ওটা, তারপর নিভে গেল। রানা একা না, কর্সিকানদের মধ্যেও কয়েকজন দেখতে পেয়েছে ওটা। পর পর তিনটে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ঘুরে গেল ওদিকে। আলোর রশ্মির নাচানাচি দেখে বোঝা গেল, তিনজনেই ছুটতে শুরু করেছে ওদিকে। জানে না, কুয়াশার ফেলা টোপে সাড়া দিচ্ছে। ওদের একজনকে খুব শীঘ্রি আটক করবে দুর্ধর্ষ লোকটা।

জ্যাকেটে তলায় হোলস্টার থেকে নিজের সিগ-সাওয়ার বের করল রানা, উঠে দাঁড়িয়ে ছুটতে শুরু করল। আড়াআড়ি একটা পথ ধরে পাহাড়ি ঢাল বেয়ে নামছে কুয়াশার আনুমানিক অবস্থান লক্ষ্য করে। হয়তো সাহায্য দরকার নেই কুয়াশার, তবু যদি ধাওয়াকারীদের দু'জনকে ও ব্যস্ত রাখতে পারে, কুয়াশার প্ল্যান সফল হবে নিশ্চিতভাবে। বাড়তি একজনকে যদি আটক করা

যায়, তা হলে তো আরও ভাল। জেরা করার জন্য দু'জন সাবজেক্ট পারে ওরা।

ছোট ছোট একেকটা ছুট লাগাচ্ছে রানা। এক কাভার থেকে পৌঁছুচ্ছে আরেক কাভারে। প্রতি কদমে বাড়ছে সতর্কতা। নজর রাখছে ঢালের নীচে নড়তে থাকা ফ্ল্যাশলাইটগুলোর উপরে। হালকা আভায় দেখতে পাচ্ছে লোকগুলোর হাতে ধরা আগ্নেয়াস্ত্র, শিকারের ছায়া দেখলেও গুলি ছুঁড়তে প্রস্তুত।

হঠাৎ থেমে দাঁড়াল ও। একটা বৈসাদৃশ্য লক্ষ করেছে। একেবারে ডান দিকের ফ্ল্যাশলাইটটা... ওর থেকে মোটামুটি দুইশ' গজ নীচে ওটা... নড়ছে অদ্ভুতভাবে। নড়াচড়ার ছন্দ একেবারে বেমানান। সামনে-পিছনে নয়, ওটা নড়ছে উপর-নীচে! প্রতিফলনও নেই ওটার পাশে—যত সামান্যই হোক, ফ্ল্যাশলাইটের মালিকের অন্য হাতে ধরা আগ্নেয়াস্ত্রের ধাতব শরীরে একটু হলেও প্রতিফলন ঘটবে আলোর। প্রতিফলন নেই মানে অস্ত্রও নেই।

রহস্যটা ধরতে পেরে চমকে উঠল রানা। ফ্ল্যাশলাইটটা এ-মুহূর্তে হাতে নেই কারও, গাছের ডালে বেঁধে ডালটাই নড়িয়ে দেয়া হয়েছে! এ আরেক ডাইভারশন... ফ্ল্যাশলাইটের মালিক নিজের মুভমেন্ট লুকাতে চাইছে।

ঝট্ করে ঘাসের আড়ালে বসে পড়ল রানা। অতিমাত্রায় সজাগ হয়ে উঠেছে। লোকটা ওর আশপাশে থাকতে পারে। আশঙ্কাটা সত্যি হয়ে উঠল মিনিটখানেকের মধ্যেই। ঘাসের প্রাচীর ভেঙে বিশালদেহী এক কর্সিকানকে উদয় হতে দেখল ও কয়েক গজ দূরে। আরেকটু হলে রানার গা মাড়িয়ে দিত, গড়ান দিয়ে সরে গেল ও।

পায়ের শব্দ হালকা হয়ে এলে উঠে দাঁড়াল রানা। বুক ধক

ধক করছে। আন্দাজের উপর ভর করে পিছু নিল কর্সিকানের। পাহাড়ের উত্তরদিক লক্ষ্য করে ছুটছে লোকটা, রিজের তলায় পৌঁছুতে চাইছে—রানাও ওদিকেই যাচ্ছিল। অল্পক্ষণে বোঝা গেল, পুরো এলাকা হাতের তালুর মত চেনে ব্যাটা; অন্ধকারেও চিতার মত ছুটছে। দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছে রানার সঙ্গে। ছোটার গতি বাড়িয়ে দিল ও, কিছুতেই পিছিয়ে পড়া চলবে না। চোখের কোণে ফ্ল্যাশলাইটের আলো ঝিকমিকিয়ে উঠল, ঢাল বেয়ে উঠে আসছে একজন... নিঃসন্দেহে তাকেই টার্গেট করেছে কুয়াশা।

অনেকদূর উঠে আসার পর থেমে দাঁড়াল রানা। কর্সিকানকে দেখা যাচ্ছে না কোথাও, শোনা যাচ্ছে না পায়ের আওয়াজও। চারপাশ নিস্তব্ধ... বড্ড বেশি নীরব। মাটিতে শুয়ে পড়ল ও, অন্ধকারের ভিতর আঁতিপাঁতি করে ঘুরে বেড়াচ্ছে ওর দৃষ্টি, হাতের আঙুল চেপে বসেছে সিগ-সাওয়ারের ট্রিগারে। কিছু একটা ঘটতে চলেছে খুব শীঘ্রি। কিন্তু কোথায়? কীভাবে?

দেড়শো গজ সামনে, একটু নীচে, ফ্ল্যাশলাইটের আলো মিটমিট করতে শুরু করেছে। না... জ্বালানো-নেভানো হচ্ছে না, আলো বাধা পাচ্ছে গাছের গায়ে। ফ্ল্যাশলাইটের মালিক পাইন গাছের একটা ঝাড়ের দিকে এগিয়ে আসছে।

হঠাৎ লাফিয়ে উঠল আলোকরশ্মি—প্রথমে আকাশের দিকে উঠে পড়ল, তারপর আছড়ে পড়ল মাটিতে; একটু গড়িয়ে স্থির হয়ে গেল। বুঝতে পারল রানা, আঘাত হেনেছে কুয়াশা। কিন্তু ওর জানা নেই, আলোর এই সঙ্কেত দেখার জন্য আরেকজন কর্সিকান ঘাপটি মেরে আছে খুব কাছে।

আর শুয়ে থাকার মানে হয় না। উঠে ছুট লাগাল রানা আলোর উৎসের দিকে। পাহাড়ের পাথুরে ঢালে কর্কশ শব্দ তুলছে ওর জুতোর তলা, কিন্তু পরোয়া করল না। অনেকখানি জায়গা

পেরুতে হবে ওকে, এবং খুব দ্রুত। অন্ধকারে দৃষ্টি চলছে না, বোঝা যাচ্ছে না কোত্থেকে শুরু হয়েছে গাছের সারি। যদি একটু চেহারা দেখা যেত, যদি একটু আওয়াজ শোনা যেত... ভাবতে ভাবতে সচকিত হয়ে উঠল ও। আওয়াজ! চিৎকার করেই তো সতর্ক করে দেয়া যায় কুয়াশাকে। তাই করতে যাচ্ছিল, কিন্তু থমকে গেল অচেনা কণ্ঠস্বর শুনে।

ওই তো... ত্রিশ গজ নীচে, দুটো গাছের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে বিশালদেহী কর্সিকান। বাতাসে ভাসছে তার ভারী গলার আওয়াজ। মাটিতে পড়ে থাকা ফ্ল্যাশলাইটের আভায় চকচক করছে হাতে ধরা শটগান। ওদিকে ঘুরে গেল রানা, সিগ-সাওয়ার ধরা হাত প্রসারিত করছে সামনে।

'তুমি ফেনিসের লোক?' কুয়াশার গলা চিনতে পারল রানা।

জবাব না দিয়ে চেঁচাল কর্সিকান, 'পার নস্ত্রো সার্কোলো!'

বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে লোকটার পিঠে তিনবার ফায়ার করল রানা। কর্সিকানও শটগানের ট্রিগার চেপেছে, ডাবল ব্যারেলের ভয়াবহ বিস্ফোরণের তলায় চাপা পড়ে গেল ওর সিগ-সাওয়ারের আওয়াজ। পরমুহূর্তে হুড়মুড় করে মাটিতে পড়ে গেল বিশালদেহী, নিথর হয়ে গেল কেঁপে উঠে।

হামাগুড়ি দিয়ে পাইন ঝাড়ের দিকে এগোল রানা, কুয়াশার গুলি খেতে চায় না। কাছে গিয়ে ডাকল, 'কুয়াশা?'

'রানা, তুমি?' শোনা গেল পরিচিত কণ্ঠ।

'আপনার কোথাও লাগেনি তো?'

'উঁহুঁ, ব্যাটা তার বন্ধুকেই ঝাঁঝরা করে ফেলেছে।'

এগিয়ে গেল রানা। বিশালদেহীর কয়েক গজ সামনে চিৎ হয়ে পড়ে আছে অপর কর্সিকান, কুয়াশা সরে যাওয়ায় শটগানের শেল তার বুক ছিন্নভিন্ন করে ফেলেছে।

'আলোটা নেভান।' চাপা গলায় বলল রানা।

তাড়াতাড়ি ফ্ল্যাশলাইটটা তুলে নিয়ে সুইচ অফ করল কুয়াশা। বলল, 'এক্কেবারে সময়মত হাজির হয়েছ, ভাই।'

'শোধবোধ,' রানা বলল। 'এক্সেলসিয়র হোটেলের সিঁড়িতে আপনিও প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন আমার। থাক ওসব... নীচে আরেকজন রয়ে গেছে। দুই দোস্তের ডাক শোনার জন্য অপেক্ষা করছে সে। যদি না শোনে...'

'এখানে উঠে আসবে,' বলল কুয়াশা। 'তখন ওকে ঘায়েল করব আমরা।'

'এত সাহস দেখাবে বলে মনে হয় না,' মাথা নাড়ল রানা। 'সঙ্গী-সাথীদেরকে ডেকে আনার আগেই আমাদের সরে যাওয়া দরকার।'

'ওরা ব্যস্ত,' আগুনের দিকে ইশারা করল কুয়াশা। 'সহজে আসতে পারবে না।'

'তা-ও... ঝুঁকি নেবার কোনও মানে হয় না,' গাছের আড়াল থেকে উঁকি দিল রানা। নড়তে দেখল ফ্ল্যাশলাইটের আলোকরশ্মি। 'ওই তো, যাচ্ছে!'

'চলো,' পাইন ঝাড় থেকে বেরুনোর জন্য ঘুরল কুয়াশা। 'লুকানোর মত ডজনখানেক জায়গা চিনে নিয়েছি আমি। অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

'কিছু জানতে পেরেছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হ্যাঁ। একটু খোঁজখবর নিতেই...'

'আমার জন্য অপেক্ষা করবার কথা ছিল আপনার!' বাধা দিয়ে অনুযোগের সুরে বলল রানা।

'কোনও কাজ ছাড়া চুপচাপ বসে থাকলে সন্দেহ করত লোকে,' কৈফিয়ত দিল কুয়াশা। 'আফটার অল, এ-জায়গা তো

ট্যুরিস্ট স্পট নয়!'

'হুম! কী জানতে পেরেছেন?'

'পুরোপুরি নিশ্চিত নই, তবে ফেনিসের সঙ্গে যে এ-জায়গার সম্পর্ক এখনও আছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। নিজের চোখেই তো দেখতে পাচ্ছ, আমাকে খুন করার জন্য হন্যে হয়ে উঠেছে ওরা। আমার ধারণা...'

কথা শেষ হলো না কুয়াশার। তার আগেই আগ্নেয়াস্ত্র কক করার শব্দ শুনে জমে গেল।

'ফারমা!' চালের উপর থেকে চেঁচিয়ে উঠল একটা অস্থির কণ্ঠ।

একসঙ্গে অস্ত্র তুলল রানা-কুয়াশা, ঘুরে গেল শব্দের উৎসের দিকে।

'বাস্তা!' ধমকে উঠল কণ্ঠটা। তারসঙ্গে শোনা গেল চাপা গরগর... কুকুরের আওয়াজ। 'আমার হাতে এটা দুই ব্যারেলের রাইফেল, সেনিয়র,' স্থানীয় উচ্চারণে ইংরেজিতে বলে উঠল এবার কণ্ঠটা। মেয়ের গলা। 'একটু আগে যেটা ফায়ার হলো, সেটার মতই আরেকটা *লুপো।* তবে তোমাদের পায়ের কাছে যে-লোকটা পড়ে আছে, তারচেয়ে ভালভাবে এটা চালাতে জানি আমি। অস্ত্র নামাও, সেনিয়র। ফেলে দেয়ার দরকার নেই, ওগুলো তোমাদের কাজে আসবে।'

'কে তুমি?' জানতে চাইল রানা। চোখ পিটপিট করে দেখার চেষ্টা করল রহস্যময়ীকে। দেহের রেখা ছাড়া আর কিছু দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। বোঝা যাচ্ছে, ট্রাউজার আর ফিল্ড জ্যাকেট পরে আছে মেয়েটা। এক হাতে ধরে রেখেছে কুকুরের গলার শেকল।

ঘেউ ঘেউ করে উঠল প্রাণীটা।

'তোমাদের মধ্যে ইতিহাসবিদ কে?' পরিচয় না জানিয়ে বলল

মেয়েটা। 'তাকে খুঁজছি আমি।'

'কী!' রানা একটু বিভ্রান্ত বোধ করল।

'আমার কাভার!' ফিসফিস করে বলল কুয়াশা। তারপর গলা চড়িয়ে বলল, 'আমিই ইতিহাসবিদ... এ আমার সহকারী।' রানাকে দেখাল। 'কেন খুঁজছ আমাকে? খুন করতে?'

'না। পুরো এলাকায় তোমার কথা ছড়িয়ে পড়েছে। তুমি নাকি *পাদ্রোনিদের পাদ্রোনি*-এর ব্যাপারে প্রশ্ন করে বেড়াচ্ছ?'

'কাউন্ট গিলবার্তো বারেমি-র কথা বলছ? হ্যাঁ, তার ব্যাপারে খোঁজখবর নিচ্ছি আমি। কিন্তু কেউ আমার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে না।'

'একজন দেবে। বৃদ্ধা এক মহিলা... পাহাড়ের অনেক ভিতরে থাকেন। তোমাকে ডেকেছেন তিনি।'

'পরিস্থিতি কতটা খারাপ, তা জানো তো?' বলল কুয়াশা। 'আমাকে শিকার করতে বেরিয়েছে নীচের লোকজন, দেখামাত্র খুন করে ফেলবে। এর মাঝে ঝুঁকি নিয়ে ওই বৃদ্ধার কাছে নিয়ে যাবে আমাকে?'

'হ্যাঁ। তাড়াতাড়ি এসো, অনেকদূর যেতে হবে আমাদেরকে। রাস্তাও খুব খারাপ। পাঁচ-ছ'ঘণ্টা লেগে যাবে।'

'আগে আমার প্রশ্নের জবাব দাও। কেন জীবনের ঝুঁকি নিচ্ছ তুমি?'

'কারণ ওই বৃদ্ধা আমার দাদী। পাহাড়ের সবাই ওঁকে ঘৃণা করে, তাই নীচে থাকতে পারেন না। কিন্তু আমি তাঁকে ভালবাসি।'

'কে তিনি? কী তাঁর পরিচয়?'

'*ভিলা বারেমির রক্ষিতা...* এ-নামেই সবাই ডাকে তাঁকে,' বলল মেয়েটা। 'আর কোনও কথা নয়। এসো আমার সঙ্গে।'

চোদ্দ

পাহাড়ি পথ ধরে দ্রুত এগোল ওরা তিনজন, ধীরে ধীরে ঢুকে পড়ল অবারিত মাউন্টেইন রেঞ্জের ভিতরে। যত এগোচ্ছে, ততই দুর্গম হয়ে উঠছে পথ। পায়ের তলায় এবড়ো-খেবড়ো মাটি, সামনে ঘন জঙ্গল, উঁচু-নিচু রাস্তায় হাঁটতে জান বেরিয়ে যাবার জোগাড়। নকল পায়ে এ-অত্যাচার আর সহ্য হচ্ছে না কুয়াশার, ছড়ি ব্যবহার করতে হচ্ছে ওকে। চলার গতি কিছুটা কমে গেছে তাতে।

অন্ধকারে দিশে পাওয়া ভার, তবে কুকুরটা থাকায় নিশ্চিন্তে এগোতে পারছে ওরা। জ্বলজ্বল করছে প্রাণীটার চোখ, নির্বিঘ্নে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে। রওনা হবার আগে তাকে রানা-কুয়াশার গন্ধ শুঁকিয়ে নিয়েছে মেয়েটা, বুঝিয়ে দিয়েছে—দুই নবাগন্তু তাদের বন্ধু।

এই কুকুরটাকেই পাহাড়ি ঢালে দেখেছিল কি না, সন্দেহ হচ্ছে রানার। মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করল সে-কথা।

'হতে পারে,' জবাব এল। 'অনেকক্ষণ থেকেই ওখানে ঘুরছিলাম আমরা। ওকে ছেড়ে দিয়েছিলাম গন্ধ খোঁজার জন্য। তবে আমাকে ছেড়ে বেশিদূর কখনোই যায়নি ও।'

'আমাকে আক্রমণ করার সম্ভাবনা ছিল?'

'উঁহুঁ। মানে... যদি ওর গায়ে হাত তুলতে আর কী... বা

আমার গায়ে।'

মাঝরাত পেরিয়ে যাবার পর মোটামুটি সমতল একটা এলাকায় পৌঁছুল ওরা। কোমর পর্যন্ত ঘাস জন্মেছে ওখানে, বাতাসে দুলছে এদিক-ওদিক। সমভূমির ওপাশে আবার শুরু হয়েছে পাহাড়ের সারি, গায়ে ঘন অরণ্য। আকাশে মেঘের আনাগোনা কমে গেছে, নির্বিঘ্নে মুখ দেখাতে পারছে চাঁদ। কোমল আলোয় স্নান করিয়ে দিচ্ছে পর্বতমালাকে। মাথা ঘুরিয়ে কুয়াশার দিকে তাকাল রানা, ওর মতই দশা—ঘামে ভিজে গেছে শার্ট, হাঁপাচ্ছে। অথচ ঠাণ্ডা বাতাস বইছে সমভূমির উপর দিয়ে।

ওদের অবস্থা লক্ষ করে মেয়েটা বলল, 'এখন একটু বিশ্রাম নিতে পারি আমরা।' কয়েকশ' গজ দূরের একটা অন্ধকার জায়গার দিকে আঙুল তুলল, কুকুরটা ও-দিকে ছুটে গেছে। 'ওখানে একটা গুহা আছে। বেশি বড় না, তবে তিনজনের জায়গা হয়ে যাবে।'

'তোমার কুকুর তো মনে হচ্ছে আগেও গেছে ওখানে,' মন্তব্য করল কুয়াশা।

হাসল মেয়েটা। 'ও চাইছে আমি আগুন জ্বালি। বৃষ্টির সময় মুখে করে শুকনো ডাল নিয়ে আসে আমার কাছে। আগুন ওর ভারি পছন্দ!'

একটু পরেই জায়গামত পৌঁছে গেল ওরা। গুহাটা পাহাড়ি ঢালের গোড়ায়। গভীরতায় দশ ফুটের বেশি হবে না, উচ্চতায় ছ'ফুট। ভিতরে ঢুকল ওরা।

কুয়াশা লক্ষ করল, পুরনো অগ্নিকুণ্ডের আধপোড়া লাকড়ি এখনও পড়ে আছে ভিতরে। তাই জিজ্ঞেস করল, 'আগুন জ্বালব?'

'ইচ্ছে হলে জ্বালুন। *উচেলো* খুব খুশি হবে।'

'উচেলো!' ভুরু কোঁচকাল কুয়াশা। 'মানে, পাখি?'

'মাটির উপর দিয়ে পাখির মতই উড়ে বেড়ায় ও, সেনিয়র।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে আগুন জ্বালানোয় ব্যস্ত হয়ে পড়ল কুয়াশা।

রানা মেয়েটাকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি চমৎকার ইংরেজি বলো, কোথায় শিখেছ?'

'*ভেসকোভাতো*-র কনভেন্ট স্কুলে পড়েছি আমি,' জানাল মেয়েটা। 'আমার মত যারা গভর্নমেন্ট প্রোগ্রামে ঢুকতে চায়, তাদেরকে ওখান থেকে ইংরেজি আর ফ্রেঞ্চ শিখে নিতে হয়।'

ম্যাচের সাহায্যে আগুন জ্বেলে ফেলল কুয়াশা। ছোট অগ্নিকুণ্ড থেকে ছড়াতে শুরু করল তাপ, আলোকিত হয়ে উঠল গুহা। ঠাট্টা করে রানা বলল, 'আপনি আগুন লাগানোয় ওস্তাদ, রীতিমত প্রতিভাবান বলা যায়। পুরো জঙ্গলে যেভাবে আগুন লাগিয়ে দিলেন...'

'খুব সাধারণ প্রতিভা ওটা,' হাসল কুয়াশা।

টুপি খুলে ফেলেছে মেয়েটা, মাথা ঝাঁকিয়ে ছড়িয়ে পড়তে দিল ঘন কালো কেশ। ওর দিকে তাকাতেই রানার হৃৎপিণ্ড যেন একটা বিট মিস করল। মুহূর্তের জন্য মুগ্ধতায় স্থবির হয়ে গেল ও। তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে। বয়স বেশি নয়, বিশ থেকে পঁচিশের মধ্যে হবে। অপূর্ব কেশরাজি! বাদামি, আয়ত দুই চোখ যেন ডানা মেলছে আকাশে। নিখুঁত চোয়াল, নাকটা বুঝি পাথর কুঁদে বানিয়েছে কোনও ভাস্কর, তার নীচে ফোলা ফোলা দুই ঠোঁট হেসে উঠবে যে-কোনও মুহূর্তে। কোনও ধরনের সাজ নেয়নি, তারপরেও অপ্সরার মত লাগছে। জীবনে অনেক সুন্দরী দেখেছে রানা, কিন্তু আজ রাতে... কর্সিকার এই পাহাড়ি গুহার মাঝে এই মেয়েটিকে দেখে মনে হচ্ছে, এর নখেরও যোগ্য নয় কেউ। হয়তো পরিবেশের জন্য এমন অনুভূতি হচ্ছে, তবু ওর মনে হলো—লম্বা ছুটি নিয়ে বিধাতা বুঝি মাঝে-মধ্যে এমন নারীই সৃষ্টি

করেন!

'কী দেখছ?' হঠাৎ মেয়েটির প্রশ্নে সচকিত হয়ে উঠল রানা।

'কিছু না,' গলা খাঁকারি দিয়ে বলল ও। 'তুমি গভর্নমেন্ট প্রোগ্রামে ঢুকেছিলে?'

'যতদূর পারা যায় আর কী।'

'কতদূর সেটা?'

'বোনিফাসিয়ো-র *স্কুলা মিডিয়া*। বাকিটা অন্যদের সাহায্য নিয়ে সেরেছি। *ফোণ্ডেস*-রা পড়াশোনার খরচ দিয়েছে।'

'ঠিক বুঝলাম না।'

'ইউনিভার্সিটি অভ বোলোগনা-র গ্র্যাজুয়েট আমি, সেনিয়র। সেইসঙ্গে আমি একজন *কম্যুনিস্তা*... কথাটা আমি গর্ব নিয়ে বলি।'

'সাবাস!' বাঁকা সুরে বিদ্রূপ করল কুয়াশা।

'হাসবেন না, সেনিয়র,' একটু আহতস্বরে বলল মেয়েটা। 'কমিউনিজমের দিন এখনও শেষ হয়ে যায়নি। ওটাই দেশ চালানোর সঠিক পন্থা। দেখবেন, একদিন এই কমিউনিজমের সাহায্য নিয়েই ইটালিকে দাঁড় করাব আমরা। অরাজকতা আর অস্থিরতার অবসান ঘটবে, শেষ হবে খ্রিস্টানদের অনাচার।'

'বোকার রাজ্যে বাস করছ তুমি,' বলল রানা।

'না, সেনিয়র। যদি সতর্ক থাকি, তা হলে কেউ আমাদেরকে হাতের পুতুল বানাতে পারবে না। কমিউনিস্ট হিসেবেই স্বকীয়তা বজায় রাখতে পারব আমরা।'

'শুভকামনা রইল।'

পরিবেশটা গুমোট হয়ে উঠল এরপর। ঠাট্টায় সম্ভবত অপমানিত হয়েছে মেয়েটা, গুটিয়ে নিল নিজেকে। জানা গেল, তার নাম সোনিয়া। কুয়াশা জিজ্ঞেস করল, কেন ওর মত একজন রাজনীতি-সচেতন বিপ্লবী বোলোগনা ছেড়ে কর্সিকার পাহাড়ে

ফিরে এসেছে। সংক্ষেপে ও শুধু বলল, দাদীর সঙ্গে কিছুদিন কাটাবার জন্য।

'তোমার দাদী সম্পর্কে বলো,' অনুরোধ করল রানা।

'যা বলার, তা উনিই বলবেন তোমাদেরকে,' কাঠখোট্টা গলায় বলল সোনিয়া। উঠে দাঁড়াল। 'আমাকে যতটুকু জানাতে বলেছেন, তা বলেছি তোমাদেরকে।'

'তুমি শুধু বলেছ, ওঁর নাম *ভিলা বারেমির রক্ষিতা*।'

'এটুকুই বলার কথা আমার, নইলে ওই জঘন্য নাম কিছুতেই উচ্চারণ করতাম না। যাক গে, যথেষ্ট বিশ্রাম হয়েছে। ওঠো এবার। আরও প্রায় দু'ঘণ্টা হাঁটতে হবে আমাদেরকে।'

দু'ঘণ্টা নয়, সোয়া দু'ঘণ্টা পর পাহাড়ের উপরে এক সমতল মালভূমিতে উঠে এল ওরা। নীচের উপত্যকার মেঝে থেকে জায়গাটার উচ্চতা প্রায় সাড়ে চারশো ফুট। বেশ বড়, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে প্রায় এক একর জায়গা। চাঁদের আলো আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, তাতে আলোকিত হয়ে উঠেছে গোটা মালভূমি। পরিষ্কার দেখা গেল সব। ঠিক মাঝখানটায় মাথা তুলে রেখেছে একটা পুরনো আমলের ফার্মহাউস, পাশে গোলাঘর। চারদিকে শাক-সবজির খেত। জলপ্রবাহের কুলুকুলু ধ্বনি কানে এল, খুব কাছে কোথাও বইছে একটা ঝর্ণা।

'ভারি সুন্দর তো!' মুগ্ধ কণ্ঠে বলে উঠল কুয়াশা।

'গত পঞ্চাশ বছর থেকে এটাই দাদীর দুনিয়া,' গম্ভীর গলায় বলল সোনিয়া।

'এখানে জন্ম হয়েছে তোমার?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'এখানেই বড় হয়েছ?'

'না,' নেতিবাচক জবাব দিল মেয়েটা, ব্যাখ্যা করল না।

'এসো, দাদী অপেক্ষা করছে। দেখা করবে তোমরা ওঁর সঙ্গে।'

'এত রাতে?' কুয়াশা একটু অবাক হলো।

'দাদীর কাছে রাত-দিন বলে কিছু নেই। আমাকে বলেছেন, তোমরা পৌঁছুনোমাত্র ওঁর কাছে নিয়ে যেতে। চলো।'

ফার্মহাউসের সামনের কামরায়, ফায়ারপ্লেসের সামনে পিঠ-উঁচু চেয়ারে বসা বৃদ্ধাটির জন্য রাত-দিন বলে কিছু নেই কেন, তা বুঝতে কষ্ট হলো না। অন্ধ তিনি—মণি বলে কিছু অবশিষ্ট নেই চোখে, পুরোটাই ঘোলা কাঁচের মত এক বস্তু, উদ্দেশ্যহীনভাবে সারাক্ষণ ঘুরছে এদিক-ওদিক। তীক্ষ্ণ চেহারা, বয়স আন্দাজ করা কঠিন—নব্বুই হতে পারে... একশো, কিংবা তার বেশি হলেও অবাক হবার কিছু নেই। কালের ভারে জর্জরিত চামড়া, কেমন যেন কালচে ফুটকি পড়ে গেছে... তারপরেও আঁচ করা যায়, এককালে অপূর্ব রূপসী ছিলেন বৃদ্ধা। কথা বলেন খুব নিচু স্বরে—শুধু কান খাড়া করে রাখলে চলে না, তাকিয়ে থাকতে হয় ঠোঁটের দিকেও। উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো, কথাবার্তায় কোনও দ্বিধা বা জড়তা নেই। দুই আগন্তুক হাজির হওয়ামাত্র জানালেন, মৃত্যু তাঁর দুয়ারে কড়া নাড়ছে, চিরনিদ্রায় যাবার আগে অনেককিছু বলার আছে তাঁর। এই বাস্তবতা তাঁর চিন্তাচেতনাকে জাগিয়ে তুলেছে।

ইটালিয়ানে কথা বললেন বৃদ্ধা, তবে বাচনভঙ্গি অনেক পুরনো আমলের। শুরুতেই পরিচয় জানতে চাইলেন দুই আগন্তুকের। হিস্টোরিয়ানের কাভারটা ধরে রাখল কুয়াশা, মিলানের অ্যাকাডেমিক ফাউণ্ডেশনের কাহিনি শোনাল; বোঝাল, কর্সিকার ইতিহাস সম্পর্কে সংগঠনটা আগ্রহী। রানা নিজের পরিচয় দিল ওর সহকারী হিসেবে। ফেনিসের ফাইল স্টাডি করে এসেছে ও, কাউন্ট বারেমি সম্পর্কে বিভিন্ন রকম তথ্য জানিয়ে গবেষক

হিসেবে নিজেদের পরিচয় দৃঢ় করবার প্রয়াস চালাল।

চুপচাপ কিছুক্ষণ বসে রইলেন বৃদ্ধা, যেন দু'জনের বক্তব্য অন্তস্থ করে নিচ্ছেন। শেষে নড়ে উঠলেন তিনি, গালের উপর পড়ে থাকা একগোছা সাদা চুল সরালেন হাত দিয়ে। বললেন:

'তোমরা দু'জনেই মিছে কথা বলছ। দ্বিতীয়জন তো আমাকে বোকা বানাবার জন্য এমন সব হাস্যকর কথা বলছে, যা পোর্তো ভেচিয়োর বাচ্চারাও জানে।'

'পোর্তো ভেচিয়োতে হয়তো এসব জানা কথা,' মৃদু প্রতিবাদ করল রানা, 'কিন্তু মিলানে নয়।'

'বুঝেছি কী বলতে চাইছ। কিন্তু তোমরা কেউই মিলানের লোক নও।'

'সে-কথা অস্বীকার করছি না,' কুয়াশা বলল। 'আমরা ওখানে স্রেফ কাজ করি। আসলে আমরা বিদেশি, উচ্চারণ শুনে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন সেটা।'

'অত-শত বুঝতে পারছি না। শুধু এটুকু বুঝতে পারছি, তোমরা মিথ্যেবাদী। অবশ্য... কিছু এসে-যায় না তাতে, ভয়ের কিছু নেই তোমাদের।'

চকিতে দৃষ্টি বিনিময় করল রানা-কুয়াশা। আড়চোখে তাকাল সোনিয়ার দিকে। জানালার কাছে একটা তোষকের উপর বসে আছে মেয়েটা। পাশে গুটিসুটি মেরে আছে উচেলো।

'এসে-যায় না মানে!' বলল রানা। 'অবশ্যই এসে-যায়। আমরা চাই আপনি খোলামনে কথা বলুন। আমাদেরকে মিথ্যেবাদী ভাবলে নিশ্চয়ই সেটা করবেন না?'

'করব,' শান্তস্বরে বললেন বৃদ্ধা। 'কারণ স্বার্থান্বেষী মানুষের মত মিথ্যে বলছ না তোমরা। কথা শুনে বুঝতে পারছি, বিপজ্জনক লোক... কিন্তু লোভী নও। ব্যক্তিগত কোনও স্বার্থে আমার

পাদ্রোনি-র ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছ না। ঠিক বলেছি?'

অবাক হয়ে গেল রানা। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে জিজ্ঞেস করল, 'কীভাবে বুঝলেন?'

বৃদ্ধার শূন্য দৃষ্টি স্থির হলো ওর মুখের উপর, মনে হলো যেন দেখতে পাচ্ছেন ওকে। বললেন, 'তোমাদের গলার স্বর... বুঝতে পারছি, তোমরা বিচলিত। হয়তো বা ভয়ও পাচ্ছ।'

'ভয় পাবার কিছু আছে কি?' জানতে চাইল কুয়াশা।

'নির্ভর করছে তোমরা কী বিশ্বাস করো, তার ওপর।' বললেন বৃদ্ধা।

'আমাদের বিশ্বাস, ভয়ানক একটা কিছু ঘটছে তলে তলে। কী সেটা, কেন ঘটছে—তার কিছুই জানি না। ব্যস... আপাতত এটুকুই শুধু বলতে পারি আপনাকে।'

'কী জানো তোমরা, সেনিয়র?'

আরেকবার মুখ চাওয়াচাওয়ি করল রানা-কুয়াশা। সোনিয়া যে ওদের কথাবার্তা শুনছে, এ-ব্যাপারে সচেতন হয়ে উঠেছে। রানা বলল, 'জবাব দেবার আগে... আমার মনে হয় আপনার নাতনি এখানে না থাকলে ভাল হয়।'

'না!' সোনিয়া এত জোরে চেঁচিয়ে উঠল যে, কুকুরটা ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াল।

'আমার কথা শোনো,' নরম গলায় বলল রানা। 'পথ দেখিয়ে দুজন অচেনা মানুষকে দাদীর কাছে নিয়ে এসেছ... এর জন্য কেউ দোষ দিতে পারবে না তোমাকে। কিন্তু এখন যদি বসে থাকো এখানে, নিজেকে জড়িয়ে ফেলবে আমাদের সঙ্গে... পুরো ব্যাপারটার সঙ্গে। খুবই বিপজ্জনক হবে সেটা, বিশ্বাস করো! তোমার ভালর জন্যই বলছি কথাটা।'

'চলে যা, সোনিয়া,' সুর মেলালেন বৃদ্ধা। 'এদেরকে ভয়

পাবার কিছু নেই আমার, তুইও নিশ্চয়ই ক্লান্ত। উচেলো-কে নিয়ে গোলাঘরে চলে যা... বিশ্রাম নে।'

কয়েক মুহূর্ত ফোঁস্ ফোঁস করল সোনিয়া, তারপর উঠে দাঁড়াল। 'ঠিক আছে, যাচ্ছি আমি। তবে উচেলো এখানেই থাকবে।' কথাটা বলেই ঝট্ করে শটগান তাক করল দুই অতিথির দিকে। 'তোমাদের অস্ত্রগুলো বের করো, সেনিয়র। মেঝেতে ফেলে ছুঁড়ে দাও আমার কাছে। যতক্ষণ এখানে আছ, ওগুলো আমার জিম্মায় থাকবে।'

'তার কোনও দরকার আছে?' বিরক্ত গলায় বলল রানা, পরমুহূর্তে সিঁটিয়ে গেল। কুকুরটা হিংস্র ভঙ্গিতে গরগর করছে, ওর দিকে লাফ দিতে প্রস্তুত।

'থাক, দিয়েই দাও,' বলল কুয়াশা। 'এতে যদি শান্ত হয়!' নিজের পিস্তল বের করে মেঝেতে রাখল, পা দিয়ে ঠেলে পাঠিয়ে দিল সোনিয়ার কাছে। শ্রাগ করে রানাও একই কাজ করল।

হাঁটু গেড়ে সাবধানে অস্ত্রদুটো কুড়িয়ে নিল সোনিয়া, *লুপো*-র ব্যারেল নড়চড় করল না। বলল, 'আমি জেগে থাকব। তোমাদের কথা শেষ হলে দরজা খুলে আমাকে ডাক দিয়ো। আমি তখন উচেলোকে ডাকব। ও যদি না বেরোয়, তা হলে তোমাদের কপালে খারাবি আছে। তোমাদেরকে তোমাদের পিস্তল দিয়েই খুন করব আমি।'

দরজা খুলে বেরিয়ে গেল ও।

'বড্ড জেদি মেয়ে!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন বৃদ্ধা। 'গিলবার্তো বারেমির রক্ত! আরও কয়েক রকম রক্ত মিশে আছে শিরায়, কিন্তু ওটার প্রভাব যায় না কিছুতেই।'

'ও কাউন্ট বারেমির নাতনি?' ভুরু কোঁচকাল কুয়াশা।

'প্রপৌত্রী,' বললেন বৃদ্ধা। 'আমার নাতির মেয়ে। কিন্তু ওর

দাদার জন্ম হয়েছিল পাদ্রোনি এক কিশোরী রক্ষিতার সঙ্গে শুয়েছিলেন বলে।'

'ভিলা বারেমির রক্ষিতা...' রানা বলল। 'আপনি?'

হালকা একটা হাসি ফুটল বৃদ্ধার ঠোঁটে। হাত তুলে আবার চুল সরালেন গালের উপর থেকে। ক্ষণিকের জন্য মনে হলো অন্য কোনও জগতে হারিয়ে গেছেন। স্বপ্নালু কণ্ঠে বললেন, 'বহু... বহু বছর আগের কথা সেটা। সে-সময়ের কথা বলব তোমাদেরকে।' গলা খাঁকারি দিলেন। 'তবে তার আগে তোমাদের সত্যিকার পরিচয় জানতে চাই।'

চোখে চোখে কথা হলো রানা-কুয়াশার, বৃদ্ধার সঙ্গে লুকোচুরি করে লাভ নেই আর। তাতে নিজেদেরই ক্ষতি। সত্যি কথাই বলবে বলে ঠিক করল ওরা।

'আমার নাম মনসুর আলী... তবে কুয়াশা নামে সবাই চেনে আমাকে,' বলল কুয়াশা। 'আমি একজন বিজ্ঞানী এবং সত্যান্বেষী।'

'আর তুমি?' রানার দিকে মুখ ঘোরালেন বৃদ্ধা।

'আমি মাসুদ রানা,' রানা বলল। 'বাংলাদেশ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্সের এজেন্ট। সোজা কথায়... স্পাই। আমরা দু'জনেই বাঙালি।'

'তা-ই?' গম্ভীর হয়ে গেলেন বৃদ্ধা। 'আমি বুড়ো মানুষ, থাকিও একা; রেডিও-র খবর শোনা ছাড়া দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। কিন্তু এটুকু বুঝতে পারছি, কর্সিকায় আমার পাদ্রোনির খোঁজে দু'জন বাঙালির উপস্থিতি খুবই অস্বাভাবিক। তার ওপর তোমরা দু'জন দুই জগতের মানুষ!'

'হ্যাঁ, কথাটা সত্যি,' একমত হলো কুয়াশা।

'পরিস্থিতি আসলে এমনই গুরুতর যে, আমাদেরকে একাট্টা হতে হয়েছে,' যোগ করল রানা।

'সব খুলে বলো আমাকে,' হুকুম দিলেন যেন বৃদ্ধা।

চেয়ার টেনে তাঁর একটু কাছে গিয়ে বসল রানা। ফাইলে পড়া তথ্যগুলো স্মরণ করল। বলল, 'যদ্দূর জানা গেছে, উনিশশো ত্রিশ থেকে চল্লিশের মাঝামাঝি কোনও একটা সময়ে কাউণ্ট গিলবার্তো বারেমি তাঁর বিশ্বস্ত কিছু মানুষকে খবর দিয়ে ডেকে আনেন নিজের এস্টেটে। কারা সেই লোক, বা কোত্থেকে তারা এসেছিল, তা জানা যায়নি। তবে নিজেদের একটা নাম দেয় ওরা...'

'তারিখটা ছিল চৌঠা এপ্রিল, উনিশশো ছত্রিশ,' বাধা দিয়ে বললেন বৃদ্ধা। 'নিজেরা নাম দেয়নি, আমার পাদ্রোনি-ই ঠিক করে দিয়েছিলেন সেটা—*কাউন্সিল অভ ফেনিস*... ফিনিক্সের কাউন্সিল। যা হোক, বলে যাও।'

'আপনি ছিলেন ওখানে?'

'আগে তোমার কথা শেষ করো।'

ক্ষণিকের জন্য সংবিৎ হারাল রানা—এমন একটা ঘটনা নিয়ে কথা বলছিল, যেটা বহু বছর থেকে আলোচনা আর কল্পনার বিষয়বস্তু হয়ে আছে। কোনও রেকর্ড নেই এর, নেই সাক্ষী বা তথ্য-প্রমাণ। অথচ এই বৃদ্ধা চোখের পলকে নির্দিষ্ট সাল-তারিখ বলে দিলেন!

'সেনিয়র?'

'দুঃখিত,' তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিল রানা। 'তো যা বলছিলাম, পরবর্তী প্রায় দুই দশক ধরে কাউন্ট বারেমি এবং তাঁর কাউন্সিল বিতর্কের বিষয়বস্তু হয়ে থেকেছে...'

সহজ ভাষায় ফেনিস সম্পর্কে যা যা জানে খুলে বলল ও। এ-ও জানাল, বিশেষজ্ঞরা সংঘটাকে স্রেফ মিথ্ বলে আখ্যা দিয়েছেন।

'তুমি কী বিশ্বাস করো, সেনিয়র?' ওর কথা শেষ হলে

বললেন বৃদ্ধা। 'এ-প্রশ্নটা শুরুতেই তোমাদেরকে করেছি আমি।'

'কী বিশ্বাস করব, জানি না,' বলল রানা। 'তবে চারদিন আগে আমার খুব প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় একজন মানুষের প্রাণনাশ করবার চেষ্টা চালানো হয়েছে। এখনও তিনি মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন। ফেনিস সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছিলেন তিনি, সম্ভবত ওটাই তাঁর অপরাধ।'

'মাত্র চারদিন আগে?' বললেন বৃদ্ধা। 'কিন্তু তুমি তো বলছিলে ওরা মাত্র বিশ বছর সক্রিয় ছিল। এরপর কী ঘটেছিল? মাঝে তো অনেকগুলো বছর পেরিয়ে গেছে।'

'আমরা যদ্দূর জানি... আর যদ্দূর আন্দাজ করতে পারি, তা হলো—কাউন্ট বারেমির মৃত্যুর পর কর্সিকা থেকে ছড়িয়ে পড়ে ফেনিস। বার্লিন, লণ্ডন, প্যারিস, নিউ ইয়র্ক-সহ দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গা থেকে কাজ চালিয়ে যায় ওরা। তবে পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি থেকে থিতিয়ে আসে ওদের কর্মকাণ্ড, ষাটের দশক যখন শুরু হলো, তখন থেকে আর চিহ্ন পাওয়া যায়নি ওদের।'

অদ্ভুত ভঙ্গিতে ঠোঁট বেঁকে গেল বৃদ্ধার। 'বলতে চাইছ, এতদিন পর আবার বাতাস থেকে উদয় হয়েছে ওরা?'

'ব্যাপারটা সে-রকমই দেখাচ্ছে,' বলল রানা। 'আমার সঙ্গী ওটা ভালমত ব্যাখ্যা করতে পারবে।'

কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল কুয়াশা। বলল, 'গত কিছুদিনে আমেরিকা এবং রাশায় দু'জন গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব খুন হয়েছেন। দু'জনেই ছিলেন শান্তিকামী; অরাজকতা এবং অস্থিরতার ঘোর বিরোধী। একটা খুনের বিষয়ে খোঁজখবর নিয়েছি আমি, তাতে জানতে পেরেছি—ফেনিসের সদস্য হতে রাজি না হওয়ায়... ফেনিসের ব্যাপারে মুখ খোলার চেষ্টা করায় খুন করা হয়েছে ওই দু'জনকে। যে-লোক আমাকে এই তথ্য দিয়েছে, সে খুবই

বিশ্বাসযোগ্য। অপরাধ-জগতের খোঁজখবর তার চাইতে বেশি আর কেউ জানে না...'

'ঠিক কী বলেছে সে তোমাকে?' জিজ্ঞেস করলেন বৃদ্ধা।

'বলেছে যে, ফেনিসের কাউন্সিল আজও টিকে আছে। ধ্বংস হয়নি ওরা, আণ্ডারগ্রাউণ্ডে চলে গিয়েছিল বহু বছরের জন্য। সেখান থেকে ধীরে ধীরে প্রসারিত করেছে নিজেদেরকে, সারা দুনিয়ার ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুগুলোতে নিজস্ব চর ঢুকিয়েছে। ওর মতে গত কয়েক বছরে যত ধরনের সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটেছে, সবকিছুর পিছনে মদদ ছিল ফেনিসের। ওরা নাকি এখন আর টাকার বিনিময়ে মানুষ খুন করছে না, করছে নিজেদের ইচ্ছা অনুসারে... নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য।'

'কী সেই লক্ষ্য?'

'জানে না ও। শুধু জানে, দুষ্ট এক ক্ষতের মত সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে ফেনিস। কিন্তু কীভাবে তাকে দমন করা যাবে, কার কাছে গেলে তথ্য পাওয়া যাবে... এসবের কিছুই বলতে পারেনি আমাকে। যদ্দূর বুঝতে পেরেছি, ফেনিসের সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা কখনও মুখ খোলার সুযোগ পায় না।'

'তারমানে কাজে লাগার মত কিছুই তোমাকে বলেনি সে?'

'স্রেফ একটা ধারণা... কর্সিকায় আসতে বলেছে আমাকে। এখানে নাকি জবাব পাওয়া যেতে পারে। ওর কথা বিশ্বাস করেছি আমি... এই যে, আমার বন্ধু রানাকে নিয়ে এসেছি ব্যাপারটা যাচাই করতে।'

'তোমার বন্ধু কেন এসেছে, তা তো জেনেছি। ওর শ্রদ্ধেয় এক মানুষের উপর হামলা চালানো হয়েছে। কিন্তু তুমি এসেছ কেন?'

'একই কারণ, ম্যা'ম। রাশায় যিনি খুন হয়েছেন, তাঁকে আমি

খুব শ্রদ্ধা করতাম।'

নীরবতা নেমে এল কামরায়। কী যেন ভাবলেন বৃদ্ধা, তারপর ফিসফিসিয়ে বললেন, 'পাদ্রোনি ফিরে এসেছেন!'

'ব্যাখ্যা করুন কথাটা,' বলল কুয়াশা। 'আমরা তো কিছুই রাখঢাক করিনি আপনার কাছে।'

'তোমাকে যে-লোক এতসব কথা বলেছে, সে কি বেঁচে আছে?' জিজ্ঞেস করলেন বৃদ্ধা। মনে হলো জবাবটা জানা আছে তাঁর।

'না,' বিস্মিত গলায় বলল কুয়াশা। 'আমার সঙ্গে কথা শেষ হবার আগেই খুন করা হয় ওকে। আমি কোনোরকমে পালিয়ে বেঁচেছি।'

'ওকে কি আতঙ্কিত মনে হয়েছে তোমার কাছে?'

'হ্যাঁ... কিন্তু এসব প্রশ্ন কেন?'

'আমার পাদ্রোনি ওর মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিলেন।'

'মাফ করবেন, তবে ওই লোক কাউন্ট বারেমিকে চিনত বলে মনে হয় না।'

'পাদ্রোনিকে না চিনুক, তাঁর শিষ্যদেরকে তো চিনত! ওটাই যথেষ্ট। শিষ্যদের মাঝেই বেঁচে আছেন তিনি। ওদের জন্য তিনি ছিলেন যিশু... আর যিশুর মত শিষ্যদের জন্য তিনিও জীবন দিয়েছিলেন।'

'আপনার পাদ্রোনিকে ঈশ্বর ভাবত ওরা?' চমকে উঠল রানা।

'ঈশ্বর... নবী... স-অ-ব! অন্ধ বিশ্বাস ছিল ওদের।' জানালেন বৃদ্ধা।

'কীসের বিশ্বাস?'

'এ-ই যে, একদিন ওরা পৃথিবীর মালিক হবে। প্রতিশোধ নেবে আমার পাদ্রোনির হয়ে!'

পনেরো

চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিলেন বৃদ্ধা, তাঁর দৃষ্টিহীন চোখদুটো সেঁটে রইল ছাতের দিকে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে নিচুকণ্ঠে নিজের কাহিনি বলতে শুরু করলেন তিনি।

'বোনাফাসিয়ো-র এক কনভেণ্টে আমার সন্ধান পান পাদ্রোনি, টাকা দিয়ে ওখান থেকে কিনে নেন আমাকে। কনভেণ্টের মাদার সুপ্রিম আপত্তি করেননি, তাঁর মনে স্থির বিশ্বাস জন্মেছিল— ধর্মকর্ম হবে না কোনোদিন আমাকে দিয়ে, নান হবার তো প্রশ্নই ওঠে না। দুরন্ত স্বভাবের মেয়ে ছিলাম আমি, লেখাপড়া করতাম না মোটেই, কথা শুনতাম না কারও। কনভেণ্টে আয়না ছিল না, তারপরেও রাতের বেলা বসে যেতাম জানালার কাঁচের সামনে, ওতেই চেহারার প্রতিফলন দেখে সাজগোজ করবার চেষ্টা চালাতাম। আমার পাল্লায় পড়ে অন্য মেয়েরাও বখে যাচ্ছিল, তাই পাদ্রোনির হাতে আমাকে তুলে দিয়ে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিলেন মাদার সুপ্রিম।

'বয়স আমার খুব বেশি না তখন, মাত্র পনেরো বছর। কনভেণ্ট থেকে মুক্তি পেয়ে নতুন এক দুনিয়ায় প্রবেশ করলাম। রূপায় বাঁধানো চাকা, আর তেজি চার ঘোড়ায় টানা এক ক্যারিজে করে আমাকে নিয়ে আসা হলো পাহাড়ে ঘেরা অপূর্ব সুন্দর এই

জায়গায়। স্বাধীনতা আর সুখ কাকে বলে, তা টের পেলাম তখনই। গাঁয়ের যে-কোনও জায়গায় যেতে পারতাম আমি, দোকানে ঢুকে যা-খুশি-তাই কিনতে পারতাম; কোনও বাধা-নিষেধ ছিল না। কনভেন্টে তো নয়ই, বাবা-মা'র কাছেও এমন স্বাধীনতা পাইনি কোনোদিন। গরীব কৃষক ছিলেন আমার বাবা, মা ছিলেন ধর্মভীরু এক গৃহিণী—মেয়েকে সারাদিন ঘরে বন্দি করে রাখতেন। ঘরে খাবার জুটত না, তাই আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন কনভেন্টে। এরপর আর কোনোদিন তাঁদেরকে দেখিনি আমি।

'যা-হোক, পাদ্রোনি সবসময় আমার সঙ্গে থাকতেন... আগলে রাখতেন আমাকে। যেন তিনি এক সিংহ, আর আমি তাঁর সিংহছানা। আমাকে নিয়ে পুরো এলাকায় ঘুরে বেড়াতেন তিনি, নিজের সাম্রাজ্য চেনাতেন, নিয়ে যেতেন বনেদি ঘরগুলোয়। সবার কাছে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিতেন নিজের বান্ধবী হিসেবে—কথাটা বলার সময় হাসিতে ভরে উঠত তাঁর মুখ। বিপত্নীক ছিলেন তিনি, বয়স চলছিল সত্তর। কিন্তু তারপরেও তাঁর যৌবন যে অটুট আছে, এটাই বুঝি বোঝাতে চাইতেন সবাইকে... এমনকী নিজের দুই ছেলেকেও। হাজার হোক, অল্পবয়েসী একটা মেয়েকে শয্যাসঙ্গিনী বানানোর ক্ষমতা তো সব বুড়ো মানুষের থাকে না!

'আমার জন্য শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছিল ভিলাতে। উচ্চবংশের রীতিনীতি-চালচলন, সঙ্গীত, অঙ্কশাস্ত্র, ইতিহাস, ফরাসি ভাষা... সোজা কথায় বনেদি পরিবারের মেয়েদের যা যা শেখা দরকার, তার সবই শেখানো হয়েছিল আমাকে। চমৎকার এক সময় ছিল সেটা। মাঝে মাঝে সমুদ্রযাত্রায় যেতাম আমরা—রোম থেকে জাহাজে চাপতাম; প্রথমে যেতাম

সুইটজারল্যাণ্ডে, তারপর যেতাম ফ্রান্সে.... প্যারিসে। ওই দু'দেশেই আমার পাদ্রোনির সহায়-সম্পত্তি আর ব্যবসা ছিল, তাঁর দুই ছেলে দেখাশোনা করত ওসবের। মাসছয়েক পর পর গিয়ে সবকিছুর হিসেব নিতেন পাদ্রোনি।

'টানা তিনটে বছর দুনিয়ার সবচেয়ে সুখী মেয়ে ছিলাম আমি... আমার পাদ্রোনির দয়ায়। কিন্তু এরপরেই সেই সুখের পৃথিবী তছনছ হয়ে গেল। মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে ধ্বংস হয়ে গেল সবকিছু, আর কাউন্ট গিলবার্তো বারেমি পাগল হয়ে গেলেন।

'খবর জানানোর জন্য প্যারিস আর জুরিখ থেকে লোক এল... এল এমনকী লণ্ডনের বিখ্যাত বিজনেস এক্সচেঞ্জ থেকেও। ওরা বলল, গত চার মাসে পাদ্রোনির ছেলেরা বোকার মত বেশ কিছু কাজ করেছে, পরিচয় দিয়েছে চরম অদূরদর্শিতার। সবচেয়ে ভয়ানক ব্যাপার হলো—অসৎ কিছু চুক্তি করেছে তারা; এমন সব লোকজনকে টাকা দিয়েছে, যারা প্রচলিত আইন আর ব্যবসায়িক জগৎকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অন্যায় কাজ করে বেড়ায়। এর ফলে ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড আর সুইটজারল্যাণ্ড সরকার তাদের সমস্ত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিয়েছে, আটক করে দিয়েছে ব্যাঙ্কে জমিয়ে রাখা সমস্ত টাকা-পয়সাও। সোজা কথায়... জেনোয়া আর রোমে গচ্ছিত কিছু টাকা ছাড়া কাউন্ট বারেমি নিঃস্ব হয়ে গেছেন।

'টেলিগ্রাম করে দুই ছেলেকে পোর্তো ভেচিয়োয় ডেকে পাঠালেন পাদ্রোনি, তাদের মুখ থেকে সবকিছু শুনবেন। কিন্তু তার জবাবে যে-সংবাদ এল, তাতে যেন বাজ পড়ল তাঁর মাথায়... স্বাভাবিক হতে পারলেন না আর কোনোদিন।

'প্যারিস আর লণ্ডন থেকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানাল, তাঁর দুই ছেলেই মারা গেছে—একজন আত্মহত্যা করেছে; অন্যজনকে গুলি

করে হত্যা করেছে এমন এক লোক, যে পাদ্রোনির ছোট ছেলের কারণে সর্বস্ব হারিয়েছে। এরপরে আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না আমার পাদ্রোনির, তাঁর সাজানো-গোছানো জগৎ চুরমার হয়ে গেল চারপাশে। ভিলার লাইব্রেরিতে ঢুকে নিজেকে বন্দি করে ফেললেন তিনি, দরজা খুলে খাবার নেবার সময় ছাড়া দেখা পাওয়া যেত না তাঁর... কারও সঙ্গে কথাও বলতেন না। আমার সঙ্গে শোয়াও বন্ধ করে দিলেন, জানালেন—নারীদেহের প্রতি সমস্ত আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। ধীরে ধীরে নিজেকে ধ্বংস করে দিতে লাগলেন পাদ্রোনি... এ এক ধরনের আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছুই না।

'তারপর... একদিন... প্যারিস থেকে এল এক সাংবাদিক। প্রায় জোর করেই পাদ্রোনির সঙ্গে দেখা করল সে, কী নাকি জরুরি কথা আছে। অদ্ভুত এক গল্প শোনাল লোকটা... বারেমির ব্যবসায়িক সাম্রাজ্যের পতন সম্পর্কে রিপোর্ট করতে গিয়ে নাকি জানতে পেরেছে ওসব। সেই গল্প শোনার আগে পাদ্রোনি হয়তো আধ-পাগল ছিলেন, কিন্তু এরপরে পুরোপুরিই উন্মাদ হয়ে গেলেন।

'সাংবাদিক জানাল, বারেমির পতন আসলে এক ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্রের ফসল... সরকারের সঙ্গে মিলে ব্যবসায়ীরা নাকি ঘটিয়েছে ওসব। কূটকৌশল খাটিয়ে পাদ্রোনির দুই ছেলেকে দিয়ে অন্যায় সব চুক্তিতে সই করানো হয়েছে, ব্ল্যাকমেইল করে তাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। শেষ পর্যন্ত খুন করা হয়েছে ওদেরকে; সরকারিভাবে মৃত্যুর যে-ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে, তা সাজানো কাহিনি ছাড়া আর কিছু নয়।

'এসব শুনে থমকে গেলেন পাদ্রোনি। কথাগুলো বিশ্বাসের অতীত। কেন করা হবে এসব? তাঁকে পথে বসানো হয়েছে ভাল কথা... কিন্তু কেন তাঁকে নিঃসন্তান বানাল ওরা?

'জবাবে একটা শোনা কথা বলল সাংবাদিক: *গোটা ইয়োরোপের জন্য একজন পাগলা কর্সিকান-ই যথেষ্ট! তার উত্তরাধিকারীর প্রয়োজন নেই।* আর কোনও ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলো না, সব বুঝে নিলেন পাদ্রোনি।

'ইংল্যাণ্ডে রাজা এডওয়ার্ড মারা গেছেন বটে, কিন্তু মরার আগে ফরাসি আর ইংরেজদের মাঝে একগাদা ব্যবসায়িক চুক্তি করে গেছেন। এর ফলে বড় বড় কোম্পানিগুলো একত্র হতে পারবে, একচেটিয়াভাবে ফায়দা লুটতে পারবে ভারত, আফ্রিকা আর সুয়েজ থেকে। কিন্তু আমার পাদ্রোনি ছিলেন কর্সিকান, ইংরেজ আর ফরাসিদের কাছ থেকে ব্যবসা ছিনিয়ে নেয়া ছিল তাঁর অভ্যেস। নিজের কোম্পানি কিছুতেই ওদের সঙ্গে যুক্ত করবার প্রস্তাবে রাজি হননি, বরং ছেলেদেরকে নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন, ওই দুই জাতের প্রতিদ্বন্দ্বীদেরকে যে-কোনও মূল্যে দমিয়ে রাখতে হবে। এডওয়ার্ডের চুক্তিগুলো তাই কোনও কাজে আসছিল না, একচেটিয়া ব্যবসা করতে পারছিল না ইংরেজ আর ফরাসিরা, ক্রমাগত ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছিল।

'আমার পাদ্রোনির জন্য পুরোটাই ছিল এক খেলা, কিন্তু ফরাসি আর ইংরেজদের চোখে তাঁর ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড ছিল অক্ষমণীয় অপরাধ; এর জবাব ওরা দিয়েছিল আরও বড় অপরাধ করে। বাধা দেবার কেউ ছিল না, শাস্তি দেবার কেউ ছিল না... দু'দেশের সরকারই ছিল ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণে। যার কাছে টাকা থাকে, তার পায়ের তলায় গড়াগড়ি খায় আইন-আদালত, পুলিশ আর রাজনীতিক থেকে শুরু করে রাজা-বাদশা পর্যন্ত। এই কঠিন সত্যটাই উন্মাদনার জন্ম দিয়েছিল পাদ্রোনির মধ্যে। সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, ধ্বংস করে দেবেন দুর্নীতিবাজদেরকে—বিভিন্ন দেশের সরকারকে ফেলবেন চরম অরাজক পরিস্থিতির মাঝে,

যাতে রাজনৈতিক নেতারা দিশে হারিয়ে ফেলে। তাঁর চোখে ওরাই ছিল আসল অপরাধী... ওদের সাহায্য না পেলে কিছুই করতে পারত না ব্যবসায়ীরা, পাদ্রোনির ছেলেরা বেঁচে থাকত। প্রতিশোধ নেবার একটাই উপায়, সরকারকে বিপদে ফেলে দেয়া, যাতে ব্যবসায়ীরা তাদের রক্ষাকবচ হারায়।

"“পাগলা কর্সিকান দেখতে চায় ওরা?” চেঁচিয়ে উঠেছিলেন পাদ্রোনি। “বেশ, তা-ই দেখাব আমি ওদেরকে!”

'শেষবারের মত একবার রোমে গেলাম আমরা—সেবার আর ধনী জমিদারের মত রূপায় মোড়া ক্যারিজে চেপে, কিংবা একগাদা চাকরবাকর নিয়ে নয়, বরং খুব সাধারণ সাজে... শুধু আমরা দু'জন। উঠলামও *ভিয়া দ্যু মাচেলি*-র সস্তা বোর্ডিং হাউসে। *বোর্সা ভ্যালোরি*-তে কয়েকদিন আসা-যাওয়া করলেন পাদ্রোনি; পড়াশোনা করলেন বিখ্যাত বিভিন্ন পরিবারের ইতিহাস নিয়ে, যারা নানা কারণে ধ্বংস হয়ে গেছে।

'কর্সিকায় ফিরে পাঁচটা চিঠি লিখলেন তিনি—পাঁচ দেশের পাঁচজন বিখ্যাত পরিবারের মানুষকে, আমন্ত্রণ জানালেন গোপনে ভিলা বারেমিতে আসবার জন্য। এতে নাকি উপকৃত হবে তারা... তাদের পরিবারের প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছে, তার সুবিচার মিলবে। বলা বাহুল্য, একদা-মহান গিলবার্তো বারেমির নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করল না কেউ। এমনিতেই পাদ্রোনির ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন এই পাঁচজন মানুষ, পাল্টা চিঠি পাঠিয়ে জানালেন—যথাসময়ে হাজির হবেন তাঁরা।

'অতিথিদের আগমন উপলক্ষ্যে বিশাল আয়োজন করা হলো, ভিলা বারেমিকে সাজানো হলো সুন্দর করে। নতুন রঙ চড়ানো হলো বাড়ির ভিতর-বাইরের প্রতিটা দেয়ালে, বাগানগুলোতে ফোটানো হলো রঙ-বেরঙের ফুল, ঘাস ছাঁটা হলো আঙিনার,

আলোকসজ্জা করা হলো। আস্তাবলের সব ঘোড়ার পরিচর্যা করা হলো, তেল মাখিয়ে চকচকে করে তোলা হলো ওগুলোর শরীর। চাকর-বাকরদের দেয়া হলো নতুন পোশাক, বাড়ির মেঝে করে তোলা হলো আয়নার মত চকচকে। ভিলাকে এমন সুন্দর সাজে সাজতে দেখিনি আমি কখনও, প্রথম দর্শনে স্বপ্নপুরীর মত লাগবে যে-কারও। পাদ্রোনি-ও মনে হলো বদলে গেছেন—ছোটাছুটি করছেন সবখানে, প্রতিটা জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন নিজে, ভুল-ত্রুটি হলে শুধরে দিচ্ছেন নিজের হাতে। প্রাণশক্তি যেন ফিরে এসেছে তাঁর মাঝে, কিন্তু আগের মত নয়। কেন যেন খুব রুক্ষ আর নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছেন। কেউ ভুল করলেই তাকে চাবুকপেটা করতে দ্বিধা করছেন না।

'"ওদেরকে মনে করিয়ে দেয়া দরকার অতীত," নিজের আচরণের ব্যাখ্যা দিলেন তিনি আমার কাছে। "সবাই ভুলে গেছে ভিলা বারেমির স্বর্ণযুগের কথা।"

'আমার সঙ্গে আবার শুতে শুরু করলেন পাদ্রোনি, কিন্তু তাতে হৃদয়ের ছোঁয়া রইল না। আমার সঙ্গে শুধু পৌরুষের প্রদর্শনী করেন... জোর খাটান... ভালবাসেন না আগের মত।

'এসব দেখে আশু-ঘটনার আঁচ পাওয়া উচিত ছিল আমাদের... মানে, বাড়ির সবার। তা হলে হয়তো এড়াতে পারতাম বিপদ। এই আমি... পাদ্রোনিকে ভালবাসতাম পিতা আর প্রেমিকের মত... তবুও হয়তো ছুরি বসিয়ে দিতাম তাঁর বুকে।

'যা হোক, ভয়াল সেই দিন এল—এপ্রিলের চার তারিখ, উনিশশো ছত্রিশ। বিদেশ থেকে জাহাজ এসে পৌঁছুনোর খবর পেলাম আমরা। ঘোড়ায় টানা ক্যারিজ পাঠিয়ে দেয়া হলো সম্মানিত অতিথিদেরকে নিয়ে আসবার জন্য। কী এক দিন সেটা... নববধূর মত সেজেছে ভিলা বারেমি; বাগানে বাজছে

মিষ্টি-মধুর সঙ্গীত; বড় বড় টেবিল বসানো হয়েছে, তাতে নানা রকম খাবার-দাবার আর পাদ্রোনির সেলার থেকে আনা ইয়োরোপের সেরা মদ!

'অতিথিদের প্রত্যেককে আলাদা কামরা দেয়া হলো—প্রতিটার সঙ্গে ব্যালকনি আছে। সেখান বসে পাহাড়ি এলাকার অপূর্ব দৃশ্য উপভোগ করা যায়। একজন করে সঙ্গিনীও পেলেন তাঁরা—সারা কর্সিকা দ্বীপ তন্নতন্ন করে খুঁজে বের করা সুন্দরী পাঁচজন কুমারী যুবতী... অতিথিদের মনোরঞ্জন করবে তারা।

'রাত এলে ভিলার বিশাল হলঘরে নৈশভোজের আয়োজন করা হলো, এমন ভোজ আর কখনও হয়নি ভিলা বারেমির ইতিহাসে। খাওয়াদাওয়া শেষ হলে ভৃত্যরা ব্র্যাণ্ডি পরিবেশন করল, তারপর ওদেরকে রান্নাঘরে পাঠিয়ে দিলেন পাদ্রোনি। বলে দিলেন, ডাক না পেলে সেখান থেকে যেন বের না হয় কেউ। সঙ্গীতশিল্পীদেরকেও পাঠিয়ে দেয়া হলো বাগানে, সেখানে বসে গান-বাজনা করবে তারা। আমাদেরকে... মানে, মেয়েদেরকে বলা হলো ওপরতলায় যার যার মনিবের কামরায় গিয়ে অপেক্ষা করতে।

'মদ খেয়ে চুর হয়ে আছি আমরা মেয়েরা, কিন্তু বাকিদের সঙ্গে পার্থক্য আছে আমার। পাদ্রোনির *বান্ধবী* আমি, জানি বড় কোনও ঘটনা ঘটতে চলেছে। তিনি আমার পিতা... আমার প্রেমিক... ইচ্ছে হলো অংশীদার হই সেই বিশাল ঘটনার। তা ছাড়া গত তিন বছরে শিক্ষা-দীক্ষা পেয়ে কিছুটা জাতে উঠে গেছি, পাহাড়ি মেয়েদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে মজা পাই না। তাই বাকিরা চলে গেলেও আমি গেলাম না। দোতলা পর্যন্ত গিয়ে আবার চুপিসারে ফিরে এলাম; হলঘরের উপরে, ঝুলবারান্দার রেলিঙের আড়ালে লুকিয়ে দেখতে শুরু করলাম কী ঘটে।

'লম্বা এক ভাষণ দিতে শুনলাম আমার পাদ্রোনিকে, সব কথার মর্মার্থ বুঝলাম না, তবে এটুকু বুঝলাম—অন্তরের গহীন থেকে দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে প্রতিটা বাক্য উচ্চারণ করছেন তিনি, শ্রোতাদের মগজের গভীরে গেঁথে দিচ্ছেন নিজের বক্তব্য... প্রতিটা নির্দেশ। একেক সময় মনে হচ্ছিল, ঘোরের মধ্যে আছেন তিনি, গলার স্বর গমগম করছিল পুরো হলঘর জুড়ে।

'অতীতের কথা বললেন তিনি—মহান সেসব মানুষের কথা... যারা ঈশ্বরের কৃপা আর নিজের চেষ্টায় রাজ্য গড়েছিল। ইস্পাতকঠিন হাতে এসব রাজ্য শাসন করত তারা, যাতে তাদের রাজত্ব... তাদের কষ্টের ফসল কেউ ছিনিয়ে নিতে না পারে। কিন্তু সেসব দিন চলে গেছে। সেসব মহান পরিবার আর রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতাদের... যাদের উত্তরাধিকারীরা হলঘরে বসে আছে... কাছ থেকে কেড়ে নেয়া হয়েছে সব। ন্যায়-নীতিহীন তস্করের দল, আর তাদেরকে প্রশ্রয় দেয়া সরকারেরা মহান পরিবারগুলোকে মিশিয়ে দিয়েছে মাটির সঙ্গে। এভাবে আর চলতে পারে না, কামরায় উপস্থিত সবাইকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে—যেভাবে হোক, নিজেদের পুরনো শৌর্য-বীর্য পুনরুদ্ধার করবে তারা। আর এ-জন্য প্রয়োগ করতে হবে ভিন্ন কৌশল।

'হত্যা করবে ওরা—সতর্কভাবে, বাছাই করে! দক্ষতা এবং দুঃসাহসের সঙ্গে। হত্যার মাধ্যমে তস্করের দল এবং তাদের রক্ষাকর্তা দুর্নীতিবাজ সরকারগুলোকে খণ্ড-বিখণ্ড করে দেয়া হবে। উপস্থিত শ্রোতারা কখনোই সরাসরি এ-কাজ করবে না, তারা হবে শুধুমাত্র সিদ্ধান্তদাতা... কাকে কখন হত্যা করা হবে, সেটার নির্ধারণকারী। যেখানে সম্ভব, সেখানে দুর্নীতিবাজদের মাধ্যমেই বাছাই করা হবে শিকার, ওদের কথামত... ওদের দেয়া টাকার বিনিময়ে সরিয়ে দেয়া হবে নিজেদের কাঙ্ক্ষিত টার্গেটকে।

পুরাণের ফিনিক্স পাখির মত ছাইভস্ম থেকে আবার জন্ম হবে এই মানুষগুলোর, তাই ওরা *কাউন্সিল অভ ফেনিস* নামে পরিচয় পাবে। দুনিয়ার সমস্ত ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুগুলোতে ছড়িয়ে দিতে হবে নিজেদের কথা—জানাতে হবে, অজ্ঞাত একদল মানুষের উদয় হয়েছে, যারা রক্ত ঝরাতে কুণ্ঠাবোধ করে না; টাকা দিলে তাদের মাধ্যমে যে-কাউকেই কবরে পাঠানো সম্ভব। সবচেয়ে বড় কথা, যারা ফেনিসের কাউন্সিলকে ভাড়া করবে, তাদের পরিচয় কোনোদিনই ফাঁস হবার ভয় নেই। এভাবে দুর্নীতিবাজদের বর্ম ব্যবহার করে ওদেরকেই খতম করার কাজ করে যাবে কাউন্সিল।

'কিন্তু কীভাবে করা হবে এসব? কাউন্সিল যদি নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখে, তা হলে কে করবে নোংরা কাজগুলো? অতিথিদের এসব প্রশ্নের জবাবে শত-সহস্র বছর আগে ফারাও সম্রাট আর আরব রাজাদের তৈরি করা খুনিদের কথা শোনালেন পাদ্রোনি। জানালেন, কীভাবে মানুষকে ভয়ানক সব কাজ করাবার জন্য প্রশিক্ষণ দেয়া যায়, স্বেচ্ছায় বা সজ্ঞানে যে-কাজ কিছুতেই করবে না সে। মগজ-ধোলাই করতে হবে তাদের, লোভ দেখাতে হবে পরবর্তী জীবন অনন্ত সুখের... এরচেয়ে বড় প্রেরণা আর কিছু নেই পৃথিবীতে। এভাবে সদস্য যোগাড় করবে ফেনিস... এরাই হবে কাউন্সিলের অস্ত্র, তাদের সৈনিক।

'বলা বাহুল্য, শুরুতে ফেনিসের ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাজ করবে ক্ষমতাসীনদের মাঝে। অবিশ্বাস করবে ওরা, হয়তো বা ঠেকানোর জন্যও মরিয়া হয়ে উঠবে। এসব পদক্ষেপ দমন করতে হবে কঠোর হাতে। সৃষ্টি করতে হবে ভয়ানক সব উদাহরণের।

'পরবর্তী কয়েক বছরে নির্দিষ্ট কিছু মানুষকে হত্যা করা হবে। এদেরকে বাছাই করা হবে চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে; খুন করা হবে এমন সব পদ্ধতিতে, যাতে অবিশ্বাস আর সন্দেহের ঢেউ

বয়ে যায়—এক রাজনৈতিক দল লেগে যায় আরেক রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে... এক সরকার যুদ্ধ ঘোষণা করে আরেক সরকারের বিরুদ্ধে। এর ফলে অস্থিরতা সৃষ্টি হবে বিশ্বজুড়ে, ঘটবে রক্তপাত... কিন্তু তার মাঝে একটা বার্তা পৌঁছে যাবে সবার কাছে: ফেনিস-এর অস্তিত্ব আছে।

'ভাষণ শেষ করে অতিথিদের সবার মাঝে হাতে লেখা কিছু কাগজ বিতরণ করলেন পাদ্রোনি। এই পাতাগুলোর মাঝেই লুকানো থাকবে ফেনিসের শক্তি, ভবিষ্যতের নির্দেশনা। কাউন্সিলের সদস্য ছাড়া আর কেউ কোনোদিন দেখতে পাবে না ওগুলো। পাদ্রোনি জানালেন, এই কাগজগুলোই তাঁর শেষ উইল... উপস্থিত অতিথিরা তাঁর উত্তরাধিকারী।

'কীসের উত্তরাধিকার? প্রশ্ন করলেন অতিথিরা। পাদ্রোনির জন্য সহানুভূতি আছে তাঁদের, কিন্তু তিক্ত কথা বলতে দ্বিধা করলেন না। ভিলার সৌন্দর্য আর আপ্যায়ন দেখে মুগ্ধ তাঁরা, তবে কাউন্ট যে নিঃস্ব হয়ে গেছেন, তা তো অজানা নয় কারও। উপস্থিত সবারই কম-বেশি একই দশা। সামান্য জমিজমা ছাড়া তাঁদের কারোই কিছু নেই। ও দিয়ে কালেভদ্রে চোখ-ধাঁধানো নৈশভোজ হয়তো আয়োজন করা সম্ভব, কিন্তু যে বিশাল কাজ করতে চাইছেন পাদ্রোনি, সেসবের খরচ তো মেটানো যাবে না। কোথায় পাবেন তাঁরা টাকা?

'সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নটার জবাব দিলেন না পাদ্রোনি। তার বদলে জানতে চাইলেন, তাঁর প্রস্তাবের সঙ্গে সবাই একমত কি না। ওঁরা কাউন্সিল অভ ফেনিসের সদস্য হতে রাজি আছেন কি না।

'একে একে ইতিবাচক জবাব দিতে শুরু করলেন অতিথিরা, একেকজনের কণ্ঠ আগেরজনের চাইতে চড়া... শপথ নিলেন, পাদ্রোনির নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবেন, তাঁদের

পরিবারের প্রতি যে-অন্যায় করা হয়েছে, তার ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ নেবেন। বোঝা যাচ্ছিল, ওই মুহূর্তে পাদ্রোনি ওদের রক্ষাকর্তা এবং ঈশ্বরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

'দ্বিমত পোষণ করল শুধু একজন। সবশেষ মানুষটা... ধর্মভীরু এক স্প্যানিয়ার্ড, সরাসরি জানিয়ে দিল অস্বীকৃতি। বাইবেল আওড়াতে শুরু করল সে, বলল আমার পাদ্রোনি পাগল হয়ে গেছেন, তাই উচ্চারণ করছেন এসব আবোল-তাবোল কথা। অন্যদেরকে ভুল পথে পরিচালিত করবার চেষ্টা করে তিনি ঈশ্বরের চোখে কত বড় পাপ করছেন, তা উল্লেখ করতেও ভুলল না।

'পিনপতন নীরবতা নেমে এল হলঘরে। অগ্নিদৃষ্টিতে স্প্যানিয়ার্ডের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন পাদ্রোনি। তারপর থমথমে গলায় বললেন, "আমি তোমাদেরকে ভুল পথে পরিচালিত করছি?"

'"অবশ্যই, স্যর," বলল লোকটা। "আমি এতে কিছুতেই সায় দিতে পারছি না।"

'বীভৎস যে-ঘটনাপ্রবাহ একটু পর শুরু হবে, তার সূচনা ঘটল ওখানে। কোমরের হোলস্টার থেকে রিভলবার বের করে আনলেন পাদ্রোনি, কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই গুলি করলেন স্প্যানিয়ার্ডকে। কপালে একটা ফুটো নিয়ে চেয়ার-সহ উল্টে পড়ল লোকটা। বাকি অতিথিরা লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, হতভম্ব দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন নিহত সঙ্গীর দিকে।

'"প্রাণ নিয়ে ওকে কিছুতেই এখান থেকে যেতে দিতে পারতাম না আমি," শান্ত গলায় বললেন পাদ্রোনি।

'যেন কিছুই ঘটেনি, এমন ভঙ্গিতে আবার যার যার আসনে বসলেন অতিথিরা। সবার চোখ সেঁটে রইল শক্তিমান কাউন্টের উপরে, যিনি নির্দ্বিধায় যে-কারও প্রাণ নিতে পারেন। কে জানে,

হয়তো বা ভয়ও পাচ্ছিলেন ওঁরা। যা হোক, সবাই বসলে আবার কথা বললেন পাদ্রোনি।

"“এখানে উপস্থিত সবাই আজ থেকে আমার উত্তরাধিকারী,” বললেন তিনি। “কারণ তোমরা, আর তোমাদের পরের প্রজন্মগুলো কাউন্সিল অভ ফেনিসের মাধ্যমে সেই কাজ করবে, যা আমার পক্ষে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। বয়স হয়েছে আমার... বুড়ো হয়ে গেছি, মৃত্যু সমাগত। আমার হয়ে তোমরাই ধ্বংস করবে দুর্নীতির ধারক আর রক্ষকদেরকে। তোমরাই ছড়িয়ে দেবে অস্থিরতা আর বিশৃঙ্খলা, আর তার মাধ্যমে মালিক হবে পৃথিবীর। ফিরে পাবে নিজেদের হারানো সাম্রাজ্য... হারানো গৌরব। আমি যা দিয়ে যাব তোমাদেরকে, তার চেয়ে বহুগুণ বড় হবে তোমাদের অর্জন।”

"“ক্...কী দিয়ে যাবেন আপনি আমাদেরকে?” ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন এক অতিথি।

"“আমার লুকানো সম্পদ,” জানালেন পাদ্রোনি। “জেনোয়া আর রোমের ব্যাঙ্কে বেনামে অনেক টাকা রেখেছি আমি, সেগুলো সমান ভাগে ভাগ করে নেবে তোমরা। কীভাবে, এবং কোন্ শর্ত মোতাবেক ওগুলো পাবে, তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে তোমাদের হাতে ধরা কাগজে। আমার সারাজীবনের গোপন সঞ্চয়... তোমাদের কাজ শুরুর জন্য যথেষ্টই হবে সেটা।”

"“*তোমাদের কাজ* বলছেন কেন?” একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন আরেক অতিথি। “*আমাদের* বলা উচিত নয় কি?”

"“কাজটা আমাদেরই থাকবে, কিন্তু আমি থাকব না,” দীর্ঘশ্বাস ফেললেন পাদ্রোনি। “কারণ টাকা-পয়সার চেয়েও আরও বড় একটা উপহার আমি দিয়ে যাচ্ছি তোমাদেরকে। গোপনীয়তা! নিশ্চিত থাকো, তোমাদের পরিচয় কোনোদিন কোথাও প্রকাশ পাবে না। আজ রাতের এই সভার কথা সারা পৃথিবীতে একমাত্র

তোমরাই জানবে, আর কেউ না। কী কথা হয়েছে এখানে, তা বলার মত কেউই অবশিষ্ট থাকবে না... এমনকী আমিও না!”

‘মৃদু প্রতিবাদ ভেসে এল অতিথিদের মাঝ থেকে—পাদ্রোনির নিশ্চয়তা পেয়ে সন্তুষ্ট হতে পারছেন না। হাজার হোক, ঘরভর্তি লোক ছিল সেদিন—চাকরবাকর, সহিস-কোচোয়ান, সঙ্গীতশিল্পী, রক্ষিতা... এত লোকের মুখ বন্ধ করা যাবে কী করে?

‘এক হাত তুলে সবাইকে চুপ করালেন পাদ্রোনি। আগুনের মত জ্বলজ্বল করছিল চোখদুটো। শীতল গলায় বললেন, “এখুনি তার জবাব পাবে। তোমাদের জন্য এটা একটা শিক্ষাও হয়ে থাকবে—বুঝতে পারবে, সহিংসতার পথ অনুসরণ করা কতটা জরুরি। কখনোই কেন পিছু হটা যাবে না। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য... মহান যে-দায়িত্ব নিয়েছ, তার সাফল্যের জন্য রক্ত ঝরাতেই হবে তোমাদেরকে।”

‘কথা শেষ করে হাত নামালেন পাদ্রোনি, আর তারপরেই ভিলার শান্ত-সমাহিত পরিবেশ বিদীর্ণ হয়ে গেল গুলিবর্ষণের আওয়াজ আর মানুষের মরণ-আর্তনাদে। শুরুটা হলো রান্নাঘরে। শটগানের উপর্যুপরি শব্দে কানে তালা লেগে গেল, কাঁচ ভাঙল, মেঝেতে আছড়ে পড়ল থালাবাসন। পাইকারী হত্যাকাণ্ডের শিকার হলো ওখানে জড়ো হওয়া চাকরবাকররা। দরজা খুলে হলঘরে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করল তারা, রক্তাক্ত দেহ নিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ল কয়েক পা এগোতেই।

‘এরপর বাগানের পালা। সঙ্গীত থেমে গেল, তার বদলে ভেসে এল একের পর এক চিৎকার আর গুলির আওয়াজ। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ভিলার ওপরতলাতেও শোনা গেল মেয়েদের গগনবিদারী আর্তনাদ। পাহাড়ি যুবতীর দল, কয়েক ঘণ্টা আগে পাদ্রোনির নির্দেশে কুমারীত্ব বিসর্জন দিয়েছে, এবার তাঁরই ইচ্ছেয়

শিকার হলো ভয়াবহ মৃত্যুর।

'ঝুলবারান্দায়, ছায়ার ভিতর দেয়ালে শরীর মিশিয়ে দিলাম আমি; জানি না কী করব। কাঁপছি হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত, অমন ভয় জীবনে কোনোদিন পাইনি। গোলাগুলির আওয়াজ থেমে গেল এক সময়, নেমে এল নীরবতা। কিন্তু আর্তনাদে ভারী পরিবেশের চেয়ে আরও ভয়ানক মনে হলো তা।

'হঠাৎ পায়ের আওয়াজ শুনলাম... তিন থেকে চারজন মানুষ দৌড়াচ্ছে... নিশ্চয়ই বন্দুকধারী খুনিরা! সিঁড়ি ধরে নামছে ওরা। আতঙ্কে সিঁটিয়ে গেলাম, বুঝি আমার খোঁজেই আসছে! কিন্তু না, আমার দিকে না, উত্তরের বারান্দার দিকে চলে গেল ওরা, কাজ শেষে সমবেত হলো ওখানে। চকিতে হলঘরের দিকে তাকালাম, চার অতিথি মূর্তির মত বসে আছেন ওখানে, আমার মতই দশা তাঁদের। দৌড়ে হয়তো পালিয়েই যেতেন, যদি না পাদ্রোনি একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতেন ওঁদের দিকে।

'চোখ ফেরাতে না ফেরাতেই আবার গুলি হলো। দ্রুত চারটা শট... পিছু পিছু চারটা কণ্ঠের আর্তনাদ শোনা গেল উত্তরের বারান্দা থেকে। বুঝতে পারলাম, খুনিদেরকেই এবার খুন করল নিঃসঙ্গ আরেক আততায়ী।

'আবারও নীরবতা নেমে এল ভিলায়। সর্বত্র মৃত্যুর ছাপ—ছায়ায় ছায়ায়... এমনকী দেয়ালে নেচে বেড়ানো মোমবাতির আলোর আভাতেও। কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে অতিথিদের উদ্দেশে কথা বললেন পাদ্রোনি।

"শেষ হয়েছে সব," আশ্চর্য রকম শান্ত শোনাল তাঁর কণ্ঠ। "প্রায় শেষ আর কী। এই টেবিলে যারা আছি, তারা... আর আমার খুব বিশ্বস্ত একজন ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই এ-বাড়িতে। আমার ওই লোক তোমাদেরকে পর্দা-ঘেরা ক্যারিজে

করে নিয়ে যাবে বোনাফাসিয়োতে। ওখানে সাধারণ মানুষের ভিড়ে মিশে যেতে পারবে তোমরা, ভোরের স্টিমার ধরে চলে যেতে পারবে নেপলস্-এ। পনেরো মিনিট সময় পাচ্ছ জিনিসপত্র গুছিয়ে নেবার জন্য, তারপর সবাইকে সামনের দরজায় চাই। নইলে তোমাদেরকে ফেলেই চলে যাবে আমার লোক। ও হ্যাঁ, লাগেজ নিজেদেরকেই বইতে হবে, দুঃখিত।"

'একজন অতিথি মুখ খুললেন। ফিসফিসিয়ে বললেন, "আর আপনি, কাউন্ট?"

'হাসলেন পাদ্রোনি। "আমি? সবশেষ শিক্ষা হিসেবে নিজের জীবন বিসর্জন দেব। মনে রেখো আমাকে। আমার পথই তোমাদের পথ! যাও, যোগ্য শিষ্য হও আমার! ধ্বংস করে দাও দুর্নীতির ধারক আর রক্ষকদেরকে!" বদ্ধ উন্মাদ হয়ে গেছেন তিনি ততক্ষণে, চেঁচাচ্ছেন অপ্রকৃতিস্থের মত। "ভিতরে এসো!" কাকে উদ্দেশ করে যেন বলে উঠলেন হঠাৎ করে।

'ছোট্ট এক ছেলে... বছর দশ-বারো বয়স, পোশাকে মনে হলো স্থানীয় রাখালবালক... দরজা ঠেলে ঢুকল হলঘরে। শীর্ণ দু'হাতে বিশাল এক পিস্তল ধরে রেখেছে। পায়ে পায়ে পাদ্রোনির কাছে এসে দাঁড়াল।

'উপর দিকে তাকালেন পাদ্রোনি, বুঝি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন ঈশ্বরের প্রতি। ছেলেটাকে বললেন, "যা বলেছি করো!" তারপর চেঁচালেন, "আমার শিষ্যরা, নিষ্পাপ এই শিশু তোমাদেরকে পথ দেখাবে!"

'নিষ্কম্প হাতে পিস্তল তুলল রাখালবালক। নির্দ্বিধায় গিলবার্তো বারেমির মাথায় গুলি করল সে।'

এ-পর্যন্ত বলে থেমে গেলেন বৃদ্ধা। দু'চোখ অশ্রুসজল হয়ে

উঠেছে। 'আর পারছি না, বিশ্রাম নিতে হবে আমাকে,' বললেন তিনি।

মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাঁর কাহিনি শুনছিল রানা-কুয়াশা, এবার নড়ে উঠল।

'কিছু মনে করবেন না, ম্যা'ম,' কুয়াশা বলল। 'অনেক প্রশ্ন আছে আমাদের। নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন তা?'

'থাক,' বাধা দিল রানা। 'পরে।'

ষোলো

ভোরের কুয়াশা মিলিয়ে যেতেই পাহাড়ের আড়াল থেকে হেসে উঠল সূর্য, সোনালি রোদে স্নান করিয়ে দিল ফার্মহাউস আর আশপাশের এলাকাকে।

কিচেন থেকে চা-পাতা খুঁজে নিল কুয়াশা, বৃদ্ধার অনুমতি নিয়ে বানিয়ে ফেলল চা। ধূমায়িত কাপ নিয়ে জানালার পাশে বসল রানা, ফার্মহাউসের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝর্ণার দিকে তাকিয়ে হারিয়ে গেল আপন চিন্তায়।

বেশ কিছু খটকার সৃষ্টি হয়েছে ওর মনে। সেগুলোর জবাব পাওয়া দরকার। ফেনিসের উৎপত্তি সম্পর্কে যে-সব থিয়োরি আছে, তার সঙ্গে অন্ধ মহিলাটির ভাষ্যের ফারাক অনেক। সবচেয়ে বড় কথা, এসব কেন ওদেরকে শোনাচ্ছেন তিনি? উদ্দেশ্যটা কী? বৃদ্ধার মোটিভ জানা গেলেই শুধুমাত্র সিদ্ধান্ত নেয়া

যাবে, অদ্ভুত কাহিনিটার কতখানি বিশ্বাস করা যায়।

জানালার দিক থেকে মুখ ঘোরাল রানা, তাকাল ফায়ারপ্লেসের পাশে চেয়ারে বসা বৃদ্ধার দিকে। এক কাপ চা তাঁকেও দিয়েছে কুয়াশা, সেটায় ছোট ছোট চুমুক দিচ্ছেন... সম্ভবত বহু বছর আগে ভদ্রভাবে চা খাওয়ার এ-নিয়মই শেখানো হয়েছিল তাঁকে। কুয়াশাকে দেখা গেল হাঁটু গেড়ে বসে থাকতে, হাত বোলাচ্ছে মেঝেতে গুটিসুটি মেরে থাকা কুকুরটার গায়ে—বন্ধুত্ব করার খায়েশ। চকিতের জন্য রানার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করল।

বৃদ্ধার দিকে এগিয়ে গেল রানা। বলল, 'আমরা আপনাকে আমাদের নাম জানিয়েছি, সেনিয়রা। কিন্তু আপনারটা এখনও জানতে পারিনি।'

'মারিয়া মাযোলা,' বললেন বৃদ্ধা। 'যদি খোঁজ নেয় কেউ, বোনাফাসিয়োর কনভেন্টের পুরনো রেকর্ডে নিশ্চয়ই পাবে এ-নাম। এজন্যেই তো জানতে চাইছ, নাকি? আমার কথার সত্যতা যাচাইয়ের জন্য?'

'জী,' স্বীকার করল রানা। 'যদি প্রয়োজন পড়ে আর কী... এবং সুযোগ মেলে।'

'নামটা পাবে ওখানে, নিশ্চিত থাকো। আমার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে পাদ্রোনির নামও থাকতে পারে।'

'বিশ্বাস করছি আপনার কথা, চেক করে দেখার দরকার নেই কোনও,' উঠে দাঁড়িয়ে বলল কুয়াশা। চোখের ইশারায় রানাকে বোঝাল, বৃদ্ধাকে খুশি রাখার জন্য বলছে কথাটা।

হাসলেন মারিয়া মাযোলা। চোখে না দেখলেও ঠিকই বুঝতে পেরেছেন সব। বললেন, 'থাক, আমাকে সান্ত্বনা দেবার দরকার নেই। সন্দেহ থাকলে সরাসরিই বলো।'

'কিছুটা তো আছেই,' সোজাসাপ্টা গলায় বলল রানা।

'আমাদের জানা দরকার, কেন আমাদেরকে কাউন্ট বারেমির কাহিনি শোনাচ্ছেন আপনি। উদ্দেশ্য কী।'

'আমার উদ্দেশ্য শুধু সত্যকে প্রকাশ করা, বাছা। আর কিছু নয়। মরার আগে কাউকে জানিয়ে যেতে চাই সব। ভয়ানক সে-কাহিনি আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। একমাত্র আমিই বেঁচেছিলাম ওই পাইকারী হত্যাকাণ্ড থেকে।'

'আরেকজন লোকও তো ছিল,' বলল রানা। 'আর ছিল এক রাখাল ছেলে।'

'হলঘরে হাজির ছিল না ওরা। জানত না ওখানে কী কথা হয়েছে পাদ্রোনি আর তাঁর অতিথিদের মাঝে। কী সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে...'

'আর কাউকে বলেননি আপনি এসব?' জিজ্ঞেস করল কুয়াশা।

'না... কখনোই না।' জানালেন বৃদ্ধা।

'কেন?'

'কাকে বলব? আমার কাছে অতিথি বলতে কেউ আসে না। বাজার-সদাই দেবার জন্য মাঝে-মধ্যে দু-একজন আসে নীচের গ্রাম থেকে। ওদেরকে কিছু বলা মানে বিপদ ডেকে আনা। এমন কাহিনি শুনলে কেউ তো আর মুখ বন্ধ রাখতে পারবে না।'

'কিন্তু আমার তো মনে হয় ওরা সবকিছুই জানে,' বলল কুয়াশা।

'আমি তোমাদেরকে যা বলেছি, তা জানে না।'

'না জানলে কী গোপন করছে ওরা? আমাকে প্রথমে তাড়াতে চেয়েছিল। রাজি না হওয়ায় খুন পর্যন্ত করতে চেয়েছে।'

একটু যেন অবাক হলেন বৃদ্ধা। 'সোনিয়া আমাকে এসব বলেনি তো!'

'আপনার সঙ্গে কথা বলার সময় পেল কোথায় ও?' বলল রানা।

'তা অবশ্য ঠিক,' বিড়বিড় করলেন বৃদ্ধা। কুয়াশার দিকে মুখ ঘোরালেন। 'গাঁয়ে গিয়ে তুমি ঠিক কী করেছ, বলো তো?'

'কিছুই না,' কুয়াশা জবাব দিল। 'শুধু প্রশ্ন করেছি কাউন্ট বারেমির ব্যাপারে।'

'উঁহুঁ, আরও কিছু করেছ বা বলেছ। নইলে এত খেপার কথা না ওদের।'

একটু ভাবল কুয়াশা। তারপর বলল, 'ও হ্যাঁ... সরাইমালিককে ভয় দেখিয়েছিলাম, লোকজন নিয়ে ফিরে আসব। পুরনো নথিপত্রের সঙ্গে মিলিয়ে ভালমত গবেষণা চালাব কাউন্ট বারেমির বিষয়ে।'

গম্ভীর হয়ে গেলেন বৃদ্ধা। 'বড্ড ভুল করেছ, বাছা। যে-পথে এসেছ, ফেরার সময় সে-পথে আর যেয়ো না। পথ দেখাবার জন্য সোনিয়াকেও সঙ্গে দিতে পারব না আমি। যদি খোঁজ পায়, ওরা কিছুতেই তোমাদেরকে বাঁচতে দেবে না।'

'আমরা তা জানি,' বলল রানা। 'কিন্তু কেন, তা-ই বুঝতে পারছি না।'

'পাহাড়ের অধিবাসীদের নামে নিজের সমস্ত জমিজমা লিখে দিয়েছিলেন আমার পাদ্রোনি। এ-কারণে সামান্য প্রজা থেকে কয়েক হাজার একর জায়গার মালিক হয়ে গেছে ওরা। বোনাফাসিয়োর আদালত স্বীকৃতি দিয়েছে এর, বৈধ মালিকানার রায় পাবার পর পুরো এলাকায় বিশাল এক উৎসবও হয়েছিল। কিন্তু বাইরের দুনিয়ার কেউ জানে না, এসব সম্পত্তি পাবার জন্য বিরাট এক মূল্য দিতে হয়েছে পাহাড়ের লোকজনকে। সেই মূল্যের খবর যদি প্রকাশ পায় কোনোমতে, আইনের খড়গ নেমে

আসবে সবার উপর... আদালত আবার কেড়ে নেবে সব জমি!'

'কী সেই মূল্য?' ভুরু কুঁচকে জানতে চাইল রানা।

জবাব দিলেন না মারিয়া। চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর চেহারা, বোধহয় ভাবছেন এলাকাবাসীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা উচিত হবে কি না।

'প্লিজ, ম্যা'ম!' অনুরোধ করল কুয়াশা।

ফোঁস করে শ্বাস ফেললেন বৃদ্ধা। বললেন, 'বেশ, খুলেই বলছি সব। সত্যকে আর কতদিন চাপা দিয়ে রাখব?'

আগের রাতে বলা কাহিনির খেই ধরলেন তিনি।

'পাদ্রোনির মৃত্যুর পর এক মুহূর্তও অপেক্ষা করল না অতিথিরা। ছুটল নিজেদের কামরার দিকে। অনড় রইলাম কেবল আমি, ঝুলবারান্দার ছায়ায় লুকিয়ে কাঁপতে লাগলাম থর থর করে, মৃত্যুর নগ্ন চেহারা দেখতে পেয়ে বমি পাচ্ছিল। কতক্ষণ ওভাবে ছিলাম, তা বলতে পারব না; সংবিৎ ফিরে পেলাম আবার অতিথিদের পায়ের শব্দ শুনে—জিনিসপত্র গুছিয়ে সিঁড়ি ধরে নেমে আসছে ওরা। একটু পরেই ক্যারিজের চাকার আওয়াজ আর ঘোড়ার হ্রেষারব কানে এল। অতিথিদেরকে নিয়ে ভিলা থেকে চলে গেল কোচোয়ান।

'হামাগুড়ি দিয়ে বারান্দার সঙ্গে লাগোয়া দরজার দিকে এগোতে শুরু করলাম এবার, দাঁড়াবার শক্তি পাচ্ছিলাম না। দৃষ্টিও কেমন যেন ঘোলা ঘোলা লাগছিল। দরজার হাতল ধরে উঠে দাঁড়াতে গেছি, এমন সময় শুনতে পেলাম চিৎকার। কণ্ঠটা একজন বাচ্চার, কিন্তু সেটা অবিশ্বাস্য রকম শীতল এবং কর্তৃত্ব-ভরা।

'"*আতুলয়ালমেন্তে! ই প্রেস্তো দেন্তো!*"

'উত্তরের বারান্দা থেকে কাকে উদ্দেশ করে যেন চেঁচাচ্ছে রাখালবালক। ওর কণ্ঠ শুনে ঘাবড়ে গেলাম আরও—কারণ ও একটা শিশু... সেইসঙ্গে একজন খুনি!

'কোনোরকমে উঠে দাঁড়িয়ে বারান্দার দরজা খুললাম। ভিতরের কামরা পেরিয়ে এগোতে থাকলাম সিঁড়ির দিকে। নীচতলায় নেমে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাব... পালিয়ে যাব এই মৃত্যুপুরী থেকে। কিন্তু ল্যাণ্ডিঙে পৌঁছুবার সঙ্গে সঙ্গে হৈ-হল্লার আওয়াজ শুনে থমকে গেলাম। জানালা দিয়ে চোখে পড়ল আলোর আভা—মশাল হাতে অসংখ্য মানুষ ছুটে আসছে ভিলার দিকে। কিছুক্ষণ পরেই বাড়ির চারদিকের দরজা দিয়ে উন্মত্তের মত ভিতরে ঢুকে পড়ল তারা।

'নীচে নামা আর হলো না আমার, তাড়াতাড়ি ওপরতলায় ছুটে চলে গেলাম। কী করব জানি না তখনও, শুধু বুঝতে পারছি—পাগলা জনতার সামনে পড়া চলবে না কিছুতেই। দৌড়াতে দৌড়াতে সেলাই-ঘরে ঢুকে পড়লাম। ভিতরে বীভৎস দৃশ্য—বাড়ির দাসী-বাঁদীদের লাশ পড়ে আছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে, সবার শরীর রক্তে মাখামাখি, প্রাণহীন চোখগুলো বিস্ফারিত হয়ে আছে। ওপরতলার অন্যান্য কামরাগুলোতেও কমবেশি একই অবস্থা।

'সিঁড়ির দিক থেকে তখন ভেসে আসছে পায়ের শব্দ আর উত্তেজিত কণ্ঠের চেঁচামেচি। বুঝতে পারছি, আমাকে জ্যান্ত দেখতে পেলে খুন করে ফেলবে ওরা। বাঁচার উপায় নেই। কাঁদতে কাঁদতে কামরার ভিতরে চোখ বোলালাম, আর হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। রক্তে সয়লাব মেঝের মধ্যে গড়ান দিলাম একটা, জামা-কাপড় ভিজিয়ে ফেললাম... মুখেও মাখলাম রক্ত। তারপর চোখ বন্ধ করে মড়ার মত পড়ে রইলাম লাশের

মাঝখানে।

'একটু পরেই স্থানীয় কয়েকজন লোক উদয় হলো সেলাই-ঘরে। সমবেত কণ্ঠে প্রার্থনা করল ওরা, ক্ষমা চাইল ঈশ্বরের কাছে, তারপর ধরাধরি করে একটার পর একটা লাশ নিয়ে যেতে শুরু করল নীচতলায়... বাড়ির আঙিনায়। আমাকেও লাশ ভেবে নিয়ে যাওয়া হলো ওখানে। এক ফাঁকে চোখ খুলে দেখে নিলাম কী ঘটছে। সারা বাড়ি থেকেই লাশ সংগ্রহ করছে এলাকাবাসী, ধীরে ধীরে আঙিনায় বড় হচ্ছে মৃতদেহের স্তূপ। বড় বড় বেশ ক'টা ওয়্যাগন আনা হলো—তাতে করে লাশ সরিয়ে নিতে শুরু করল ওরা। অন্যান্য দাসী-বাঁদীদের সঙ্গে আমিও ঠাঁই পেলাম একটা ওয়্যাগনে।

'কী এক ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতা সেটা, বলে বোঝাতে পারব না। আমার চারপাশে শুধু লাশ আর লাশ... পরিচিত মানুষের প্রাণহীন দেহ! সবাইকে চিনি আমি, তাদের সঙ্গে তিনটে বছর কাটিয়েছি এ-বাড়িতে। চরম অবমাননার সঙ্গে তাদের দেহ এখন স্তূপ হয়ে আছে আমার ডানে-বামে, উপর-নীচে। ভয় আর ঘৃণায় রি রি করছিল সর্বাঙ্গ। বমি আসছিল। চিৎকার ঠেকানোর জন্য নিজের ঠোঁট কামড়ে ধরে রেখেছিলাম পুরোটা সময়। আশপাশ থেকে ভেসে আসছিল লাশ সরানোর কাজে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছিল, তাদের হুমকি-ধমকি—সবাইকে বলে দেয়া হচ্ছিল, ভিলা থেকে কোনও কিছু লুঠ করা যাবে না; কেউ যদি সে-চেষ্টা করে, তা হলে তাকে যোগ দিতে হবে লাশের ভিড়ে। বাড়ির ভিতরেও বেশ কিছু লাশ রেখে যাবার নির্দেশ দিতে শুনলাম—যতটুকু বুঝলাম, জ্বালিয়ে দেয়া হবে ভিলা; আগুন নেভার পর পোড়া লাশ উদ্ধার করা হবে ধ্বংসস্তূপ থেকে, বলা হবে অগ্নিকাণ্ডে মারা গেছে বাড়ির বেশ কিছু লোক... বাকিরা পালিয়ে গেছে। এতগুলো মানুষের উধাও হয়ে

যাবার চমৎকার ব্যাখ্যা হবে সেটা—কেউই নিশ্চিত হতে পারবে না, ঠিক কারা মারা গেছে আর কারা নিখোঁজ।

'যা-হোক, খানিক পরে চলতে শুরু করল ওয়্যাগন। মসৃণ রাস্তা ধরে চলল কিছুক্ষণ, তারপর নেমে পড়ল খোলা প্রান্তরে। রুক্ষ, বন্ধুর পথে লাশে ভরা ভারী ওয়্যাগন টানতে বেশ বেগ পেল ঘোড়াগুলো, কিন্তু পিঠে চাবুক মেরে ওদেরকে চলতে বাধ্য করল কোচোয়ান। ঝাঁকি খেতে খেতে এগোতে থাকলাম আমরা। সহ্যের প্রায় শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি আমি তখন, নিজের মৃত্যুকামনা করছি... একেকবার ইচ্ছে হলো চেঁচিয়ে উঠি, পারলাম না কেবল প্রাণের ভয়ে। বিড়বিড় করে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলাম—মুক্তি চাইলাম এই দুঃস্বপ্নের হাত থেকে। এক পর্যায়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম।

'কতটা সময় সংজ্ঞাহীন ছিলাম, জানি না; তবে চেতনা ফিরলে টের পেলাম, থেমে গেছে ওয়্যাগন। লাশের ফাঁক দিয়ে উঁকি দিলাম বাইরে। চাঁদের আলোয় দেখলাম, জঙ্গলে ছাওয়া কতগুলো পাহাড়ের মাঝখানে পৌঁছেছি আমরা। জায়গাটা অপরিচিত, আগে কখনও দেখিনি; আন্দাজ করলাম—ভিলা বারেমি থেকে বহুদূরে নিয়ে আসা হয়েছে আমাদেরকে। ওয়্যাগনের সঙ্গে আসা লোকজনের ভারী শ্বাস-প্রশ্বাস কানে এল—মাটি খুঁড়ছে ওরা।

'ঘণ্টাখানেক পর শুরু হলো দুঃস্বপ্নের শেষ অংশ। ওয়্যাগন থেকে নামিয়ে সব লাশ ছুঁড়ে ফেলতে শুরু করল ওরা সদ্য-খোঁড়া গর্তের ভিতর—ওটা আসলে গণকবর! চ্যাংদোলা করে একটু পর আমাকেও ছুঁড়ে ফেলা হলো ওখানে। ভিতরে আছাড় খেয়ে ব্যথা পেলাম খুব; কিন্তু আওয়াজ করলাম না একটুও। বোধবুদ্ধি ততক্ষণে ভোঁতা হয়ে গেছে—দেখছি সবই, তবে অনুভব করছি না

কিছুই। পাগল যে হয়ে যাইনি, তা-ই ঢের।

'কবরটা বিশাল, মনে হলো একটা বৃত্তের মত খোঁড়া হয়েছে। সব লাশ ফেলে দেবার পরও পুরোটা ভরল না। বাইরে থেকে ভেসে আসছিল কথাবার্তার আওয়াজ—কেউ কাঁদছে, কেউ বা ডেকে চলেছে ঈশ্বরকে... ক্ষমা চাইছে কৃতকর্মের জন্য। কয়েকজন দাবি জানাল ধর্মীয় রীতি মোতাবেক শেষকৃত্য করবার জন্য, কিন্তু অন্যেরা রাজি হলো না তাতে। শেষকৃত্য করাতে হলে পাদ্রী ডেকে আনতে হবে... এত সময় কোথায়? পাদ্রী যে মুখ বন্ধ রাখবে, তার-ই বা নিশ্চয়তা কী? না, এ হবার নয়।

'লম্বা-চওড়া এক ভাষণ দিতে শুনলাম একজনকে। সে সবাইকে বোঝাল, নিজেদের মঙ্গলের জন্য... ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মঙ্গলের জন্য গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে ওদেরকে। এই গোপনীয়তাই পাহাড়ি এলাকার কয়েক হাজার একর জমির মূল্য, যা ওদেরকে দিয়ে গেছেন মহান পাদ্রোনি। মরার আগে বলে গেছেন তিনি—যদি কোনোদিন সত্যি ঘটনা ফাঁস হয়, তা হলে সব হারাবে ওরা, সরকার কেড়ে নেবে পুরো সম্পত্তি। তাই দারিদ্র্যের কষাঘাত থেকে বাঁচতে চাইলে এ-মূল্য চুকাতেই হবে ওদেরকে। যা ঘটে গেছে আজ রাতে, তা সীমাবদ্ধ রাখতে হবে নিজেদের মাঝে; কিছুতেই বাইরের কাউকে জানতে দেয়া যাবে না ওদের গোমর।

'ভাষণে কাজ হলো, নীরব হয়ে গেল লোকজন। কোদাল দিয়ে গর্তের ভিতর মাটি ফেলতে শুরু করল ওরা। অন্ধকারে সাবধানে হাত নাড়লাম আমি, মুখের উপর মাটি পড়লেই একটু একটু করে সরিয়ে দিতে লাগলাম, যাতে শ্বাস নিতে পারি। শেষ পর্যন্ত নাক বরাবর সামান্য একটা ফুটো রাখতে পারলাম পুরো গর্ত ভরে যাবার পরও। সারা শরীর মাটিচাপা পড়ার পরেও বেঁচে

গেলাম এই কারণে।

'কবরের ভিতরে কয়েক ঘণ্টা রইলাম আমি, তারপর কেঁচোর মত মাটি খুঁড়ে বেরিয়ে এলাম বাইরে। শরীরে ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শ পেয়ে কেঁদে ফেললাম হু হু করে, বিশ্বাস হতে চাইছিল না—অমন একটা নরকযজ্ঞের পরও বেঁচে আছি। আশপাশে তাকালাম, কেউ নেই কোথাও। গর্তটা মাটিচাপা দেবার পর চলে গেছে সবাই। উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করলাম উদ্দেশ্যহীনভাবে। বেঁচে আছি বটে, কিন্তু জীবন তছনছ হয়ে গেছে আমার। পাহাড়ি এলাকায় আর ফিরে যাবার উপায় নেই, গেলেই খুন হয়ে যাব।

'কী করব, ভেবে পেলাম না। উপকূলের দিকে যেতে পারি, পাদ্রোনির বেশ কিছু বন্ধুবান্ধব আছেন ওদিকে; কিন্তু লাভ কী? আমার কথা বিশ্বাস করবেন কেন তাঁরা? কেন আশ্রয় দেবেন? সামান্য এক রক্ষিতা আমি, এতদিন পাদ্রোনির সহচরী ছিলাম বলে অবাধ চলাফেরা করতে পেরেছি, এখন হয়তো ঢুকতেই পারব না ওসব বাড়িতে।

'হঠাৎ মনে পড়ে গেল *জোনজা*-র এক এস্টেটের আস্তাবল রক্ষকের কথা। খুব ভালমানুষ; যতবার ওখানে গেছি, তার কাছ থেকে ভাল ব্যবহার পেয়েছি আমি। কখনও খারাপ দৃষ্টিতে তাকায়নি আমার দিকে, বরং সমীহ এবং নীরব ভালবাসা প্রকাশ পেতে দেখেছি তার চোখে। সাতপাঁচ ভেবে বুঝতে পারলাম, ওই লোকই আমার একমাত্র ভরসা। তাই সে-দিকে যাত্রা করলাম।

'এরপরের ঘটনা আর বিস্তারিত শোনানোর প্রয়োজন মনে করছি না। সংক্ষেপে শুধু এটুকু জানাই, জোনজা-র ওই আস্তাবল রক্ষক আশ্রয় দেয় আমাকে, তাকেই কিছুদিন পরে বিয়ে করি আমি। আমার পেটে পাদ্রোনির সন্তান ছিল, কিন্তু তাই বলে কোনোদিন আমার অমর্যাদা করেনি সে। বরং অন্যের সন্তানকে

নিজের সন্তানের মত ভালবেসেছে, সারাজীবন বুকে আগলে রেখেছে আমাকে আর আমার বাচ্চাকে। *ভেসকোভাতো*-র উত্তরে চলে গিয়েছিলাম আমরা, পাহাড়ি লোকজনের নাগালের বাইরে, সেখানেই কাটিয়েছি বহু বছর। বুকের ভিতর চাপা দিয়ে রেখেছি ভয়াল সেই রাতের কথা, আমার স্বামী ছাড়া কোনোদিন কাউকে খুলে বলিনি সে-সব। ও-ও ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝতে পেরে গোপন রেখেছিল সবকিছু। আসলে... মুখ খুলে লাভ-ও ছিল না কোনও। যারা মারা গেছে, তাদেরকে তো আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়। আর দুই খুনি... অচেনা সেই কোচোয়ান আর রাখালবালক... দু'জনেই পালিয়ে গিয়েছিল কর্সিকা ছেড়ে।

'যা হোক, এই-ই ছিল আমার কাহিনি। যা জানি, তার সবই খুলে বলেছি তোমাদেরকে। এখন যদি কোনও প্রশ্ন থাকে, করতে পারো। তবে মনে হয় না নতুন আর কিছু জানাতে পারব তোমাদেরকে।'

মারিয়া মাযোলার কথা শেষ হলে নীরবতা নেমে এল কামরায়। কিছুক্ষণ কোনও কথা বলল না কেউ, তারপর উঠে দাঁড়াল কুয়াশা। খালি হয়ে যাওয়া কাপে চা ঢালতে ঢালতে বিড়বিড় করল, 'পার নস্ত্রো সার্কোলো!' ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানার দিকে। 'পঁচাত্তর বছর পেরিয়ে গেছে, তাও ওই গণহত্যার কাহিনি লুকানোর জন্য মানুষ খুন করতে চাইছে পাহাড়ি লোকেরা!'

'পার্দোনা?' বলে উঠলেন বৃদ্ধা। বাংলায় কথা বলেছে কুয়াশা, সেটা বুঝতে পারেননি।

'দুঃখিত,' বলে তাঁর দিকে ফিরল কুয়াশা। ইটালিয়ানে পুনরাবৃত্তি করল কথাটার।

'এতে অবাক হবার কিছু নেই,' বললেন বৃদ্ধা।

'বংশ-পরম্পরায় ভিলা বারেমির গোমর রক্ষা করছে ওরা। একেবারে অশিক্ষিত ওরা, জমি হারানোর ভয়ে জড়ো-সড়ো হয়ে আছে পুরো দুটো প্রজন্ম ধরে। বাকি দুনিয়ার কাছ থেকে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে এ-কারণেই।'

'ওই জমি কেড়ে নেবার মত কোনও আইন আছে বলে মনে হয় না আমার,' বলল রানা। 'কোনোকালেই ছিল না। কাউকে খুন করেনি ওরা, শুধু লাশ লুকিয়ে ফেলেছে—এটুকুই ওদের অপরাধ। গণহত্যার তথ্য গোপন করায় বড়জোর দু'চারজনের জেল হতে পারে... মানে, যদি কেউ এখনও বেঁচে থাকে আর কী।'

'কী বলছ! এতবড় একটা ষড়যন্ত্রে অংশ নিয়েছে ওরা... ঈশ্বরের চোখে ওটা কতবড় অপরাধ, তা জানো?'

'সেটা ভিন্ন আদালত,' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। প্রসঙ্গ বদলাল। 'আপনি এখানে ফিরে এসেছেন কবে?'

'অনেকদিন পর। একেবারে বুড়ো হয়ে... চোখের দৃষ্টি চলে যাবার পর।'

'কেন ফিরেছেন?'

'ফেরার মত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল বলে।'

'ওটা কোনও জবাব হলো না। আপনাকে আরেকটু ব্যাখ্যা করতে হবে। আপনাকে ওরা ফিরতে দিল কেন?'

'ভুল একটা ধারণা প্রচলিত আছে এলাকাবাসীর ভিতর। ওরা মনে করে, পাদ্রোনি আমাকে বাঁচতে দিয়েছিলেন—খুনোখুনি শুরু হবার আগেই আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন দূরে। আমাকে ওরা ভয় পায়... ঘৃণা করে। নিজেরা বলাবলি করে—আমাকে আসলে বাঁচিয়ে রেখেছেন স্বয়ং ঈশ্বর... ওদের পাপের স্মারক হিসেবে। ভিলা বারেমির অন্ধ রক্ষিতার মাধ্যমে তিনি ওদেরকে সেই কালো রাতের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন। বুঝতে পারছ ব্যাপারটা?

সর্বশক্তিমানের আশীর্বাদপুষ্ট মানুষ বলে ভাবে ওরা আমাকে... তাই কোনও ক্ষতি করার সাহস পায় না। এলাকায় ফিরতে চাইলে বাধা দেবে কীভাবে?'

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে কুয়াশা জিজ্ঞেস করল, 'কতটা ভয় করে ওরা আপনাকে? এই যে... ওদের গোমর ফাঁস করে দিলেন আমাদের কাছে... এটা জানার পরেও কি চুপ করে থাকবে ওরা?'

'মনে হয় না। তবে ভয়ের কিছু নেই। তোমরা যে আমার কাছে এসেছ, তা জানার উপায় নেই ওদের। জানলেই বা কী এসে-যায়? এমনিতেই আমার আয়ু ফুরিয়ে এসেছে, মৃত্যুকে দুটো দিন এগিয়ে আনার চেয়ে বেশি কিছু তো করার ক্ষমতা নেই ওদের।'

'এজন্যেই এত বছর পর মুখ খুললেন?'

'হ্যাঁ। মরতে চলেছি আমি, যাবার আগে কাউকে সব খুলে বলার ইচ্ছে ছিল। হয়তো কোনও বিচার পাবে না ভিলা বারেমিতে খুন হওয়া হতভাগ্য মানুষগুলো, কিন্তু বিবেকের তাড়না অগ্রাহ্য করতে পারছিলাম না। তাই গাঁয়ের বাজার থেকে ফিরে এসে সোনিয়া যখন জানাল, একজন মানুষ পাদ্রোনির ব্যাপারে খোঁজখবর নিচ্ছে নীচে, তখন ওকে তাড়াতাড়ি পাঠালাম তাকে ডেকে আনার জন্য।'

'কেন... তা বলেননি? এ-কাহিনি তো ওর মাধ্যমেও ফাঁস করতে পারতেন দুনিয়ার সামনে।'

'না! প্রশ্নই ওঠে না!' গলা একটু চড়ে গেল মারিয়া-র। 'বাচ্চা মেয়ে... ভিলা বারেমির গোমর জানার সঙ্গে সঙ্গে ওর একগাদা শত্রু সৃষ্টি হয়ে যাবে। কীভাবে বাঁচাবে ও নিজেকে? কথা দাও, সেনিয়র, কিছুতেই আমার নাতনিকে এর সঙ্গে জড়াবে না তোমরা।'

'একটুও চিন্তা করবেন না,' আশ্বস্ত করার সুরে বলল কুয়াশা। 'সোনিয়াকে বিপদে ফেলার কোনও ইচ্ছে নেই আমাদের। সেজন্যেই কাল রাতে ওকে কামরা থেকে চলে যাবার জন্য বলেছি।'

'ধন্যবাদ,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন বৃদ্ধা।

'কিন্তু এত বছর পর এ-সব কথা আমাদেরকে খুলে বললেন কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'শুধুই কি বিবেকের তাড়না? নাকি আরও কিছু আশা করছেন আপনি?'

'কী জানি!' কাঁধ ঝাঁকালেন মারিয়া। 'হয়তো চাইছি, লোকে কৌতূহলী হয়ে উঠুক। উত্তাল ঢেউয়ের তলায় উঁকি দিয়ে দেখুক, কীসে অশান্ত করে তুলছে পানিকে!'

'কাউন্সিল অভ ফেনিস?' ভুরু কোঁচকাল কুয়াশা। 'এখনও কীভাবে টিকে থাকে ওরা? কাউন্সিলের সদস্যরা যদি বেঁচে থাকেও... থাকার সম্ভাবনা খুবই কম... একেকজনের বয়স একশোর উপরে হয়ে যাবে।'

'ঠিক একই কথা আমিও ভেবেছি,' মাথা দোলালেন মারিয়া। 'কিন্তু তারপরেও ওদের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারছি না। রেডিওতে নিয়মিত খবর শুনি আমি, সেনিয়র। টের পাই, পাদ্রোনির ভবিষ্যদ্বাণী ফলতে শুরু করেছে। ধীরে ধীরে পুরো পৃথিবী তলিয়ে যাচ্ছে অশান্তি আর বিশৃঙ্খলার অতলে... ঠিক যেমনটা তিনি চেয়েছিলেন। এ কিছুতেই কাকতালীয় হতে পারে না, নিশ্চয়ই ফেনিসের হাত আছে। কিন্তু কীভাবে? ভেবে ভেবে হয়রান হচ্ছি, এমন অবস্থায় রেডিওতে একদিন একটা কণ্ঠ শুনলাম... শীতল কণ্ঠ, ঝোড়ো বাতাসের চেয়ে ভয়ানক এক কণ্ঠ... সে-কণ্ঠ আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে গেল বহু বছর আগে—ভিলা বারেমির সেই ঝুলবারান্দায়! মনে পড়ে গেল

পাদ্রোনি কী বলেছিলেন। *তোমরা, আর তোমাদের পরের প্রজন্মগুলো কাউন্সিল অভ ফেনিসের মাধ্যমে সে-কাজ করবে, যা আমার পক্ষে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়!'*

দম নেবার জন্য একটু থামলেন বৃদ্ধা। উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন তিনি। সুস্থির হয়ে বললেন, 'মানেটা বুঝতে পারছ তোমরা? আসল কাউন্সিল এখন আর নেই, কিন্তু তাদের পরের প্রজন্ম আছে। ওরাই চালিয়ে যাচ্ছে পাদ্রোনির কাজ... আর ওদেরকে নেতৃত্ব দিচ্ছে সেই মানুষ, যার কণ্ঠ ঝোড়ো বাতাসের চেয়ে ভয়ঙ্কর!'

আবারও থেমে গেলেন তিনি। শীর্ণ হাত বাড়িয়ে পাশ থেকে টেনে নিলেন নিজের ছড়ি, সেটায় ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'তালিকা... তালিকাটা তোমাদের দরকার হবে, সেনিয়র!'

'কীসের তালিকা?' জানতে চাইল রানা।

'ভিলা বারেমির অতিথিদের তালিকা। ভয়াল সে-রাতে আমার গাউনের পকেটে ছিল ওটা, অতিথিদের নাম-ঠিকানা মুখস্থ করার জন্য রেখেছিলাম সঙ্গে... পাদ্রোনিকে খুশি করবার জন্য। আজও ওটা আছে আমার কাছে, নষ্ট হতে দিইনি।' মেঝেতে ছড়ি ঠুকে ঠুকে দেয়ালের একটা শেলফের সামনে গেলেন বৃদ্ধা। নীচের তাক হাতড়ে একটা বয়াম নামালেন। সেটার মুখ খুলে ভিতর থেকে বের করে আনলেন এক টুকরো কাগজ—বয়সের ভারে হলুদ হয়ে গেছে। বাড়িয়ে ধরলেন রানা-কুয়াশার দিকে। 'এই নাও... এটা আজ থেকে তোমাদের। উনিশশো ছত্রিশের চৌঠা এপ্রিলে কারা এসেছিল আমার পাদ্রোনির সঙ্গে দেখা করতে, তা জানতে পারবে এ-থেকে।'

তড়াক করে লাফিয়ে উঠল দু'জনে। প্রায় ছুটে এসে কাগজটা

নিল রানা। বলল, 'দারুণ একটা কাজ করেছেন, ম্যা'ম।' ভাঁজ খুলে ভিতরের লেখাগুলো পড়ল ও, সঙ্গে সঙ্গে গম্ভীর হয়ে গেল।

'কী হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল কুয়াশা। 'নাম নেই ওতে?'

'আছে,' বলল রানা। 'স্প্যানিয়ার্ডের নামটা বাদ দেয়া যেতে পারে, কিন্তু বাকি চারটার মধ্যে দুটো নাম খুবই পরিচিত। এত বিখ্যাত মানুষ এঁরা... বিশ্বাস করা মুশকিল!'

'কই, দেখি?'

কুয়াশার হাতে কাগজটা দিল রানা। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ওর কপালেও ভ্রূকুটি দেখা দিল। বলল, 'অ্যানালাইজ করে দেখা দরকার—নামগুলো সত্যিই পঁচাত্তর বছর আগে লেখা কি না।'

'আমার তো মনে হচ্ছে না এতে কোনও কারসাজি আছে।'

'তাই বলে এমন দুজন মানুষ...'

'কোনও সমস্যা, সেনিয়র?' বলে উঠলেন মারিয়া।

'না, না, সমস্যা না,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'আসলে... এর মধ্যে দুটো নাম আমরা চিনতে পারছি। এঁরা খুবই বিখ্যাত মানুষ।'

'কিন্তু এদের কেউই আসল লোক নয়, সেনিয়র। সব তো বলেছি তোমাদেরকে—এরা আমার পাদ্রোনির শিষ্য। কিন্তু তাঁর উত্তরাধিকারী অন্য আরেকজন! সে-ই নিয়ন্ত্রণ করছে শিষ্যদেরকে... পথ দেখাচ্ছে।'

'কী বলছেন এসব! কে সে?'

জবাব দেবার সুযোগ পেলেন না মারিয়া। তার আগেই কুকুরটা গরগর করে উঠল। থমকে গেলেন তিনি। বসা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়াল কুকুরটা, অস্থির ভঙ্গিতে ছুটে গেল দরজার কাছে, গরগরানি থামেনি।

'দরজা খোলো!' চাপা গলায় হুকুম দিলেন বৃদ্ধা। 'তারপর

ডাকো আমার নাতনিকে। জলদি!'

'ক্... কী হয়েছে?' রানা বিস্মিত।

'একদল লোক আসছে এদিকে! ঢাল বেয়ে উঠে আসছে ওরা। উচেলো ওদের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে!'

দরজার দিকে ছুটে গেল কুয়াশা।

'কতদূরে ওরা?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'বেশিদূরে না। এসে পড়বে খুব শীঘ্রি।' বললেন বৃদ্ধা।

দরজা খুলে ডাক দিল কুয়াশা। 'সোনিয়া! তাড়াতাড়ি এখানে এসো!'

গরগরানি বেড়ে গেছে উচেলোর, রীতিমত দাঁত খিঁচাচ্ছে এখন। টান টান করে রেখেছে শরীর, শত্রুকে দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিচেনের কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেল রানা, একটা কাঁচা লেটুস পাতা নিল সবজির পাত্র থেকে, ওটাকে ভাঁজ করে ভিতরে লুকিয়ে ফেলল হলদেটে কাগজটা।

'এটা আমার পকেটে রাখছি,' কুয়াশাকে বলল ও।

'রাখো,' কুয়াশা বলল। 'নামগুলো মুখস্থ করে নিয়েছি আমি।'

দৌড়ে খোলা দরজা দিয়ে ভিতরে ঢুকল সোনিয়া। ডাক শুনেই ছুট লাগিয়েছে, ফিল্ড জ্যাকেটের বোতাম লাগাতে পারেনি ঠিকমত। তবে স্থূপো শটগানটা আনতে ভোলেনি। জ্যাকেটের দু'পাশের পকেটের ভিতর বেঢপভাবে ফুলে আছে রানা-কুয়াশার পিস্তল।

'কী ব্যাপার?' ভিতরে ঢুকেই জানতে চাইল সে।

'তোমার দাদী বলছে, একদল মানুষ আসছে এখানে। কুকুরটা ওদের আওয়াজ শুনতে পেয়েছে।' বলল কুয়াশা।

'ঢাল ধরে আসছে ওরা,' যোগ করলেন মারিয়া। 'বড়জোর নয়শ' কদম, তার বেশি না।'

'কেন আসছে এখানে?' সোনিয়া কিছু বুঝতে পারছে না। 'কী চায়?'

'গতকাল ওরা তোকে দেখতে পেয়েছিল? বা উচেলোকে?'

'দেখেছে তো নিশ্চয়ই, কিন্তু আমি কোনও কথা বলিনি। ওদের কাজে বাধাও দিইনি। তারপরেও কেন...'

'এর আগের দিনও দেখেছিল তোকে, তাই না?'

'হ্যাঁ। গাঁয়ের বাজারে গিয়েছিলাম জিনিসপত্র কিনতে।'

'ওখানেই খটকা লেগেছে ওদের,' বললেন মারিয়া। 'পর পর দু'দিন কেন গিয়েছিস নীচে? তা ছাড়া ওরা পাহাড়ি মানুষ... ট্র্যাকিঙে ওস্তাদ। নিশ্চয়ই মাটিতে তোদের তিনজনের পায়ের ছাপ দেখেছে। না, আর ঝুঁকি নেয়া যায় না। চলে যেতে হবে তোদের সবাইকে! দুই বিদেশি... সেইসঙ্গে তোকেও!'

'না, দাদী!' প্রতিবাদ করল সোনিয়া। 'তোমাকে ফেলে যাব না আমি। আসতে দাও ওদেরকে। বলব, বিদেশিরা আমার পিছু নিয়েছিল। এখানে এসেছিল বটে, কিন্তু তাড়িয়ে দিয়েছি আমরা ওদেরকে। কোনও কথা বলিনি।'

ওর কথা না শোনার ভান করলেন বৃদ্ধা। রানা-কুয়াশার দিকে ফিরলেন। 'যা খুঁজছিলে, তা পেয়ে গেছ। এখন আমার অনুরোধ রাখো। আমার নাতনিকে নিয়ে পালাও এখান থেকে।'

'আর আপনি?' বৃদ্ধাকে জিজ্ঞেস করল কুয়াশা।

'আমার জন্য ভেবো না। আমাকে ভয় পায় ওরা, কোনও ক্ষতি করবার সাহস পাবে না।'

মিথ্যে বলছেন বৃদ্ধা, কথা শুনেই বুঝতে পারল রানা-কুয়াশা। দ্বিধায় পড়ে গেল দু'জনে।

'প্লিজ... আমার কথা শোনো,' অনুনয় করলেন মারিয়া। 'আমার নাতনিকে বাঁচাও! সময় তো আমার এমনিতেই ফুরিয়ে

এসেছে, কিন্তু ওর সামনে সারাটা জীবন পড়ে আছে।'

'কী করবে?' রানাকে জিজ্ঞেস করল কুয়াশা।

'ওঁর কথা শোনা আমাদের কর্তব্য,' বলল রানা। পরমুহূর্তে ছোঁ মেরে শটগানটা কেড়ে নিল সোনিয়ার হাত থেকে।

'না!' চেঁচিয়ে উঠল সোনিয়া। ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল রানার উপরে, পারল না পিছন থেকে কুয়াশা ওকে জাপটে ধরে ফেলায়। জ্যাকেটের পকেট থেকে নিজেদের পিস্তলদুটোও বের করে নিল রানা। 'কী করছ তোমরা!'

'এ-সময়ে তোমার হাতে বন্দুক-পিস্তল থাকা ঠিক না,' রানা বলল। 'ঝামেলা কোরো না। দাদীর কথা শোনো। চলো আমাদের সঙ্গে।'

দরজার বাইরে গিয়ে ঘেউ ঘেউ শুরু করল উচেলো। দূর থেকে ভেসে আসছে মানুষের উত্তেজিত হৈচৈ। চেঁচামেচি করে ফার্মহাউসের উপর হামলা করার কথা বলছে তারা।

'যাও!' চেঁচালেন মারিয়া।

'এগোও!' ধাক্কা দিয়ে সোনিয়াকে হাঁটতে বাধ্য করল কুয়াশা।

'ওরা চলে যাবার পর আবার ফিরে আসব আমরা,' বৃদ্ধাকে বলল রানা।

'দরকার নেই, বাছা,' বললেন মারিয়া মাযোলা, 'আমার কথা শেষ। নামের তালিকাও দিয়েছি তোমাদেরকে। ওটার সাহায্যেই পাদ্রোনির শিষ্যদেরকে খুঁজে বের করতে পারবে তোমরা। তবে হ্যাঁ... যদি ফেনিসের শিকড় খুঁজে পেতে চাও, তা হলে শিষ্যদের পথ-প্রদর্শককেও খুঁজে বের করতে হবে তোমাদের।'

'কার কথা বলছেন?'

'ওই যে, যার কণ্ঠ ঝোড়ো বাতাসের চেয়ে ভয়ঙ্কর! বহু বছর আগে ভিলার উত্তরের বারান্দায় শুনেছিলাম সে-কণ্ঠ... আবার

শুনেছি কিছুদিন আগে। বয়স বেড়েছে, স্বর বদলেছে, কিন্তু বদলায়নি কথা বলার ভঙ্গি। আজও ওই কণ্ঠ সে-রাতের মতই নিষ্ঠুর... কর্তৃত্ব-ভরা!'

'আপনি কি বলতে চাইছেন...'

'হ্যাঁ,' বাধা দিয়ে বললেন অন্ধ মহিলা, 'আমি রাখালবালকের কথা বলছি। আজও বেঁচে আছে সে। সে-ই চালাচ্ছে পাদ্রোনির শিষ্যদেরকে। যাও, খুঁজে বের করো ওকে।'

সতেরো

ফার্মহাউস থেকে বেরিয়ে পিছনদিকে ছুটল তিনজনে। সবজি-খেত পেরিয়ে নেমে পড়ল ঢালে. লুকাল ঝোপঝাড়ের আড়ালে। কপাল ভাল, উল্টোদিকের ঢাল বেয়ে উঠতে থাকা লোকগুলোর মনোযোগ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে উচেলোর ক্রমাগত হুঙ্কারে। আবছাভাবে তর্কাতর্কি শুনতে পেল ওরা. কুকুরটাকে গুলি করবে কি না, তা নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেছে হামলাকারীরা। সুযোগ বুঝে তীক্ষ্ণস্বরে শিস দিয়ে উঠল সোনিয়া, উচেলো ছুটে চলে এল সে-ডাক শুনে। মাথায় হাত বুলিয়ে প্রাণীটাকে শান্ত করল মেয়েটা।

পাতার ফাঁক দিয়ে রুক্ষ চেহারার কয়েকজন লোককে মালভূমিতে উঠে আসতে দেখল রানা। সংখ্যায় আটজন... সবাই সশস্ত্র। ওর আর কুয়াশার পক্ষে এতজনকে ঘায়েল করা সম্ভব নয়। লুকিয়েই থাকতে হবে।

বৃদ্ধার কথাগুলো নিয়ে ভাবতে শুরু করল ও। রাখালবালককে খুঁজে বের করতে হবে, যার কণ্ঠ ঝোড়ো বাতাসের চেয়ে ভয়ঙ্কর! সত্যিই কি সেদিনের সেই কিশোর আজকের ফেনিসের নেতৃত্ব দিচ্ছে? বয়স অনেক হয়ে যাবার কথা... পঁচাশি-র কম নয়; বৃদ্ধের কণ্ঠের সঙ্গে বাচ্চা ছেলের কণ্ঠ কীভাবে মেলালেন মারিয়া মাযোলা? শুনেছেনও রেডিও-তে, সামনাসামনি নয়। ভুল করেননি তো?

একটা ব্যাপার পরিষ্কার, অন্ধ মহিলাটির সঙ্গে এখনও অনেক কথা বাকি রয়ে গেছে ওদের। জানতে হবে ঠিক করে, কোন্ রেডিও স্টেশনে শুনেছেন তিনি সে-কণ্ঠ। কী-ই বা বলছিল মানুষটা? যে-সে তো জাতীয় বেতারে কথা বলতে পারে না, নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কোনও মানুষ ওই বৃদ্ধ। পরিচয় কী তার?

অস্ত্র উঁচিয়ে ফার্মহাউসের দিকে এগোতে দেখা গেল কর্সিকানদেরকে। চারজন বাইরে রইল পাহারা দেবার জন্য, বাকিরা দরজা খুলে ঢুকে পড়ল ভিতরে। একটু পরেই শোনা গেল চেঁচামেচি। মারিয়া মাযোলা রাগী কণ্ঠে জিজ্ঞেস করছেন অনুপ্রবেশের কারণ, ক্ষিপ্ত স্বরে তার জবাব দিচ্ছে কর্সিকানরা। একটু পরেই শোনা গেল চড়-থাপ্পড়ের আওয়াজ, পিছু পিছু ব্যথায় চেঁচিয়ে উঠলেন বৃদ্ধা। ধীরে ধীরে আওয়াজের তীব্রতা বাড়ল।

ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে ঝোপের আড়াল থেকে উঠে দাঁড়াতে শুরু করল সোনিয়া, সুন্দর মুখটা রাগে লাল হয়ে গেছে। জ্যাকেট খামচে ধরে ওকে টানল কুয়াশা, বাধ্য করল বসে থাকতে। মেয়েটার গলা ফুলে উঠতে দেখল রানা, চেঁচাতে যাচ্ছে। পিছন থেকে ওকে জাপটে ধরল তাই, এক হাতে চেপে ধরল মুখ। যুঝতে শুরু করল সোনিয়া, কিন্তু একচুল আলগা হলো না রানার হাতের

বাঁধন।

'শান্ত থাকো!' চাপা গলায় ধমক দিল রানা। 'চেঁচালে কোনও লাভ হবে না তোমার দাদীর। মাঝখান থেকে ধরা পড়ে যাব আমরা।'

কথাটা কানেই তুলল না সোনিয়া, শরীর মোচড়াচ্ছে সে। ওর কাঁধে একটা হাত রাখল কুয়াশা। নরম গলায় বলল, 'প্লিজ, বুঝতে চেষ্টা করো। আমরা ধরা দিলেই যে তোমার দাদীকে ছেড়ে দেবে ওরা, এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। বরং সবাইকেই খুন করে রেখে যাবে ওরা।'

থেমে গেল সোনিয়া। চোখ পিটপিট করল, বুঝতে পেরেছে কুয়াশার যুক্তি। মুখের উপর থেকে হাত একটু সরাল রানা, কিন্তু পুরোপুরি নয়, খুলল না হাতের বাঁধনও।

'ওরা দাদীকে মারছে!' কাঁদো কাঁদো গলায় বলল মেয়েটা। 'অসহায়... অন্ধ একটা মানুষ... তারপরেও ওঁর গায়ে হাত তুলছে পিশাচগুলো। কিছু একটা করতে হবে আমাদেরকে।'

'এ-মুহূর্তে কিছুই করার নেই,' মাথা নাড়ল কুয়াশা। 'জমি হারানোর ভয়ে পাগল হয়ে গেছে মূর্খগুলো। ওদের মাথায় এখন কিচ্ছু ঢুকবে না।'

বিস্ময় ফুটল সোনিয়ার চোখে। 'জমি হারানোর ভয়! মানে?'

'এসব নিয়ে পরে কথা বলা যাবে,' রূঢ় কণ্ঠে বাধা দিল রানা। সন্দিহান হয়ে উঠেছে ও। বলল, 'ঝামেলা হয়েছে কোথাও। বাড়ির ভিতরে এতক্ষণ থাকার কথা না ওদের।'

'হয়তো আমাদের কোনও চিহ্ন খুঁজে পেয়েছে,' অনুমান করল কুয়াশা।

'মনে হয় না। কিছু ফেলে আসিনি আমরা।'

'তা হলে?'

কান পাতল রানা। ফার্মহাউসের ভিতর থেকে এখন আর চড়-থাপ্পড়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। তার বদলে নেমে এসেছে নীরবতা। একটাই অর্থ হতে পারে এর।

'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল রানা। 'কথা বলছেন উনি!'

'এতে সর্বনাশের কী আছে?' বলল সোনিয়া। 'যা খুশি বলুন... শয়তানগুলো দাদীর গায়ে আর হাত না তুললেই হয়!'

কুয়াশা ভুরু কোঁচকাল। 'কী ভাবছ তুমি, রানা?'

'মারিয়া চাইছেন না আমরা ফিরে যাই,' রানা বলল। 'ফিরে গেলে সোনিয়ার বিপদ হবে। তাই বন্ধ করে দিতে চাইছেন আমাদের ফেরার পথ। লোকগুলোকে বলে দিচ্ছেন, কী কথা হয়েছে আমাদের মধ্যে। এরপর নিশ্চয়ই ভুল পথে পাঠিয়ে দেবেন ওদের, যাতে আমাদেরকে আর খুঁজে না পায় ওরা।'

'সে তো ভাল কথা।'

'গড ড্যাম ইট, কুয়াশা! ওরা খুন করবে মহিলাকে!'

ঝট্ করে ফার্মহাউসের দিকে তাকাল কুয়াশা। এতক্ষণে বুঝতে পেরেছ মারিয়া মাযোলার উদ্দেশ্য। আত্মাহুতি দিচ্ছেন তিনি স্বেচ্ছায়... সোনিয়াকে বাঁচাবার জন্য। দাদী মারা গেলে এখানে থাকার আর বাধ্যবাধকতা থাকে না মেয়েটার... চলে যেতে পারবে ও—পাহাড়ের খুনে লোকজনের নাগালের বাইরে।

'ঠিকই বলেছ তুমি,' রানাকে বলল ও। 'ওদের গোমর ফাঁস করে দিয়ে মস্ত অন্যায় করেছেন ভদ্রমহিলা। কিছুতেই ওঁকে বাঁচতে দেবে না ওরা। উনিও তা-ই চাইছেন। নিজের জীবনের বদলে সোনিয়ার জীবন!'

লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। হাতে চলে এসেছে নিজের সিগ-সাওয়ার। 'ঠেকাতে হবে ওদেরকে,' উত্তেজিত গলায় বলল ও। 'কিছুতেই খুন হতে দেয়া যাবে না ভদ্রমহিলাকে। এখনও

অনেক কিছু জানার আছে আমাদের!'

সোনিয়া আর কুয়াশাও উঠে দাঁড়াল, ঝোপের আড়াল থেকে বেরিয়ে ছুটতে শুরু করল তিনজনে। কিন্তু কয়েক পা যাবার সঙ্গে সঙ্গে শোনা গেল শটগানের গগনবিদারী আওয়াজ, সেইসঙ্গে কারও মরণ-আর্তনাদ—দুটোই ভেসে এসেছে ফার্মহাউসের ভিতর থেকে। দাদীর অমঙ্গল আশঙ্কায় চেঁচিয়ে উঠতে চাইল সোনিয়া, কিন্তু ওকে সে-সুযোগ দিল না রানা, জাপটে ধরে ঝাঁপিয়ে পড়ল মাটিতে। পিছু পিছু কুয়াশা। মাটিতে পড়েই মেয়েটার মুখ আবার চেপে ধরল ও।

'প্লিজ, সোনিয়া... প্লিজ!' চুপ থাকার জন্য অনুরোধ করল রানা।

সারা শরীর থরথর করে কাঁপছে মেয়েটার, কথা শুনতে চাইল না। মুক্তি পাবার জন্য খামচি দিতে শুরু করল রানার হাতে।

'বেহুঁশ করে ফেলো!' চাপা গলায় বলে উঠল কুয়াশা।

'না, তার দরকার নেই।' ফার্মহাউসের দিকে ইশারা করল রানা। ভিতর থেকে বেরিয়ে এসেছে কর্সিকানরা। সত্যিই ভুল নির্দেশনা দিয়েছেন মারিয়া মাযোলা—ওদের দিকে না এসে মালভূমির দক্ষিণ ঢালের দিকে ছুটে চলে গেল ওরা। একটু পরেই হারিয়ে গেল দৃষ্টির আড়ালে।

সোনিয়াকে ছেড়ে দিল রানা। উঠে বসে ফুঁপিয়ে উঠল মেয়েটা। কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল, 'খুন করো ওদেরকে... খুন করো!'

'কী লাভ?' বলল কুয়াশা। 'ওদেরকে খুন করতে গেলে সময় নষ্ট হবে... নিজেরাই বরং ওদের ঘেরাওয়ের মধ্যে পড়ে যেতে পারি। তোমার দাদীর আত্মত্যাগ বৃথা হয়ে যাবে তাতে।'

'তা হলে কী করব আমরা?' কান্না আরও বেড়ে গেল

সোনিয়ার।

'উনি যা চেয়েছিলেন—তোমাকে বের করে নিয়ে যাব এখানকার মৃত্যুফাঁদ থেকে। তারপর খুঁজে বের করব এসবের পিছনে যারা জড়িত, তাদেরকে।'

কুকুরটা কিছুতেই ওদের সঙ্গে এল না, পরোয়াই করল না সোনিয়ার হুকুমের। ছুটে চলে গেল ফার্মহাউসের দিকে, ভিতরে ঢুকে অদ্ভুত এক সুরে কুঁই কুঁই করে উঠল। অবলা জানোয়ারটার বিষণ্ন সে-ডাকে ভারী হয়ে উঠল মালভূমির বাতাস।

'বিদায়, উচেলো,' হাহাকারের মত শোনাল সোনিয়ার কণ্ঠ। 'ভাল থাকিস। কথা দিচ্ছি, ফিরে আসব আমি তোর জন্য। যিশুর কিরে... আসব-ই! যখনই হোক না কেন!'

পাহাড়ি ঢাল ধরে নামতে শুরু করল তিনজনে। ঘুরপথে উত্তর-পশ্চিমে গেল—পোর্তো ভেচিয়ো থেকে দূরে সরে গেল যতটা পারে; এরপর আবার দক্ষিণমুখী ট্রেইল ধরে সেইন্ট লুসির দিকে এগোল। দুপুর নাগাদ ঝর্ণার পাড়ের পাইন গাছটার তলায় পৌঁছুল ওরা। গর্ত থেকে নিজের হ্যাভারস্যাক আর ডাফল ব্যাগ বের করে নিল রানা। তারপর আবার পথে নামল। খুব সতর্কভাবে এগোল ওরা, গাছপালার আড়ালে থাকল সবসময়। খোলা কোনও জায়গা পেরুতে হলে একে একে পেরোয়, কেউ যেন একসঙ্গে দেখতে না পায় তিনজনকে। পথে প্রয়োজন ছাড়া কথাই বলল না কেউ, কাউন্ট বারেমির এলাকা থেকে বেরিয়ে যাবার দিকে একমাত্র মনোযোগ।

অনবরত হাঁটায় ক্লান্তি এল ঠিকই, কিন্তু একদিক থেকে লাভও হলো। রানা লক্ষ করল, সোনিয়া কিছুটা শান্ত হয়ে এসেছে। সারা পৃথিবীতে মারিয়া মাযোলা ওর সবচেয়ে কাছের মানুষ ছিলেন,

তাঁর মৃত্যুটা বিশাল এক আঘাত। অপরিচিত মানুষের সান্ত্বনা কোনও কাজে আসত না, কিন্তু পথযাত্রার কারণে মন কিছুটা বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে ওর। ক্ষণে ক্ষণে দাদীর কথা ভেবে ফুঁপিয়ে উঠছে বটে, কিন্তু কোনও ধরনের পাগলামি করছে না। কথা শুনছে ওর আর কুয়াশার।

দিনের আলোয় মেয়েটাকে ভাল করে দেখল রানা। হাঁটাচলার ভঙ্গিই বলে দিচ্ছে—সভ্য-ভদ্র সমাজের মেয়ে ও, অশিক্ষিত পাহাড়িদের কেউ নয়। শটগান চালাতে জানে হয়তো, কিন্তু সত্যিকার ভায়োলেন্সের সঙ্গে পরিচয় নেই বেচারির। কে জানে, হয়তো ঝোঁকের মাথায় যোগ দিয়েছে কমিউনিস্টদের সঙ্গে; কিন্তু আদপে মোটেই বিপ্লবী নয়। সত্যি সত্যি কখনও আন্দোলনে নামলে টের পাবে এই বাস্তবতা।

হঠাৎ থেমে দাঁড়াল সোনিয়া, মনে হলো ভাবনাচিন্তা করে একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। রাগী গলায় বলল, 'না, পালাব না আমি। যা খুশি করো তোমরা, সেনিয়র, কিন্তু আমি ফিরে যাচ্ছি পোর্তো ভেচিয়োয়। ওখানে গিয়ে খুনিগুলোকে ফাঁসিতে ঝোলাব।'

'ভুল করতে যাচ্ছ,' শান্ত গলায় বলল কুয়াশা। 'অনেক কিছুই জানো না তুমি।'

'আমার দাদী খুন হয়েছে... এর বেশি কিছু জানার প্রয়োজন নেই আমার!'

'ব্যাপারটা এত সহজ নয়,' রানা বলল। 'কথা শোনো, পাহাড়ের লোকেরা এখন পাগলা কুকুর হয়ে আছে। যাকে পাবে তাকেই খুন করে ফেলবে। কিন্তু এই উন্মাদনা খুব বেশিদিন টিকবে না। কয়েকদিন কেটে যাবার পর শান্ত হয়ে পড়বে ওরা, ফিরে যাবে নিজেদের রোজকার স্বাভাবিক জীবনে... ভয় আর

আতঙ্কে জড়োসড়ো হয়ে। তার আগে কিছুতেই ওখানে ফেরা চলে না তোমার। বিচার-আচার যদি কিছু করতে চাও, তখন কোরো। তোমার দাদী এসব জানতেন, তাই জীবন দিয়েছেন নিজের, আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন তোমাকে, যাতে ততদিন তোমাকে নিরাপদে রাখি আমরা।'

'কিন্তু কেন? কে তোমরা? এক রাতের পরিচয়... তাতেই তোমাদের উপর এত বিশ্বাস সৃষ্টি হবে কেন দাদীর?'

'কারণ আমাদের পরিচয় জেনেছেন তিনি... বুঝতে পেরেছেন কেন এত ঝুঁকি নিয়ে তোমাদের এলাকায় এসেছি আমরা।'

'আমিও জানতে চাই। কী এক তালিকা আর রাখাল বালকের কথা বলছিলেন দাদী... সেগুলো কী?'

'এ-ব্যাপারে যত কম জানবে, ততই তোমার জন্য মঙ্গল, সোনিয়া। এর সঙ্গে কিছুতেই তোমাকে জড়াতে পারব না আমরা।'

রেগে গেল সোনিয়া। ফুঁসে উঠল ক্রুদ্ধ সিংহীর মত। 'জড়িয়ে তো গেছিই, সেনিয়র। আমার দাদী খুন হয়েছে! কেন... সেটা জানার অধিকার আছে আমার।'

ওর সঙ্গে কথায় না পেরে কাঁধ ঝাঁকাল রানা। সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে নীরবে সাহায্য চাইল। লক্ষ করেছে, ওদের মধ্যে কুয়াশাকে কিছুটা সমীহ করে মেয়েটা।

রানার ইশারা বুঝতে পেরে এক পা এগিয়ে এল কুয়াশা। বলল, 'ঠিক আছে, সোনিয়া। সব খুলে বলব তোমাকে... কিন্তু এখন নয়। কথা বলার মত পরিস্থিতি নেই এ-মুহূর্তে। যত দ্রুত সম্ভব এই এলাকা থেকে দূরে সরে যেতে হবে আমাদেরকে।'

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?' জানতে চাইল সোনিয়া।

'উপকূলের দিকে,' রানা জানাল। 'মুরাতো-য় থামব আমরা,

ওখানে আমার পরিচিত এক লোক থাকে। ওর সঙ্গে কথা বলার পর যদি বাস্তিয়া পৌঁছুতে পারি, দ্বীপ থেকে বেরিয়ে যেতে অসুবিধে হবে না।'

'ঠিক আছে, বাস্তিয়া পর্যন্ত যাব আমি,' বলল সোনিয়া। 'কিন্তু এরপর যদি সব কথা খুলে না বলো, এক পা-ও আর নড়াতে পারবে না আমাকে।'

গটমট করে হাঁটতে শুরু করল ও। পিছন থেকে কয়েক মুহূর্ত ওকে নীরবে দেখল কুয়াশা, তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'ভাল একটা ঝামেলা জুটল, তাই না?'

'কিছু করার ছিল না,' শ্রাগ করল রানা।

মেয়েটার পিছু পিছু হাঁটতে শুরু করল দু'জনে। কুয়াশা বলল, 'ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ঠিক করে নেয়া দরকার, রানা। অনেক কাজ হাতে, একসঙ্গে করতে গেলে সময় লাগবে প্রচুর। তারচেয়ে দু'জনে দু'দিকে গেলে ভাল হয়। কাজও এগোবে, একসঙ্গে দু'জনকে বাগেও পাবে না ফেনিস। যোগাযোগ রাখার জন্য শিডিউল আর পয়েন্ট অভ কণ্ট্যাক্ট ঠিক করে নিতে পারি আমরা এখুনি।'

'তাড়াহুড়োর কিছু নেই,' রানা বলল। 'এখান থেকে বাস্তিয়ার দূরত্ব প্রায় নব্বুই মাইল। কথা বলার অনেক সময় পাওয়া যাবে।'

'ওর সামনে কথা বলতে চাইছ না বুঝি?' ইশারায় সোনিয়াকে দেখাল কুয়াশা। 'যত যা-ই বলো, ও একটা বোঝা ছাড়া আর কিছু নয়। নিজেরা পালিয়ে বেড়াচ্ছি, এ অবস্থায় একটা মেয়ের দায়িত্ব নেব কী করে?'

'না নিয়ে উপায়ও নেই,' রানা বলল। 'অন্তত কর্সিকা থেকে বের করে নিয়ে যেতে হবে ওকে। এখানে থাকলে পাহাড়ি লোকজন ঠিকই খোঁজ বের করে ফেলবে ওর।'

'নাহয় নিলাম-ই দ্বীপের বাইরে। তারপর?'

'সেটা তখন দেখা যাবে।'

'দেখা যাবে মানে? কিছু ভাবছ না তুমি এ-ব্যাপারে? সত্যি করে বলো তো, মাথায় কী ঘুরপাক খাচ্ছে তোমার?'

'ছোট্ট একটা খটকা,' ঘাড় ফিরিয়ে কুয়াশার দিকে তাকাল রানা। 'প্রশ্নটা কিন্তু মন্দ করেনি সোনিয়া। মারিয়া মাযোলা কেন ওকে পাঠালেন আমাদের সঙ্গে? আমাদেরকে তো চিনতেন-ই না তিনি। যে-পরিচয় দিয়েছি, সেটা মিথ্যে হতে পারত। আমরা মন্দলোক হতে পারতাম...'

'ওই মুহূর্তে আর কেউ ছিল না তাঁর হাতের কাছে,' যুক্তি দেখাল কুয়াশা।

'ওটা কোনও কারণ হতে পারে না। এই পাহাড়-পর্বত আমাদের চেয়ে ভাল চেনে সোনিয়া। একাই পালাতে পারত ও।'

'ভাবছ কোনও রহস্য আছে এতে?'

'জানি না,' মাথা নাড়ল রানা। 'কিন্তু একটা জিনিস পরিষ্কার, সব প্রশ্নের জবাব না পাবার আগে কিছুতেই ওকে হাতছাড়া করা উচিত হবে না আমাদের।'

বাস্তিয়া থেকে প্রায় বিশ মাইল দক্ষিণে ভেসকোভাতো শহর, ওখানে এককালে বাস করেছে সোনিয়া, আশপাশের সমস্ত পথঘাট চেনে, লোকজনের দৃষ্টি এড়িয়ে রানা আর কুয়াশাকে সহজেই নিয়ে যেতে পারল শহরের কাছাকাছি। কোন্ পথে কীভাবে যাবে, তা মেয়েটাকে ঠিক করতে দিল ওরা—কিছুটা স্বাধীনতা পাক ও, নিজেকে তা হলে অচেনা দু'জন মানুষের হাতে বন্দি বলে মনে হবে না। সিদ্ধান্তটার সুফলও পাওয়া গেল—এমন সব গিরিবর্ত আর ভাঙাচোরা ট্রেইল ধরে এগোল মেয়েটা... ওসব পথে কখনও কেউ

আসা-যাওয়া করে বলে মনে হলো না। কেউ ওদেরকে দেখে ফেলার ভয় নেই।

'কনভেন্টের নান-রা পিকনিকের জন্য আমাদেরকে নিয়ে এসেছিল এখানে,' শুকিয়ে যাওয়া একটা ঝর্ণা দেখিয়ে বলল সোনিয়া। 'আগুন জ্বেলে রান্না করেছিলাম আমরা, জঙ্গলে ঢুকে চুরি করে সিগারেট টেনেছিলাম... আহ্, কী এক দিন ছিল সেটা!'

স্মৃতিচারণের ঝোঁক চেপেছে মেয়েটার মাথায়। আরেকটু এগোবার পর বলল, 'এদিককার পাহাড়ের মাঝ দিয়ে সকালবেলা চমৎকার বাতাস বয়ে যায়। যখন ছোট ছিলাম, প্রতি রোববার বাবা আমাদেরকে নিয়ে সকালবেলা ঘুড়ি ওড়াতেন।'

'আমরা?' জিজ্ঞেস করল কুয়াশা। 'তোমার আরও ভাই-বোন আছে?'

'এক ভাই আর এক বোন। দু'জনেই আমার বড়... এখনও ভেসকোভাতোয় থাকে। বিয়ে-শাদী করে পরিবার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ওরা, আজকাল বলতে গেলে দেখা-সাক্ষাৎই হয় না। ওদের ব্যাপারে বলার মত তেমন কিছু নেই।'

'এখনও এখানে পড়ে আছে কেন? লেখাপড়া করেছে কতদূর?'

'বেশি না, ওসবের প্রতি ঝোঁক ছিল না ওদের। সাদাসিধে টাইপের মানুষ—চাষবাদ আর সংসারধর্মই ওদের জন্য সব। ঝুটঝামেলা পছন্দ করে না। তবে আমরা সাহায্য চাইলে ফিরিয়ে দেবে না।'

'না, না,' তাড়াতাড়ি বলল রানা। 'সাহায্য চাওয়া তো দূরের কথা, দেখাই করার দরকার নেই।'

'ওরা আমার আপনজন, সেনিয়র। কেন এড়িয়ে যাব ওদেরকে?'

'এর দরকার আছে, সোনিয়া।'

'ওটা কোনও জবাব হলো না। দেখো সেনিয়র, আমার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছ তোমরা। জোর করে পোর্তো ভেচিয়ো থেকে সরিয়ে এনেছ, দাদীর খুনের বিচার পেতে দাওনি। এখন আবার বাধা দিতে চাইছ ভাই-বোনের সঙ্গে দেখা করবার ব্যাপারেও? তোমাদের এ-সব হুকুম মানতে রাজি নই আমি।'

অসহায় চোখে কুয়াশার দিকে তাকাল রানা। আবার মেয়েটা খেপে গেছে ওর উপর। কুয়াশা যদি বুঝিয়ে-সুজিয়ে শান্ত করতে পারে!

'কেউ তোমাকে হুকুম দিচ্ছে না, সোনিয়া,' নরম গলায় বলল কুয়াশা। 'যা বলছি, তা তোমার নিরাপত্তার জন্যই বলছি। বিশ্বাস করো!'

'আমার তা মনে হয় না। অন্ধ... অসহায়... নিরপরাধ একজন মহিলার খুনের ঘটনা ধামাচাপা দিতে চাইছ তোমরা। কেন?'

'বললাম তো, তোমাকে বাঁচাবার জন্য। যদি মুখ খোলো, ভয়ানক বিপদ ঘনিয়ে আসবে তোমার মাথার উপর... যাদের সঙ্গে কথা বলবে, তারাও পড়বে একই বিপদে। তা হতে দেয়া যায় না।'

'আমার দাদীকে খুন করা হয়েছে!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সোনিয়া।

'হ্যাঁ,' স্বীকার করল কুয়াশা। 'কিন্তু পুরো ব্যাপারটা শুধু এই একজনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে নয়। খুব খারাপ কিছু মানুষকে ঠেকাবার জন্য লড়াইয়ে নেমেছি আমরা, তোমার দাদী সাহায্য করেছেন আমাদেরকে। জীবন দিয়েছেন... বিনিময়ে চেয়েছেন তোমার নিরাপত্তা। কী করে সেটা অগ্রাহ্য করব আমরা, বলো?'

'কচি খুকির সঙ্গে কথা বলছ না তোমরা,' রাগতস্বরে বলল সোনিয়া। 'খুব খারাপ মানুষ বলতে কী বোঝাতে চাইছ? খুলে বলো আমাকে।'

চোখে চোখে কথা হলো রানা-কুয়াশার। দুজনেই বুঝতে পারছে, মেয়েটাকে অন্ধকারে রাখার উপায় নেই আর। পুরোটা না হোক, সামান্য হলেও আভাস দিতে হবে ওকে, নইলে ঝামেলা পাকাবে। তাই মুখ খুলল রানা।

'ওরা একদল খুনি, সোনিয়া,' বলল ও। 'দলটা কতবড়, তা জানি না; তবে এটুকু জানি, প্রচুর ক্ষমতা ওদের। আর দশটা সাধারণ খুনিও নয় এরা—মানুষ হত্যা করে নির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে... বাছাই করে। এর ফলে সংঘাত সৃষ্টি হয় দুনিয়ার আনাচে-কানাচে—ব্যক্তিগত সংঘাত, রাজনৈতিক সংঘাত এবং আন্তর্জাতিক সংঘাত! ওরা রয়ে যায় আড়ালে।' এটুকু বলে সোনিয়ার প্রতিক্রিয়া দেখল রানা—মনোযোগ দিয়ে কথা শুনছে মেয়েটা। 'তুমি শিক্ষিত, আধুনিক মেয়ে, সোনিয়া। আমার আর আমার বন্ধুর মধ্যকার সম্পর্কটার গুরুত্ব বুঝতে পারবে। মি. কুয়াশাকে আণ্ডারগ্রাউণ্ডের অত্যন্ত প্রতিভাবান এক ক্রিমিনাল বলতে পারো, সেই সঙ্গে প্রথম সারির একজন বিজ্ঞানী; আর আমি, মাসুদ রানা, আইনের লোক। তারপরেও পরস্পরবিরোধী আমরা একত্র হয়েছি ওই খুনিদেরকে ঠেকানোর জন্য। কারণ, গোটা পৃথিবীর জন্য ওরা এত ভয়ঙ্কর হুমকি যে, তার সামনে আমাদের দু'জনের বিভেদটা মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়। জটিল এক ষড়যন্ত্র এঁটেছে ওরা, সেটা বানচাল করতে না পারলে দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে যুদ্ধ-বিগ্রহ আর অরাজকতার কবলে পড়ে।'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রানার মুখভঙ্গি লক্ষ করল সোনিয়া। সন্তুষ্ট হয়ে বলল, 'সত্যি কথা বলার জন্য ধন্যবাদ, সেনিয়র রানা। কিন্তু এসবের সঙ্গে আমার দাদীর কী সম্পর্ক?'

'ষড়যন্ত্রটার যখন সূচনা ঘটে, সেখানে উপস্থিত ছিলেন তিনি,' বলল রানা। 'প্রায় পঁচাত্তর-বছর আগে... ভিলা বারেমিতে।'

'পঁচাত্তর বছর আগে!' অবাক হয়ে গেল সোনিয়া। 'তোমরা বলতে চাইছ, এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে দাদীর পাদ্রোনি... মানে কাউন্ট গিলবার্তো জড়িত?'

'শুধু জড়িত না, পুরোটাই তাঁর উর্বর মস্তিষ্কের ফসল। অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং ক্ষমতাবান লোক ছিলেন তিনি, ফ্রান্স আর ইংল্যাণ্ডে তাঁর সমকক্ষ আর কেউ ছিল না। দেশদুটোর ব্যবসায়ীদের নানাভাবে হেনস্থা করেছেন, তাই সরকারের সঙ্গে জোট বেঁধে ব্যবসায়ীরা তাঁর পতন ঘটায়... খুন করে তাঁর দুই ছেলেকে। এর ফলে পাগল হয়ে যান তিনি, আত্মহত্যা করেন। কিন্তু মরার আগে প্রতিশোধ নেবার জন্য দীর্ঘমেয়াদী এক পরিকল্পনা তৈরি করে রেখে যান একদল শিষ্যের কাছে। *কাউন্সিল অভ ফেনিস* নাম নিয়ে এরপর থেকে খুনোখুনির ব্যবসায় নামে ওরা। মাঝে বহু বছরের জন্য আণ্ডারগ্রাউণ্ডে চলে গিয়েছিল, কিন্তু এখন আবার ফিরে এসেছে—আগের চেয়ে ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে। যেভাবে এগোচ্ছে, তাতে কাউন্ট বারেমির ইচ্ছে পূর্ণ হতে দেরি নেই আর। চরম সর্বনাশ ঘটে যাবার আগেই ঠেকাতে হবে ওদেরকে।' এটুকু বলে থেমে গেল রানা, প্রয়োজনের তুলনায় বেশিই বলে ফেলেছে। 'যতকিছু তোমার পক্ষে বোঝা সম্ভব, তা আমি খুলে বললাম, সোনিয়া। ভুল বুঝো না, তোমার দাদীর ব্যাপারে সত্যিই দুঃখিত আমরা। ওঁর খুনিদের শাস্তি চাও তুমি... আমরাও চাই। আশা করি একদিন তা হবেও। কিন্তু এ-মুহূর্তে পাহাড়ি কিছু মূর্খ লোককে শায়েস্তা করার চেয়ে অনেক জরুরি কাজ আছে আমাদের হাতে।'

কয়েক মুহূর্ত নীরব রইল সোনিয়া। একটু পর মাথা তুলে সরাসরি তাকাল রানার দিকে। 'ওদের কোনও গুরুত্ব নেই তোমাদের কাছে... তারমানে আমারও গুরুত্ব নেই, তাই না?'

'আমি তা বলিনি।'

'ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা কোরো না, সেনিয়র। বুঝতে পারছি, কী করছ তোমরা... কার কাছ থেকে কী তথ্য পাচ্ছ, তা জানতে দিতে চাও না কাউকে। এজন্যেই দাদীর ব্যাপারে কাউকে কিছু বলতে দিচ্ছ না আমাকে। তাতে তোমাদের খবর ফাঁস হয়ে যাবে। যদি কথা না শুনি, হয়তো চিরতরে চুপ করাবে আমাকে!'

'এসব তোমার ভুল ধারণা। তবে হ্যাঁ, এ-মুহূর্তে তোমাকে ছাড়তে পারব না আমরা।'

'তারমানে আমি তোমাদের বন্দি?'

'মোটেই না,' বলে উঠল কুয়াশা। 'বরং আমাদের মত তুমিও একই পথের পথিক। ফেনিসের খবর জেনে ফেলায় আমার আর রানার নামে মৃত্যু-পরোয়ানা জারি হয়েছে... অনেকটা তোমারই মত। আমাদের সঙ্গে থাকলেই তোমার জন্য ভাল হবে।'

'সাহস জোগাচ্ছ, নাকি হুমকি দিচ্ছ তুমি, সেনিয়র?' ফুঁসে উঠল সোনিয়া।

মেজাজ খিঁচড়ে গেল রানার। এতক্ষণ বোঝানোর পরেও যদি এমন আচরণ করে কেউ, মাথা ঠাণ্ডা রাখা মুশকিল। রূঢ় কণ্ঠে বলল, 'যা খুশি ভাবতে পারো। কিন্তু আমাদের সঙ্গে থাকছ তুমি।'

'কতদিন... বা কতটা সময়, সেনিয়র? আমাকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত কী করবে তোমরা?'

'এখুনি ওসব বলতে পারছি না। সময় এলে দেখা যাবে,' বলল কুয়াশা। 'আপাতত বাস্তিয়া পর্যন্ত চলো.... আর আস্থা রাখো আমাদের উপর। নিশ্চিত থাকতে পারো, আমাদের হাতে তোমার কোনও ক্ষতি হবে না।'

হতাশায় মাটিতে পা ঠুকল সোনিয়া। কুয়াশার কথা বিশ্বাস করেনি ও।

আঠারো

মুরাতো-য় রানার পরিচিত লোকটা ইটালিয়ান, নাম সালভাতর মাযিনি—বাস্তিয়ার বেশ কিছু ফিশিং বোটের মালিক। তবে তলে তলে সে আসলে আমেরিকার বেতনভুক ইনফর্মার। ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় আশপাশের দেশগুলোর নৌ-কার্যক্রমের উপর নজর রাখে, সেসবের রিপোর্ট পাঠায় ওয়াশিংটনে। বেশ ক'বছর আগেই ওর এই গোমর জানতে পেরেছে রানা, কিন্তু সেটা ফাঁস করেনি। বরং ওকে নিজস্ব কাজে ব্যবহার করছে প্রয়োজনমাফিক। মাযিনিও নিজের কাভার অক্ষুণ্ণ রাখার স্বার্থে সাহায্য করে আসছে ওকে... বলা বাহুল্য, খুশিমনে নয়। আজও তার ব্যতিক্রম ঘটল না।

সরাসরি দেখা করল না রানা, মুরাতো-র একটা দোকান থেকে প্রথমে ফোন করল লোকটাকে। জানাল কী চায়। ওর কণ্ঠ চিনতে পেরেই চেহারায় চরম বিতৃষ্ণা ফুটল মাযিনির। আজকের পরিস্থিতি অতীতের যে-কোনও সময়ের চেয়ে গুরুতর। ইতোমধ্যে আমেরিকায় রানার নামে জারি হওয়া হুলিয়ার খবর পেয়ে গেছে সে, পুরস্কারের অঙ্কটাও জানতে পেরেছে। এ-সময় ওর সঙ্গে নিজেকে জড়ানো মানেই বিপদ।

কিছুটা সময়ের জন্য লোভ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল মাযিনির ভিতর। ইচ্ছে হলো ওর সিআইএ কন্ট্যাক্টের সঙ্গে যোগাযোগ করে রানাকে ধরিয়ে দিতে। কিন্তু বাস্তববাদী লোক সে, ক্ষণিকের

প্রলোভনকে এড়াতে জানে। তা ছাড়া এক অর্থে ওর পেটে ছুরি ঠেকাল রানা... মধু মাখানো ছুরি! হুমকি দিল, যদি রানার অনুরোধ না রাখে, তা হলে ওর সত্যিকার পরিচয় ফাঁস করে দেয়া হবে। তার অর্থ একটাই—নিশ্চিত মৃত্যু। ওর মত দু'মুখো সাপকে বাঁচতে দেবে না কেউ। এর সঙ্গে মধুটা হলো—কথা শুনলে দশ হাজার ডলার পাবে সে। সাত-পাঁচ ভেবে দেখল মাযিনি—রানাকে ধরিয়ে দেয়ার পুরস্কারের তুলনায় কম হলেও, হাজারদশেক ডলার একেবারে ফেলনা নয়। অন্তত ওটা খরচ করার জন্য জ্যান্ত থাকবে সে। রাজি হয়ে গেল প্রস্তাবে।

সূর্যাস্তের খানিক আগে নিজের ওয়্যারহাউসের সামনে পৌঁছুল মাযিনি, দরজা খুলে ঢুকে পড়ল ভিতরে। প্রথমে ছোপ ছোপ অন্ধকার ছাড়া কিছুই দৃষ্টিগোচর হলো না, হাঁটতে হাঁটতে পিছনের দেয়ালের কাছে গিয়ে থামল সে, হেলান দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল রানার জন্য। দেখতে না পেলেও বুঝতে পারছে, বাঙালি এজেন্ট আশপাশেই কোথাও আছে। পকেট থেকে একটা সিগারেট বের করে মুখে ঝোলাল মাযিনি, দেশলাই দিয়ে আগুন জ্বালতে গিয়ে লক্ষ করল, হাত কাঁপছে। রানার মুখোমুখি হলেই নার্ভাসনেস গ্রাস করে তাকে।

'তুমি ঘামছ, মাযিনি!' বাঁ-দিকের অন্ধকার থেকে গম গম করে উঠল পরিচিত কণ্ঠ। 'দেশলাইয়ের আলোয় তোমার মুখ চকচক করছে। আশা করি কোনও দুঃসংবাদ নিয়ে আসোনি?'

চমকে উঠল মাযিনি, মুখ থেকে খসে পড়ে গেল সিগারেট। তবে এক মুহূর্ত পরেই সামলে নিল নিজেকে। কণ্ঠে মধু মিলিয়ে বলল, 'রানা! মাই ফ্রেণ্ড! তোমার গলা শুনতে পেয়ে কী যে ভাল লাগছে...'

ছায়া থেকে আবছা আলোর মাঝে বেরিয়ে এল রানা।

কাঠখোট্টা গলায় বলল, 'আমি তোমার বন্ধু নই... ছিলামও না কখনও। কাজের কথা বলো।'

'সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। তোমাকে শুধু বাস্তিয়ার সাত নম্বর পিয়ারে গিয়ে আমার নাম বলতে হবে। তা হলেই একটা ট্রলার তোমাকে ভোরের আলো ফোটার আগে লিভোর্নোয় পৌঁছে দেবে।'

ট্রলারের নরমাল রুট ওটা?'

'উঁহুঁ। সাধারণত পিয়োম্বিনোয় যায় ওটা। তবে তোমার জন্য বাড়তি ফুয়েলের কোনও চার্জ ধরব না আমি। লোকসান যা হবার আমার হোক।'

'এত দিলদরিয়া হলে কবে থেকে?' ভুরু কোঁচকাল রানা।

হেঃ হেঃ করে হাসল মাযিনি। 'তোমার মত বন্ধুর জন্য একটু যদি উদার হতে না পারি...'

'ধন্যবাদ,' বাধা দিয়ে বলল রানা। পকেট থেকে ডলারের একটা বাণ্ডিল বের করল। 'তবে প্ল্যানে একটু রদবদল হবে। একা নই, আমার সঙ্গে আরও লোক যাচ্ছে। একটার জায়গায় দুটো ট্রলার চাই আমার, আর চাই দুটো স্পিডবোট। একটায় আমি উঠব, অন্যটায় আমার বন্ধু। ট্রলারদুটো অপেক্ষা করবে উপকূল থেকে দু'মাইল দূরে, সাগরের মাঝখানে। পিয়ার থেকে স্পিডবোটে চড়ে ওগুলোয় যাব আমরা, এরপর একটা ট্রলার যাবে উত্তরে, অন্যটা দক্ষিণে। ঠিক কোথায় যাবে, তা আমরা ট্রলারে ওঠার পর জানাব।'

'অনেক বেশি ঝামেলা হয়ে যাচ্ছে,' কাঁচুমাচু শোনাল মাযিনির গলা। 'এতসব সতর্কতার দরকার নেই। আমি কথা দিচ্ছি...'

'তোমার মুখের কথায় আমার চারআনাও বিশ্বাস নেই, মাযিনি!'

মুখ কালো হয়ে গেল মাযিনির। 'বেশ, তোমার কথাই সই।

কিন্তু যা চাইছ, তার জন্য খরচাপাতি অনেক বেড়ে যাবে আমার।'

'বাড়তি টাকা চাইছ, এই তো?'

'ব্যাপারটা তুমি বুঝতে পারছ দেখে ভাল লাগছে।'

'তা তো বুঝিই!' বাণ্ডিল থেকে কয়েকটা নোট আলাদা করল রানা। 'তোমার কীর্তিকলাপের ব্যাপারে মুখে তালা এঁটে রাখছি আমি—প্রতিদান হিসেবে ওটুকুই যথেষ্ট হওয়া উচিত। তারপরেও... আপাতত এই পাঁচ হাজার ডলার রাখো।'

'রানা... বন্ধু আমার... তুমি বলেছিলে দশ হাজার!' প্রতিবাদ করে উঠল মাযিনি। 'পাঁচ হাজারে তো আমার দুই ট্রলার আর দুই স্পিডবোটের ফুয়েলের খরচও মিটবে না। ক্রু-দেরকে টাকা দেব কোত্থেকে? আমার ভাগের কথা নাহয় বাদ-ই দিলাম।'

'পুরোটা অ্যাডভান্স দেব, এমন কথা তো বলিনি। অর্ধেকটা পাওনা থাকুক... মানে, বাড়তি খরচ ছাড়া আর কী। ওটা কত দিতে হবে?'

'খরচের ব্যাপারে তোমার তো আইডিয়া থাকার কথা। সবকিছুর দাম যেভাবে বাড়ছে...'

'পনেরো পার্সেন্ট হলে চলবে?'

'অন্য কেউ হলে রাজি হতাম না, তবে তোমার কথা আলাদা।'

'শুনে খুশি হলাম। তা হলে বাড়তি দেড় হাজার, আর অরিজিন্যাল পাঁচ... মোট সাড়ে ছ'হাজার ডলার পাওনা রইল তোমার।'

'মরে যাব, বন্ধু!' আকুতি ঝরাল মাযিনি। 'এখন যদি টাকা না দাও, পরে কোত্থেকে পাব? এখান থেকে বেরিয়ে তুমি তো দুনিয়ার আরেক প্রান্তে চলে যাবে... খোঁজও পাওয়া যাবে না তোমার।'

'এত অস্থির হবার কিছু নেই,' আশ্বস্ত করল রানা। 'তোমার টাকা মেরে দেবার কোনও ইচ্ছে নেই আমার। সাড়ে ছ'হাজার

ডলার আমি তোমার ট্রলারে রেখে যাব... কোন্‌টায়, তা এখুনি বলছি না। দুটোতেই তল্লাশি চালাতে হবে তোমাকে। ফরওয়ার্ড বাল্ক হেডের তলায়, সেণ্টার-স্ট্রাটের ডানে, ডেকের তক্তার নীচে থাকবে টাকাটা। সহজেই খুঁজে পাবে।'

'গুড গড! আমি কেন... বোটের ক্রু-রাও তো খুঁজে পাবে!'

'ওরা খুঁজতে যাবে কেন? আমি তো কাউকে বলে-কয়ে লুকাতে যাচ্ছি না টাকা।'

'তাও ব্যাপারটা বড্ড রিস্কি হয়ে যায়। আমার ক্রু-দেরকে তুমি তো চেনো না। টাকার গন্ধ পেলে আপন মায়ের পেটেও ছুরি ঢোকাতে পারে ওরা। প্লিজ রানা... একটু ভাবো আমার দিকটা!'

'খামোকাই চিন্তা করছ তুমি, মাযিনি। ট্রলারদুটো হারবারে ফিরলেই টাকাটা বের করে নিয়ো। যদি না পাও, খোঁজ নিয়ে দেখো, ক্রু-দের মধ্যে কার একটা হাত উড়ে গেছে।'

'ডলারগুলোর সঙ্গে বুবি-ট্র্যাপ থাকবে?' হতভম্ব গলায় জানতে চাইল মাযিনি।

'ছোট একটা প্লাস্টিক চার্জ,' জানাল রানা। 'একটা সেট-স্ক্রু লাগানো থাকবে পাশে—তুমি দেখেছ আগে। ওটা খুলে নিয়ো, তা হলেই আর ভয় নেই।'

তিক্ততা জমল মাযিনির চেহারায়—রানার কৌশল ধরতে পেরেছে। ট্রলারে থাকবে টাকা, কাজেই জলযানদুটোর উপর কোনও ধরনের ঝুঁকি নিতে পারবে না সে। সাহস করবে না কাউকে খবর দিতে, তাতে লড়াই বাধার... এবং ট্রলারের ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। ওগুলো যখন হারবারে ফিরবে, ততক্ষণে স্পিডবোট নিয়ে রানা পগার পার হয়ে যাবে। বুদ্ধি বটে বাঙালিটার! হতাশ হয়ে মেনে নিল পরাজয়।

'ঠিক আছে,' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'আজকের রাতের সিগনাল কী

হবে?'

'সিম্পল—পর পর দু'বার আলো জ্বালতে বোলো তোমার লোকজনকে। সাড়া না পেলে কয়েক মিনিট পর, আবার। যতক্ষণ ট্রলার না থামছে, আলো জ্বেলে যেতে হবে ওদেরকে, যেন স্পিডবোট নিয়ে মাঝ-সাগরে বিপদে পড়েছে।'

'আচ্ছা, বলে দেব,' রুমাল বের করে মুখের ঘাম মুছল মাযিনি। 'আর কিছু?'

'উঁহুঁ। তুমি যেতে পারো।'

হাঁটতে শুরু করল মাযিনি, ওয়্যারহাউসের দরজার কাছে পৌঁছে ঘাড় ফেরাল ক্ষণিকের জন্য। রানা আবার মিলিয়ে গেছে অন্ধকারে।

পুরো দু'দিন হলো রানা-কুয়াশার সঙ্গে আছে সোনিয়া, কিন্তু এখনও মেয়েটাকে পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারছে না ওরা। একটা সিদ্ধান্তে আসা দরকার ওর ব্যাপারে, অথচ পারছে না। কী যেন একটা লুকাচ্ছে সোনিয়া, সেটা জানার আগে ওকে হাতছাড়াও করা চলে না। কর্সিকা থেকে বেরুবার পর নিঃসন্দেহে মুক্তি চাইবে ও, ঠেকাবে কী করে? ভাবনা-চিন্তা করে প্রস্তাব দিল রানা, একটা কাজ দেয়া হোক ওকে; সেই কাজের ছুতোয় বাধ্য করবে সোনিয়াকে ওদের সঙ্গে থাকতে। কী কাজ—জানতে চাইল কুয়াশা। জবাবে রানা মেয়েটাকে ওদের দু'জনের মধ্যকার কণ্ট্যাক্ট হিসেবে ব্যবহার করতে চাইল। আলাদা হয়ে যাবার পর সরাসরি যোগাযোগ রাখা ওদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ, মিডল-পারসন ব্যবহার করতে পারলে ভাল হয়। তা ছাড়া ওদের একজনের কাভার হবার জন্যও বলা যায় ওকে—শত্রুরা দু'জন পুরুষকে খুঁজছে, কোনও জুটিকে নয়। এতে ব্যস্ত রাখা যাবে সোনিয়াকে, ওদের সঙ্গে থাকার একটা যুক্তিও

দেখানো যাবে। প্রস্তাবটা ভাল, স্বীকার করল কুয়াশা; কথা হলো, ওকে সঙ্গে রাখা কতখানি নিরাপদ। সন্দেহ নেই, বিরূপ পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হবে ওদেরকে পদে পদে, তার মাঝে যদি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে মেয়েটা, মহা-বিপদ দেখা দেবে ওর সঙ্গীর জন্য।

এখন পর্যন্ত অবশ্য উদ্বিগ্ন হবার মত কোনও আচরণ করেনি সোনিয়া। রানা-কুয়াশার কথা শুনছে বাধ্য মেয়ের মত। বাস্তিয়াতে নিয়ে এসেছে কোনও ধরনের ঝুট-ঝামেলা ছাড়া। মুরাতো ছাড়ার পরে হাঁটতেও হয়নি ওদেরকে, রাস্তার ধারে হাত তুলে একটা লক্কড়-মার্কা বাস থামিয়েছে ও—দুই সঙ্গীকে নিয়ে উঠে বসেছে তাতে। সামনের দিকের একটা সিটে সোনিয়াকে নিয়ে বসেছে কুয়াশা, রানা বসেছে পিছনে—একা।

বাস্তিয়ায় পৌঁছুনোর পর রাস্তার ভিড়ের মাঝে মিশে গেল ওরা, এগোল ওঅটরফ্রন্টের একটা মদ্যশালার দিকে। জঘন্য এক জায়গা, রানা গেছে আগে, ভদ্রলোকেরা কখনও পা ফেলে না ওখানে। রাত পর্যন্ত গা-ঢাকা দিয়ে থাকার জন্য চমৎকার। ওদের খোঁজে কেউ মদ্যশালায় ঢুকলেই স্পট করা যাবে।

ভিতরে ঢুকে সোনিয়াকে আলাদা একটা টেবিলে বসাল ওরা, রানা-কুয়াশা বসল একসঙ্গে—একান্তে কথা বলার জন্য। আড়চোখে নজর রাখল সঙ্গিনীর উপর। দেখা যাক, মাতাল প্রণয়প্রার্থীদেরকে কীভাবে সামলায় ও। এ এক ধরনের পরীক্ষা। ফিল্ডে ওর উপর কতখানি আস্থা রাখা যায়, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

উইস্কির অর্ডার দিয়ে রানার দিকে ফিরল কুয়াশা। 'কী বুঝছ?'

'শিয়োর না,' রানা বলল। 'নিজেকে গুটিয়ে রেখেছে মেয়েটা, খোলস থেকে কিছুতেই বের করতে পারছি না ওকে।'

'খামোকাই হয়তো সন্দেহ করছ,' কুয়াশা বলল। 'মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে আছে ও, এ-অবস্থায় স্বাভাবিক আচরণ আশা করা যায় না কারও কাছ থেকে।'

'মানসিক এই যন্ত্রণা নিয়েই আমার খটকা। দাদী মারা যাবার আগে থেকেই মনে হয় শুরু হয়েছে ওটা। সভ্যজগৎ ছেড়ে পোর্তো ভেচিয়োর পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছিল কেন? শুধুই কি দাদীর সঙ্গে সময় কাটানোর জন্য? আমার বিশ্বাস হয় না।'

'অনেকভাবেই ব্যাখ্যা করা যায় সেটার। পুরো ইটালি জুড়ে অর্থনৈতিক মন্দা চলছে, চাকরি-বাকরি নেই কোথাও। কাজ না থাকলে পেটে খাবার জুটবে কোত্থেকে? তাই হয়তো দাদীর কাছে গিয়েছিল। অথবা কাউকে ভালবেসে ধোঁকাও খেতে পারে। ঘটতে পারে অনেক কিছুই।'

'অস্বীকার করছি না। কিন্তু এ-রকম আচরণ করলে কারও উপর বিশ্বাস রাখা একটু মুশকিল হয়ে যায় না?'

'দাদীর খুনিদেরকে শাস্তি দিতে চায় ও। আমার তো মনে হয়, দলে ভেড়ানোর জন্য এটুকুই যথেষ্ট।'

'উঁহুঁ। ওকে কনভিন্স করতে হবে, পাহাড়ি অধিবাসীদের সঙ্গে ফেনিসের কানেকশন আছে।'

'তা তো করেইছি আমরা!'

'ওই সময় ওর মাথার ঠিক ছিল না। কী বলেছি না বলেছি... এখন যদি পরোয়া না করে? ঠাণ্ডা মাথায় সব বোঝাতে হবে ওকে।'

'বোঝাও। মানা করছে কে?'

ভুরু কোঁচকাল রানা। 'আমি?'

'আর কে?' হাসল কুয়াশা। 'যদ্দূর জানি, মেয়ে পটানোর ব্যাপারে তুমি একটা প্রতিভা।'

'ঠাট্টা করছেন?'

জবাব না দিয়ে মাথা ঘোরাল কুয়াশা। টলতে টলতে মাঝবয়েসী এক লোক এগিয়ে এসেছে সোনিয়ার দিকে। ক্ষণিকের জন্য জ্বলে উঠল মেয়েটা, ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিল ব্যাটাকে।

'ইম্প্রেসিভ!' মন্তব্য করল কুয়াশা। 'আগুনের টুকরো বললে ভুল হয় না। ওকে তোমারই সামলাতে হবে, রানা। এমন মেয়েকে নিয়ে ঘুরতে পারব না আমি।'

'বেশ, ও আমার সঙ্গে যাবে... মানে, যদি রাজি করাতে পারি আর কী।' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'তার আগে আমাদের কাজ ভাগ করে নেয়া দরকার।' পকেট থেকে মারিয়া মাযোলার দেয়া কাগজটা বের করে আনল ও। ভাঁজ করে মেলে ধরল টেবিলের উপর।

'কাউন্ট পালমিরো বিয়াঞ্চি, রোম,' পড়ল কুয়াশা। 'স্যর নাথান উইটিংহ্যাম, লণ্ডন, ইংল্যাণ্ড; প্রিন্স আলেক্সেই ভারাকিন, সেইন্ট পিটার্সবার্গ, রাশা; সেনিয়র হুয়ান গার্সিয়া, মাদ্রিদ, স্পেন; ডেভিড ম্যাহোনি, ম্যাসাচুসেটস্, আমেরিকা। এর মধ্যে স্প্যানিশ ভদ্রলোককে খুন করেছিল কাউন্ট বারেমি, কাউন্সিলে যোগ দেয়নি সে। বাকি চারজন হয়েছিল ফেনিসের কর্ণধার। এখন ওদের কেউ বেঁচে আছে কি না সন্দেহ। তবে অন্তত দু'জনের বংশধর অত্যন্ত বিখ্যাত মানুষ। নাইজেল উইটিংহ্যাম—ব্রিটেনের ফরেন সেক্রেটারি; আর ডেভিড ম্যাহোনি দ্য থার্ড... ম্যাসাচুসেটস্-এর সিনেটর। ওদেরকে চেপে ধরা দরকার।'

'এখুনি না,' রানা মাথা নাড়ল। 'এ-দু'জনের ব্যাপারে জানি আমরা, কিন্তু বাকিরা? তাদের বংশধর কারা? কোথায় আছে এ-মুহূর্তে? যদি কোনও চমক থাকে এর ভিতর, সেটা আগেভাগেই জেনে নেয়া দরকার। তা ছাড়া... মাত্র দু'জনের ভিতর সীমাবদ্ধ নয় ফেনিস। এমনও হতে পারে, নাইজেল উইটিংহ্যাম আর ডেভিড

ম্যাহোনি হয়তো কিছুই জানেন না ফেনিস সম্পর্কে।'

'এ-কথা বলছ কেন?' ভ্রূকুটি করল কুয়াশা।

'কারণ এঁদের মত মানুষ কোনও গুপ্তসংঘের সদস্য হবেন বলে বিশ্বাস হয় না। উইটিংহ্যামকে নিষ্কলুষ মানুষ বলে জানে সবাই—যৌবনে সেনাবাহিনীর কমাণ্ডো ছিলেন, বহুবার দেশের জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়েছেন, প্রচুর পদকও পেয়েছেন সে-কারণে। সত্যিকার বীরযোদ্ধা। ফরেন অফিসেও তাঁর রেকর্ড তুলনাহীন। কৌশলী, বুদ্ধিমান... আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। অত্যন্ত শান্তশিষ্ট স্বভাবের। তাঁর প্রোফাইলের সঙ্গে ফেনিসের কানেকশন একেবারেই মেলে না।'

'আর ম্যাহোনি?'

'বস্টনের ব্রাহ্মণ পরিবার বলতে পারেন ওদেরকে। কিন্তু কুলীন সমাজের বেড়া ভেঙে বেরিয়ে এসেছেন ম্যাহোনি; হয়ে উঠেছেন দরিদ্র, খেটে খাওয়া মানুষের ত্রাতা। রাজনীতির ঘোড়ায় চড়া আধুনিক এক নাইট বলা যায় তাঁকে, সবার ধারণা—আগামী বছরের নির্বাচনে জয়ী হয়ে হোয়াইট হাউসে বসতে চলেছেন তিনি।'

'ফেনিসের লক্ষ্য অর্জনের জন্য এরচেয়ে ভাল পজিশন আর কী হতে পারে?'

'তা হলে বলতেই হয়, এত বছর ধরে দারুণ এক কাভার মেইনটেন করছেন দু'জনে। ঘটনা যা-ই হোক, এরা কোথাও পালিয়ে যাচ্ছে না।'

'ঠিক আছে, রোম আর সেইন্ট পিটার্সবার্গ... মানে, লেনিনগ্রাদ থেকে শুরু করা যাক। বিয়াঞ্চি আর ভারাকিনের বংশধরকে খুঁজে বের করব আমরা।'

'ওরাই সব নয়। মারিয়া মাযোলা বলেছিলেন, ওদেরকে

নিয়ন্ত্রণ করছে আরেকজন।'

'যার কণ্ঠ ঝোড়ো বাতাসের চেয়ে ভয়ঙ্কর,' বিড়বিড় করল কুয়াশা। 'রাখাল বালক?'

'এখন আর বালক নেই সে,' বলল রানা। 'কী পরিচয় নিয়েছে, কে জানে!'

'শিষ্যদের পরিবার দিয়েই শুরু করব আমরা। ঠিকমত এগোতে পারলে নিশ্চয়ই খোঁজ পাওয়া যাবে ওই রাখাল বালক... থুড়ি, রাখাল বুড়োর!'

'রাশায় যেতে পারবেন আপনি? লেনিনগ্রাদে?'

'পারব। ব্যবস্থা করা আছে আমার... হেলসিঙ্কি হয়ে ঢুকতে অসুবিধে হবে না।'

'ভাল। হেলসিঙ্কিতে কোথায় উঠবেন?'

'টাভাস্টিয়ান হোটেলে।'

'আমি যোগাযোগ করব ওখানে। কী নাম বলব?'

'আমার আসল নাম... মনসুর আলী। সরোদশিল্পী হিসেবে ওখানকার লোকে চেনে আমাকে।'

'আসুন তা হলে, আমাদের কোড ঠিক করে নিই,' বলতে বলতে সোনিয়ার দিকে তাকাল রানা। মোটামুটি ভদ্র চেহারার এক বাস্তিয়ান নাবিকের সঙ্গে কথা বলছে মেয়েটা। বুদ্ধিমতী... বার বার খেপে গেলে যে লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করা হবে, তা বুঝতে পেরেছে। মুখে হালকা হাসি ফুটিয়ে আলাপ চালিয়ে যাচ্ছে সে, সাবধানে বজায় রাখছে দূরত্ব, নাবিক যাতে বেশি অগ্রসর হতে না পারে। আচরণে এক ধরনের আভিজাত্য প্রকাশ পাচ্ছে ওর।

'কী ভাবছ?' জিজ্ঞেস করল কুয়াশা। 'ওকে বশে রাখতে পারবে?'

'খুব শীঘ্রি সেটা জানতে পারব আমরা,' মৃদুগলায় বলল রানা।

উনিশ

ইটালিয়ান উপকূলের দিকে ধীরগতিতে এগোচ্ছে ট্রলার। সাগর উত্তাল, ঢেউয়ের সঙ্গে অবিরাম যুদ্ধ করছে ছোট জলযান। বাস্তিয়া থেকে রওনা হবার পর কেটে গেছে পুরো সতেরো ঘণ্টা। সন্ধ্যা নামতে দেরি নেই। সূর্য ডুবে গেলেই একটা লাইফবোটে করে নামিয়ে দেয়া হবে রানা আর সোনিয়াকে, ওটাই তীরে নিয়ে যাবে ওদেরকে।

শ্লথগতির এই যাত্রায় একটা লাভ হয়েছে রানার—যথেষ্ট সময় পেয়েছে সোনিয়ার সঙ্গে সখ্য গড়বার, ওর ব্যাপারে জানবার। ইতোমধ্যে জানা হয়ে গেছে, সোনিয়ার পিতা... পিয়েরে মাযোলা... ছিলেন নাবিক, ফ্রেঞ্চ মেইনল্যাণ্ডে গিয়ে প্রেমে পড়েছিলেন ওর ফরাসি মায়ের। পরে বিয়ে করে ফিরে এসেছিলেন কর্সিকায়; থিতু হয়েছিলেন ভেসকোভাতোয়।

'তা হলে তুমি কনভেন্ট স্কুলে ফ্রেঞ্চ শিখেছ কেন?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছে রানা। 'মায়ের কাছ থেকেই তো শিখতে পারতে।'

'পারতাম, কিন্তু শিখিনি,' হাসতে হাসতে বলেছে সোনিয়া। 'বাবার ইটালিয়ান নিয়ে সারাক্ষণ খোঁটা দিতেন মা, তাই ওঁকে রাগাবার জন্য স্কুলে গিয়ে ফ্রেঞ্চ ক্লাস করেছি।'

অদ্ভুত এক পরিবর্তন এসেছে মেয়েটার ভিতর—পোর্তো ভেচিয়োর কথা যেন ভুলেই গেছে। হাসছে সারাক্ষণ এটা-সেটা

নিয়ে। কৃত্রিম নয়, সত্যিকার হাসি—ওর আনন্দে উচ্ছল চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় সেটা। বিশ্বাস করা মুশকিল, এই মেয়েই কর্সিকার পাহাড়ে কী কঠোর রূপ নিয়ে হাজির হয়েছিল ওর আর কুয়াশার সামনে, ওদেরকে হুমকি দিচ্ছিল লুপো শটগান হাতে নিয়ে।

'তুমি বন্দুক চালাতে শিখেছ কোথায়?' একসময় প্রশ্ন করল রানা।

'কী আর বলব! একটা বয়সে মানুষ খানিকটা পাগল হয়ে যায় না? আমিও হয়েছিলাম—ভাবতাম, ভায়োলেন্স ছাড়া সমাজকে বদলাবার কোনও উপায় নেই। *ব্রিগেট রোজ*-এর বদমাশগুলো সেই সুযোগ নেয়, আমাকে ভর্তি করে নেয় ওদের দলে...'

'ব্রিগেট রোজ!' চমকে উঠল রানা। 'কী সর্বনাশ! তুমি রেড ব্রিগেডে ছিলে?'

মাথা ঝাঁকাল সোনিয়া। 'মেডিসিনা-য় ওদের একটা ক্যাম্পে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়েছি আমি—অস্ত্র চালাতে শিখেছি, দেয়াল বাইতে শিখেছি; কীভাবে বেআইনী জিনিসপত্র পাচার করতে হয়, তা শিখেছি... অবশ্য কোনোটাতেই খুব একটা ভাল করতে পারিনি। ধীরে ধীরে ঝোঁক কেটে যেতে শুরু করল। এরপর একদিন একটা ছেলে... আমারই মত নতুন এক রিক্রুট... মারা পড়ল ক্যাম্পে। ক্যাম্প লিডার বলল, ট্রেইনিং অ্যাকসিডেন্ট; আসলে তা নয়। কোনও ধরনের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা ছাড়া ছুরি-বন্দুক হাতে মানুষকে ছেড়ে দিলে এসব তো ঘটবেই! আমার কোলে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল ছেলেটা, ক্ষত থেকে রক্ত পড়ছিল অনবরত, আতঙ্ক আর দুঃখ ভর করেছিল ওর দু'চোখে। কিচ্ছু করতে পারিনি ওর জন্য। সহ্য হয়নি সে-কষ্ট। বুঝতে পেরেছিলাম, অস্ত্রের ভাষা শিখতে পারব না আমি

কোনোদিন। সে-রাতেই ক্যাম্প থেকে পালিয়ে আসি।'

'সেদিন রাতে লুপো হাতে পাহাড়ে যে-ভাবে কথা বলছিলে, তাতে তোমাকে এতটা নরম বলে মনে হয়নি আমার কাছে,' রানা মন্তব্য করল ।

'ওটা অভিনয় ছিল, সেনিয়র,' বলল সোনিয়া। 'অন্ধকারে আমার চোখ দেখতে পাওনি, তা হলেই বুঝে ফেলতে সব।'

কথাটা বিশ্বাস করল রানা।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সোনিয়া। তারপর বলল, 'একটা ব্যাপারে এখনও আমাদের মধ্যে ফয়সালা হয়নি, সেনিয়র।'

'কীসের কথা বলছ?' জানতে চাইল রানা।

'আমার ভবিষ্যৎ। কর্সিকা থেকে বেরিয়ে এসেছি, এবার কী করবে তুমি আমাকে নিয়ে?'

'তোমার কী ধারণা?' পাল্টা প্রশ্ন করল রানা।

'জানি না। কিন্তু এখন পর্যন্ত তোমাদের সব কথা শুনেছি আমি, পালাইনি। এখনও যদি আমাকে বিশ্বাস করতে না পারো...'

'পালাওনি কেন?' বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করল রানা।

'ভয়ে। তোমরা দুই বন্ধু মোটেই সাধারণ মানুষ নও। আচার-আচরণে ভদ্রলোক, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু দু'জনের ভিতরেই নিষ্ঠুরতার আভাস পেয়েছি আমি।'

'তাতেই বাধা পেয়েছ?'

'হ্যাঁ। মনে হচ্ছিল পালাবার চেষ্টা করলেই তোমার বন্ধু আমাকে গুলি করে মারবে।'

'ওটা তোমার মনের ভুল। আমাদের সঙ্গে তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিলে।'

'এখনও কি আমি নিরাপদ? যদি কথা দিই, কাউকে কিছু বলব না, তা হলে তুমি আমাকে যেতে দেবে?'

'কোথায় যাবে?'

'বোলোগনা। ওখানে কাজ জুটিয়ে নিতে পারব আমি।'

'কী ধরনের কাজ?'

'উল্লেখ করার কিছু না। ইউনিভার্সিটির রিসার্চার হিসেবে যোগ দিতে পারব। আগেও করেছি ও-কাজ। বইপত্র ঘেঁটেঘুঁটে প্রফেসরদের জন্য বিভিন্ন তথ্য জোগাড় করতে হয়, ওঁরা সেসব থেকে নিজেদের আর্টিকেল তৈরি করেন।'

'রিসার্চার?' মুচকি হাসল রানা। 'বেতন কেমন পাও?'

'চলে যায় কোনোমতে। কিন্তু ওসব নিয়ে তোমার মাথাব্যথা কীসের? আমাকে বোলোগনায় যেতে দেবে কি না বলো।'

'বুঝতে পারছি, বেতন ভাল না। ও-পেশায় ফিরে যাবার দরকার কী?'

'কাজটা আমার পছন্দের,' জবাব দিল সোনিয়া। 'তা ছাড়া বাঁধাধরা রুটিন অনুসরণ করতে হয় না। যখন খুশি কাজ করলাম, যখন খুশি অন্য কিছু নিয়ে মেতে রইলাম।'

'মানেটা দাঁড়াচ্ছে, তুমি একজন স্বাধীন ফ্রিল্যান্সার, খেয়াল-খুশিমত ব্যবসা করছ,' বাঁকা সুরে বলল রানা। 'পুঁজিবাদের মূলে কিন্তু ওটাই!'

'ফালতু কথা বলছ তুমি!' তেতে উঠল সোনিয়া। 'আমার প্রশ্নকে এড়িয়ে যাচ্ছ বার বার।'

'কী প্রশ্ন?'

'আমাকে তুমি যেতে দেবে কি না? বিশ্বাস করবে আমাকে, নাকি তোমার অসতর্কতার জন্য তক্কে তক্কে থাকতে হবে... যাতে পালাতে পারি?'

'ও-ধরনের চেষ্টা না করাই উচিত হবে,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'শোনো, তোমাকে আমি অবিশ্বাস করি না। কিন্তু একটু

আগেই তো বললে, এখন পর্যন্ত প্যলাবার চেষ্টা করোনি প্রাণের ভয়ে; তারমানে আমাদের উপর একবারও আস্থা রাখোনি তুমি... থেকেছ শুধুই ভয় পাবার কারণে। এখন নিজেই বলো, ছাড়া পাবার পর যে মুখ বন্ধ রাখবে, সে-ব্যাপারে আমি নিশ্চিত হব কীভাবে? আমার উপর আস্থা রাখোনি তুমি... আমি কী করে আস্থা রাখব তোমার উপরে?'

ক্ষণিকের জন্য মুখের ভাষা হারাল সোনিয়া। নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইল ডেকের দিকে—ট্রলারের নাবিকরা লাইফবোট নামানোর তোড়জোড় শুরু করেছে। একটু পর ও বলল, 'তারমানে কি তীরে পৌঁছে আমাকে খুন করবে তুমি? ওটা ছাড়া তো আমার মুখ বন্ধ রাখার আর কোনও উপায় নেই।'

'বাজে কথা বোলো না। অমন ধারণা মাথায় এল কেন তোমার?'

'আর কী বিকল্প আছে আমার?'

'আমি তোমাকে একটা কাজ দিতে চাই।'

'তোমার কাছে কাজ চাই না আমি, সেনিয়র। শুধু মুক্তি চাই!'

'সময় এলে তা-ও পাবে।'

লাইফবোট নামিয়ে ফেলেছে নাবিকরা। ডাফল ব্যাগ আর হ্যাভারস্যাক নিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। হাত বাড়িয়ে দিল সোনিয়ার দিকে। 'চলো, যাবার সময় হয়েছে।'

হাত ধরল না সোনিয়া। উঠে দাঁড়াল, কিন্তু রানার দিকে ফিরেও তাকাল না।

তীরে নেমেই একটা ট্যাক্সি ভাড়া করল রানা, রোমে যাবে। দূরের গন্তব্যের কথা শুনে ড্রাইভার শুরুতে একটু গাঁইগুঁই করছিল, কিন্তু ওর হাতে ডলারের তাড়া দেখতে পেয়ে মত পাল্টাল। পথে একটা

খাবারের দোকানের সামনে পনেরো মিনিটের বিরতি নিল ওরা, ডিনার সারল, তারপর আবার উঠে পড়ল ট্যাক্সিতে। রাত আটটা বাজার খানিক আগে পৌঁছে গেল রাজধানীর উপকণ্ঠে। রাস্তাঘাটে তখনও মানুষের ভিড়, দোকানপাটে চলছে শেষ মুহূর্তের কেনাবেচা।

'গাড়ি থামাও,' পোশাকের একটা দোকান দেখতে পেয়ে ড্রাইভারকে বলল রানা। 'ইঞ্জিন বন্ধ কোরো না, আমি যাব আর আসব।'

'কোথায় যাচ্ছ?' জানতে চাইল সোনিয়া।

'তোমার জন্য কাপড় কিনতে,' ইশারায় ওর পরনের ফিল্ড জ্যাকেট আর ট্রাউজার দেখাল রানা। 'এ পোশাকে ভাল কোনও দোকানে ঢুকতে পারবে না।'

পাঁচ মিনিট পরেই ফিরে এল ও। হাতের ব্যাগে ডেনিম স্ল্যাকস্, সাদা ব্লাউজ আর একটা উলের সোয়েটার। সোনিয়ার হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'সাইজ-টা আন্দাজ করে নিতে হয়েছে। একটু এদিক-ওদিক হলে কিছু মনে কোরো না। চটপট পরে ফেলো এগুলো।'

'এখানে?' চোখ কপালে তুলল সোনিয়া। 'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?'

'লজ্জা-শরমের কথা ভুলে যাও কিছুক্ষণের জন্য,' বলল রানা। 'আমি অন্যদিকে তাকাচ্ছি। হাতে সময় নেই, দোকানপাট বন্ধ হয়ে যাবার আগেই তোমাকে নিয়ে কেনাকাটা সারতে হবে আমাকে। এগুলোয় হবে না, আরও জামাকাপড় দরকার তোমার।' ড্রাইভারের দিকে ফিরল, রিয়ারভিউ মিররে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে সে। 'অ্যাই, গাড়ি চালাতে শুরু করো!' ধমকে উঠল ও। 'আবার যদি পিছনে তাকাতে দেখি, চোখ গেলে দেব।'

ব্যতিব্যস্ত হয়ে ট্যাক্সিকে আগে বাড়াল ড্রাইভার। ডাফল ব্যাগ থেকে একটা জ্যাকেট বের করে গায়ে চড়াল রানা, জানালা দিয়ে চোখ ফেরাল বাইরে। পাশে সোনিয়াও দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে কাপড় বদলাতে শুরু করেছে। খাকি ট্রাউজার খুলে ফেলে ডেনিম পরল, চকিতের জন্য চোখের কোণ দিয়ে ওর সুগঠিত পা-জোড়া দেখতে পেল রানা; নিজেকে সংবরণ করার জন্য বন্ধ করে ফেলল দু'চোখ।

ফিল্ড-জ্যাকেট আর শার্ট খুলে ব্লাউজ পরল সোনিয়া, উপরে সোয়েটার। বলল, 'এবার মাথা ঘোরাতে পারো, সেনিয়র।'

সোজা হয়ে মেয়েটার দিকে তাকাল রানা। ঢোক গিলল সঙ্গে সঙ্গে। নতুন পোশাকে আবেদন বেড়ে গেছে সোনিয়ার। সোয়েটার একটু আঁটসাঁট হয়েছে, উঁচু হয়ে আছে যুগল স্তন। চোখ আটকে যাচ্ছিল ওদিকে, নীরবে নিজেকে শাসন করে দৃষ্টি তুলল উপরদিকে।

'দ্যাটস্ বেটার,' বলল ও। 'এখন আর পাহাড়ি মেয়ের মত লাগছে না তোমাকে।'

'শুনে খুশি হলাম। কিন্তু তোমার পছন্দ ভাল না। আমি হলে এ-পোশাক কিছুতেই কিনতাম না।'

'ইচ্ছে হলে ঘণ্টাখানেক পরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ো এগুলো... অন্য পোশাক কেনা হয়ে গেলে।' ড্রাইভারের দিকে ফিরল রানা। 'ভিয়া কণ্ডোত্তি-তে চলো। ওখানেই ভাড়া মিটিয়ে তোমাকে ছেড়ে দেব আমরা।'

ভিয়া কণ্ডোত্তি-র ক্লোদিং স্টোর-টা বিশাল, একেবারে প্রথম শ্রেণীর। ধনী ক্রেতা ছাড়া আর কারও আনাগোনা নেই ওখানে। বলা বাহুল্য, এমন দোকানে আগে কখনও পা রাখেনি সোনিয়া; তারপরেও ভিতরে ঢুকে নিজেকে সংযত রাখল ও। প্রশংসনীয় একটা গুণ,

শিরায় বইতে থাকা অভিজাত রক্তের প্রমাণ। বাস্তিয়ার মদ্যশালায় এই আভিজাত্যই লক্ষ করেছে রানা।

সিল্কের একটা ড্রেস, সেইসঙ্গে চওড়া ব্রিমের একটা সাদা হ্যাট আর হাই হিল জুতো পছন্দ করল সোনিয়া। ফিটিং রুমে ঢুকে পরল ওগুলো। বেরিয়ে এসে রানাকে জিজ্ঞেস করল, 'কেমন লাগছে?'

'খুব সুন্দর!' ওর দিকে তাকিয়ে হৃৎস্পন্দন দ্রুততর হয়ে গেল রানার।

'তা তো বটেই। কিন্তু দাম দেখেছ? এই টাকা দিয়ে পোর্তো ভেচিয়োর এক পরিবারের পুরো মাস চলে যাবে। না বাবা, এত দামি কাপড়চোপড়ের দরকার নেই। চলো অন্য কোথাও যাই।'

'ঘোরাঘুরির সময় নেই। আরও দু'চারটে ড্রেস বাছাই করো... আর আণ্ডারওয়্যার। তারপর আবার তোমার জন্য ব্রাশ-টুথপেস্ট, মেকআপ, চিরুনি... এসব কিনতে যেতে হবে। তাড়াতাড়ি করো।'

'তাই বলে এত খরচ করবে?'

'খরচ নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। জলদি হাত-পা চালাও।'

কেনাকাটা শেষে ভিয়া সিস্টিনার একটা বুদ থেকে পিয়াৎজা নাভোনা-র এক রুমিং হাউসে ফোন করল রানা, কামরা চাইল। ওখানকার বৃদ্ধ বাড়িঅলা আর তাঁর স্ত্রী ওর পূর্ব-পরিচিত। রোমে এলে মাঝে মাঝে ওখানে ওঠে রানা। জায়গাটা জনবহুল, লোকের ভিড়ে মিশে যাবার জন্য আদর্শ। বার্নিনি ফাউণ্টেইন নামে একটা ঝর্ণা আছে ওখানে; রোমের সাধারণ জনতা, এবং ট্যুরিস্টদের ভিড় লেগেই থাকে সবসময়। প্রচুর আউটডোর ক্যাফে আছে, যে-কোনও একটায় বসে সহজেই নজর রাখা যায় চারপাশে। এ-মুহূর্তে অমন জায়গাই দরকার ওর।

আধঘণ্টার মধ্যে পিয়াৎজা নাভোনায় পৌঁছুল রানা-সোনিয়া।

কামরা পর্যন্ত বাড়িঅলা নিজেই নিয়ে গেল ওদেরকে। ভিতরে ঢুকে তার হাতে খুচরো কিছু টাকা গুঁজে দিল রানা, বিদায় দিয়ে বন্ধ করল দরজা।

কামরার ভিতর নজর বোলাচ্ছে সোনিয়া। বিল্ডিংটা পুরনো, ছাত তাই অনেক উঁচুতে। জানালাগুলোও অনেক বড়, খুললে তিনতলা নীচে পিয়াৎজা-র চত্বরের পুরোটা দৃষ্টিগোচর হয়।

দেয়ালের পাশে ঠেস দেয়া সোফায় বসে পড়ল রানা। বিছানার দিকে ইশারা করে সোনিয়াকে বলল, 'সারাদিনে অনেক ধকল গেছে। শুয়ে পড়ো। বিশ্রাম দরকার আমাদের।'

কথাটা সোনিয়ার কানে গেছে বলে মনে হলো না। শপিং ব্যাগ থেকে সিল্কের ড্রেসটা বের করে নাড়াচাড়া করছে ও। জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, আমাকে এত দামি জামাকাপড় কিনে দিলে কেন তুমি?'

'আগামীকাল কয়েক জায়গায় যাব আমরা,' বলল রানা। 'তাই ভাল পোশাক দরকার হবে তোমার।'

'নিশ্চয়ই বড়লোকী ক্লাব-ট্লাব বা হোটেলের কথা বলছ?'

'ঠিক তা না। কয়েকজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে আমাকে। তুমি সঙ্গে থাকলে ভাল হয়।'

'কারণ যা-ই হোক, ধন্যবাদ। এত সুন্দর জামা আগে কোনোদিন পরিনি আমি।'

'ও কিছু না। সুন্দর মেয়েদের তো সুন্দর পোশাক-ই পরা উচিত।'

অযাচিত প্রশংসা পেয়ে গাল একটু গোলাপি হয়ে উঠল সোনিয়ার। প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্য বলল, 'তুমি কোথায় শোবে?'

'কিচ্ছু ভেবো না, আমি খাঁটি ভদ্রলোক,' সোফার উপর চাপড় দিল রানা। 'আমার জন্য এটাই কাফি।'

বাথরুমে চলে গেল সোনিয়া, পোশাক পাল্টাবে। জুতো-মোজা খুলে রানা আধশোয়া হলো সোফায়।

'বাতি নিভিয়ে দেব?' বাথরুম থেকে বেরিয়ে জিজ্ঞেস করল সোনিয়া।

'দাও।'

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে অন্ধকারে ডুবে গেল কামরা। কাপড়ের খসখসানি শুনল রানা, বিছানায় উঠে পড়েছে সোনিয়া।

'সোনিয়া?' কিছুক্ষণ পর ডাকল ও।

'বলো, সেনিয়র।'

'একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'কী কথা?'

'বোলোগনা ছেড়ে কর্সিকায় গিয়েছিলে কেন তুমি?'

'কেন জানতে চাইছ?'

'স্রেফ কৌতূহল, আর কিছু না।'

'বলেছি তো, দাদীকে সঙ্গ দেবার জন্য। কেন, তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'উঁহুঁ। আমার ধারণা, আরও কোনও কারণ আছে। পাহাড়ি ওই এলাকা গা-ঢাকা দেবার জন্য আদর্শ। তুমি কি লুকিয়ে থাকার চেষ্টা করছিলে?'

'যদি করিও, তাতে তোমার কী আসে-যায়?'

'অনেক কিছুই আসে-যায়,' গলার স্বর কঠিন হলো রানার। 'তোমার দায়িত্ব এখন আমার কাঁধে। যদি কোনও সমস্যা থাকে, সেটা খুলে বলতে হবে তোমাকে, যাতে বিপদ মোকাবেলার জন্য তৈরি থাকতে পারি আমি।'

'চুপ করো!' হিসিয়ে উঠল সোনিয়া। উঠে বসল বিছানায়। 'সেধে আমার দায়িত্ব নিয়েছ তুমি! আমি তো চলেই যেতে

চেয়েছি!'

'কোথায় যাবে?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'বোলোগনার ব্যাপারে যা শুনিয়েছ, তা মিথ্যে। কিছুতেই ওখানে যাবে না তুমি—আমি তা বুঝতে পেরেছি। কিন্তু কেন?'

'এসব নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই না আমি!' গলার স্বর ভেঙে গেল সোনিয়ার, ফুঁপিয়ে উঠল।

সোফা ছেড়ে বিছানার দিকে এগোল রানা। কাছে গিয়ে হাত রাখল মেয়েটার কাঁধে। নরম গলায় বলল, 'সব খুলে বলো আমাকে। মন হালকা হবে।'

ভেজা চোখে ওর দিকে তাকাল সোনিয়া। জানালা গলে আসা ম্লান আলোয় চিকচিক করছে ওর গাল বেয়ে নেমে আসা অশ্রু। কয়েক মুহূর্ত নিষ্পলক তাকিয়ে থাকল, তারপর হঠাৎই যেন অনুভব করল, সামনে দাঁড়িয়ে থাকা যুবকটির উপর আস্থা রাখা যেতে পারে। ওকে বিশ্বাস করলে ঠকতে হবে না।

বিছানা থেকে নামল সোনিয়া, জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। রানার দিকে পিঠ রেখে বলল, 'বেশ, সব বলছি তোমাকে। বোলোগনায় আমি ফিরতে পারব না, এ-কথাটা ঠিক নয়। পারব... সত্যি বলতে কী, ফিরতে আমাকে হবেই। নইলে ওরাই আমাকে খুঁজে বের করবে।'

'কারা?'

'রেড ব্রিগেডের লোকেরা। ওদের ফাঁকি দিয়ে কেউ বাঁচতে পারে না।'

'ভয়টা অমূলক হয়ে যাচ্ছে না?' ভুরু কুঁচকে বলল রানা। 'রেড ব্রিগেডের ক্ষমতা এখন আর আগের মত নেই। আশির দশকের শেষে সংগঠনটাকে মোটামুটি ধ্বংস করে দিয়েছে তোমাদের সরকার। যতটুকু এখন অবশিষ্ট আছে, তা খুবই দুর্বল। ছোটখাট

টেরোরিস্ট হামলা ছাড়া বেশি কিছু করবার মুরোদ নেই ওদের।'

'ভুল, সেনিয়র। আবারও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে ওরা... বাইরের দুনিয়া এখনও তা জানে না।'

'তা-ই? কিন্তু এমন একটা সংগঠন তোমার পিছনে লাগবে কেন? ওদের ক্যাম্প থেকে পালিয়ে এসেছিলে বলে? সন্ত্রাসী সংগঠনগুলো থেকে বহু রিক্রুটই পালায়, এ নতুন কিছু নয়।'

'আমার ব্যাপারটা এখনও তুমি জানো না, সেনিয়র। আমি পালিয়েছিলাম বটে, কিন্তু পরে ধরাও পড়ে গিয়েছিলাম। বন্দি করে আমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল মেডিসিনায়। বিচার করা হয়েছিল ব্রিগেডের লাল আদালতে! সে বড়ই ভয়ানক এক আদালত—সত্যিকার আদালতের মত মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় ওখানে। আমার বেলাতেও তা-ই ঘটতে চলেছিল। সামান্য এক রিক্রুট আমি, পালিয়ে গিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলাম ব্রিগেডের সঙ্গে। পুলিশ যদি খোঁজ পেত, তা হলে পুরো সংগঠনের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ত। খুবই গুরুতর অভিযোগ এসব...'

'বাঁচলে কীভাবে?'

'প্রাণভিক্ষা চাই আমি ওদের কাছে। মিথ্যে কথা বলি—ওদেরকে জানাই যে, খুন হওয়া ছেলেটাকে ভালবাসতাম আমি... ওর কারণে মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, আবেগের বশে বোকামি করে ফেলেছি। বলা বাহুল্য, এসব অনুনয়-বিনয়ে কাজ হবার কথা নয়; কিন্তু আমার বেলায় হলো। ব্রিগেডের এক প্রভাবশালী নেতার কুনজর ছিল আমার উপর। নিজের কামনা চরিতার্থ করার জন্য আমার জীবন বাঁচায় সে, রক্ষিতা বানায় আমাকে। পুরো একটা বছর তার সঙ্গে থাকি আমি, সত্তাহীন একটা প্রাণীর মত... নরকতুল্য পরিবেশে। রাতের পর রাত লোকটার মনোরঞ্জন করতে হয়েছে আমাকে, রাগে আর ঘৃণায় বহুবার

চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে হয়েছে... কিন্তু পারিনি। প্রাণের মায়ায় সবই সহ্য করে গেছি নীরবে।' ঘুরে রানার মুখোমুখি হলো সোনিয়া। 'তুমি জানতে চেয়েছ, সেনিয়র, এখন পর্যন্ত আমি পালাবার চেষ্টা করিনি কেন। সত্যি কথা হলো, এ-ধরনের পরিস্থিতি আমার জন্য নতুন কিছু নয়... মানে, প্রাণ বাঁচানোর জন্য ইচ্ছের বিরুদ্ধে কাজ করা। বোলোগনায় বন্দি ছিলাম আমি, পোর্তো ভেচিয়োতেও স্বেচ্ছাবন্দি করেছিলাম নিজেকে... আর এখন বন্দি হয়েছি তোমাদের হাতে। তবে জেনে রাখো, সহ্যের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি আমি। খুব শীঘ্রি পালাবার চেষ্টা করব, পিছন থেকে চাইলে তুমি গুলি চালাতে পারো; আমি পরোয়া করব না। তোমার দেয়া কাপড়চোপড় ফিরিয়ে নাও, সেনিয়র রানা। আমার পিছনে টাকা-পয়সা খরচ করবার কোনও দরকার নেই।'

ওকে বিস্মিত করে দিয়ে মুচকি হাসল রানা। বলল, 'যাক, অন্তত আত্মহত্যার কথা ভাবছ না! পালাবার কথা বলছ... নিঃসন্দেহে ওটা ভাল লক্ষণ।'

'তুমি হাসছ?'

'হাসব না? মেয়েরা শুনেছিলাম সব বুঝতে পারে... অথচ তুমি কিছুই বোঝোনি।'

'কী বুঝিনি?'

'আমি তোমাকে গুলি করব না, সোনিয়া... কখনোই না।'

'মিথ্যে কথা!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সোনিয়া। 'তুমি একটা খুনি। ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ খুন করতে পারো তুমি! তোমার চোখ দেখেই সেটা বুঝতে পেরেছি আমি।'

'হ্যাঁ, আমি খুনি,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'কিন্তু খুন করি শুধুমাত্র প্রয়োজনের তাগিদে—আত্মরক্ষার জন্য, কিংবা দুনিয়াকে মানুষ নামের কিছু কলঙ্কের হাত থেকে মুক্ত করতে। যা হোক, এ

নিয়ে তর্কে যাব না তোমার সঙ্গে। কেবল এটুকু বলব, আমার তরফ থেকে কোনও ধরনের ভয় নেই তোমার। পালাবার দরকার হবে না।'

'কেন?'

'কারণ তোমাকে আমার প্রয়োজন; একইভাবে আমাকেও তোমার।'

'কীসের জন্য? রেড ব্রিগেডের হাত থেকে আমাকে রক্ষা করবে তুমি? এটাই বলতে চাইছ?'

'শুধু রক্ষা না। আমি তোমার জীবনটাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাব, যাতে আর কোনোদিন ভয়ের মাঝে থাকতে না হয় তোমাকে। কীভাবে সেটা সম্ভব, তা এখুনি বলতে পারছি না। হয়তো সময় লাগবে... কিন্তু আমি আমাব কথা রাখব।'

'কেন বিশ্বাস করব তোমাকে?'

'কারণ আর কোনও পথ নেই তোমার সামনে। নিজেই তো বললে, রেড ব্রিগেড একসময় তোমাকে খুঁজে বের করবে। ততদিন পর্যন্ত কি এভাবেই বাঁচতে চাও?'

'পোর্তো ভেচিয়োতে সহজে আমার খোঁজ পেত না ওরা। অনেকদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে পারতাম ওখানে।'

'সেটা তো এখন আর সম্ভব নয়। হলেও বা ফিরবে কেন ওখানে? পাহাড়ঘেরা ওই জায়গায় কেন বন্দি করে রাখবে নিজেকে? কী আছে ওখানে? যারা তোমার দাদীকে খুন করেছে, তাদের সঙ্গে ব্রিগেডের খুব কি তফাৎ আছে? দু'দলই মানুষ খুন করে—হয় গোষ্ঠীর রক্ষার জন্য, নয়তো মিথ্যে আদর্শ বাস্তবায়ন করার নামে। বিশ্বাস করো, এদের মাঝে কানেকশন আছে। এই কানেকশনই খুঁজে বেড়াচ্ছি আমি আর কুয়াশা। যে করে হোক, ওদেরকে থামাতে হবে... ওরা আমাদেরকে থামাবার আগেই!

তোমার দাদী সেটা বুঝতে পেরেছিলেন, তাই অনুরোধ করছি—সাহায্য করো আমাদেরকে। নিজেকেও সাহায্য করো!'

'তোমাদেরকে সাহায্য করার কোনও উপায় নেই আমার।'

'কী করতে বলব, তা তো শোনোইনি এখনও।'

'শোনার প্রয়োজন নেই। আমি জানি কী চাইছ তুমি। ব্রিগেডের কাছে ফিরে যেতে বলবে আমাকে, তাই না? আমার মাধ্যমে ওদের নাগাল পেতে চাও তুমি।'

'হয়তো... কিন্তু এখুনি নয়।'

'অসম্ভব! মরে গেলেও ওদের কাছে যাব না আমি। ওরা মানুষ না, জানোয়ার!'

'হ্যাঁ... এবং এ-কারণেই ধ্বংস করতে হবে ওদেরকে।'

'কীভাবে? তুমি আর সেনিয়র কুয়াশা... মাত্র দু'জনে কীভাবে ধ্বংস করবে রেড ব্রিগেডের মত একটা সংগঠনকে?'

'ওদের কোমর ভেঙে দেব আমরা। যাদের কাছ থেকে পয়সাকড়ি পাচ্ছে ওরা, যাদের কথামত কাজ করছে—তাদেরকে খতম করে দেব। তখন শুধু রেড ব্রিগেড না, দুনিয়ার বহু সন্ত্রাসী সংগঠনই ছত্রভঙ্গ হয়ে যাবে।'

'তোমার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, সেনিয়র। বলতে চাইছ, রেড ব্রিগেডকে অন্য কেউ চালাচ্ছে? কে সেটা?'

'ফেনিস নামে একটা গুপ্তসংঘ। এতদিন শুধু গুজব শুনেছি এ-ব্যাপারে, কিন্তু তোমার দাদীর কাছ থেকে প্রথমবারের মত সিরেট কিছু তথ্য পেয়েছি আমরা, যা ধরে ওদের মুখোশ ছিঁড়ে ফেলা যায়। সংঘটার জন্মের সময় উপস্থিত ছিলেন তিনি।'

'কী তথ্য পেয়েছ?'

'ফেনিসের প্রতিষ্ঠাতাদের নাম-ধাম...'

বলতে বলতে থমকে গেল রানা। মৃদু একটা শব্দ কানে

এসেছে ওর। জানালা দিয়ে বাইরে থেকে ভেসে আসেনি ওটা, এসেছে দরজার ওপাশ থেকে। কাপড়ের খসখসানি, এক পা থেকে অন্য পায়ে ভার বদলেছে কেউ। আড়ি পেতেছে লোকটা! ঠোঁটের কাছে তর্জনী তুলে সোনিয়াকে চুপ থাকার ইঙ্গিত করল ও, নিঃশব্দে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে থাকল, তারপর এক ঝটকায় খুলে ফেলল পাল্লা।

কেউ নেই ওপাশে। খাঁ খাঁ করছে শূন্য হলওয়ে। তাতে স্বস্তি পাবার কিছু নেই। শুনতে যে ভুল হয়নি, সে-ব্যাপারে রানা নিশ্চিত। কেউ একজন আসলেই দাঁড়িয়ে ছিল দরজার বাইরে... সরে পড়েছে বিপদ টের পেয়ে। গেল কোথায়? বেশিদূর যেতে পারেনি নিশ্চয়ই? কামরা থেকে বেরিয়ে এল ও, লঘু পায়ে হাঁটতে শুরু করল হলওয়ের যে-প্রান্তে সিঁড়ি, সেদিকে। একটা হাত ঢুকিয়ে রেখেছে জ্যাকেটের তলায়, মুঠোতে আঁকড়ে ধরে রেখেছে সিগ-সাওয়ারের হাতল, ঝামেলার গন্ধ পেলেই বের করে আনবে।

দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে রানার মাথা। বুঝতে পারছে, ওকে স্পট করে ফেলেছে কেউ। দরজায় আড়ি পেতে কনফার্ম হতে চাইছিল। রাগ হলো ওর—আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল... উচিত ছিল ছদ্মবেশ নেয়া। ভিয়া কণ্ডোত্তির মত জায়গায় যেভাবে আসল চেহারা নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে, তাতে কারও চোখে পড়ে যাওয়াই তো স্বাভাবিক!

গেল কোথায় লোকটা? পালায়নি... পালালে ওকে চোখে চোখে রাখতে পারবে না। তারমানে আশপাশেই কোথাও লুকিয়ে পড়েছে। কোথায়? হলওয়ের ছায়ার মাঝে, নাকি সিঁড়িতে? জানা যাবে শীঘ্রি।

হঠাৎ পিছনে একটা দরজা খোলার আওয়াজ পেল রানা। ঘুরতে ঘুরতে টের পেল, বড্ড দেরি করে ফেলেছে। কামরাটার

ভিতর থেকে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে এল একটা বিশালদেহী মূর্তি, উঁচু করে রাখা হাত সজোরে নামিয়ে আনল রানার ঘাড়ের উপর। পিস্তলের বাটের সঙ্গে হাড়ের সংঘর্ষের বিচ্ছিরি আওয়াজ হলো। খুলির গোড়া থেকে শুরু করে পুরো মেরুদণ্ডে ছড়িয়ে পড়ল তীব্র ব্যথা। পায়ে কোনও শক্তি পেল না রানা, ভারসাম্য হারিয়ে হুড়মুড় করে পড়ে গেল ও।

দপদপে একটা ব্যথা নিয়ে জ্ঞান ফিরল রানার। চারপাশে ঘুটঘুটে অন্ধকার। নড়তে গিয়ে টের পেল, ছোট্ট একটা জায়গার ভিতরে আটকা পড়ে আছে ও। হাত তুলতেই স্পর্শ পেল হ্যাঙারে ঝোলানো কাপড়ের—তারমানে ক্লজিটের ভিতরে ঢোকানো হয়েছে ওকে। ব্যথাটা সয়ে নেয়ার জন্য কিছুটা সময় নিথর হয়ে পড়ে রইল, একই সঙ্গে মাথায় বইছে চিন্তার ঝড়। কতক্ষণ অচেতন হয়ে ছিল ও? কবজিতে বাঁধা ঘড়ির লিউমিনাস ডায়ালের দিকে তাকাল—বেশি না, মাত্র বিশ মিনিট। কথা হলো, এভাবে ওকে ক্লজিটের ভিতর ফেলে রেখেছে কেন প্রতিপক্ষ? কোথায় লোকটা? হাত-পা বেঁধে ইন্টারোগেশনের জন্য তৈরি করেনি কেন? রাখেনি কেন দৃষ্টিসীমার ভিতর?

মৃদু একটা চিৎকারের শব্দে সচকিত হয়ে উঠল রানা। ক্লজিটের বাইরে থেকে এসেছে ওটা। নারীকণ্ঠ! সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার হয়ে গেল রহস্যটা। ও নয়, লোকটার টার্গেট সোনিয়া! ওকেই স্পট করেছে ব্যাটা, রানাকে নয়।

কামরার ভিতর থেকে রাগী গলা শোনা গেল, 'মাগী! বেশ্যা! মার্সেই-এ থাকার কথা ছিল তোর... ন'লাখ লিরা নিয়ে। আমাদের লোক পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু তোকেও পাইনি, তোর কণ্ট্যাক্টকেও না। কোনও কুরিয়ারই তোর টিকিটি দেখেনি। হারামজাদী! কোথায়

ছিলি তুই এতদিন? কী করেছিস আমাদের টাকা-পয়সা নিয়ে?'

জবাবে গুঙিয়ে উঠল সোনিয়া। পরমুহূর্তে ঠাস করে একটা আওয়াজ হলো, সম্ভবত থাপ্পড় দেয়া হয়েছে। দাঁতে দাঁত পিষল রানা, অবলা একটা মেয়ের গায়ে হাত তোলা হচ্ছে!

পিস্তলটা ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে, কিন্তু রানার জ্ঞান যে এত দ্রুত ফিরে আসবে, তা বোধহয় লোকটা আন্দাজ করতে পারেনি। নিচু স্তরের গুণ্ডা বলে মনে হচ্ছে, কাজেকর্মে কাঁচা। প্রতিপক্ষ ওকে অচেতন বলে ভাবছে, কাজেই অবাক করে দেয়ার সুযোগটা নিতে হবে ওকে। উঠে দাঁড়িয়ে শক্তি সঞ্চয় করল রানা, ক্লজিটের দুই পাল্লার মাঝখানে কাঁধ ঠেকিয়ে সজোরে ধাক্কা দিল ও। বাইরে লাগানো ঠুনকো ছিটকিনি সে-প্রেশার সহ্য করতে পারল না, মৃদু শব্দ তুলে উপড়ে এল চৌকাঠ থেকে। বাঘের মত লাফিয়ে ক্লজিট থেকে বেরিয়ে এল রানা। এক পলকে দেখে নিল পরিস্থিতি।

গা গুলিয়ে ওঠার মত দৃশ্য। রানার দিকে পিঠ দিয়ে দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে বিশালদেহী এক ইটালিয়ান। তার সামনে একটা চেয়ারে বসিয়ে রাখা হয়েছে সোনিয়াকে—হাতলের সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে দু'হাত, সামনের দু'পায়ার সঙ্গে পা। মুখ জুড়ে কালসিটে পড়ে গেছে, উপর্যুপরি আঘাতের ফলে। বাঁ চোখটা বুজে এসেছে প্রায়, গাল বেয়ে নেমে এসেছে রক্তের ধারা। ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে পরনের পোশাক, স্তনজোড়া উন্মুক্ত। বোঁটার আশপাশে পোড়া দাগ... সিগারেটের ছ্যাঁকা দেয়া হয়েছে! মাথায় আগুন জ্বলে উঠল রানার। যে-অত্যাচার চালানো হয়েছে মেয়েটির উপর, তার সঙ্গে ইন্টারোগেশনের কোনও সম্পর্ক নেই... স্রেফ স্যাডিজম ছাড়া আর কিছু নয় এটা।

পিছনে আওয়াজ শুনেই ঘুরে দাঁড়িয়েছে বিশালদেহী। সেকেণ্ডের ভগ্নাংশের জন্য তার চোখে চোখ রাখল রানা, তারপরেই

বুনো মোষের মত মাথা নিচু করে ডাইভ দিল ও, গুঁতো মারল লোকটার পেটে। ব্যথা পেয়ে গুঙিয়ে উঠল ইটালিয়ান, কয়েক পা পিছিয়ে গেল, কিন্তু তারপরেও দাঁড়িয়ে থাকল পায়ের উপর। রানা ভারসাম্য ফিরে পাবার আগেই ওর বগলের তলায় হাত দুটো ঢুকিয়ে দিল সে, শক্ত করে জড়িয়ে ধরে আধ পাক ঘোরাল, তারপর অনায়াসে ছুঁড়ে দিল একপাশে।

ধপাস করে মেঝেতে পিঠ দিয়ে পড়ল রানা, পরমুহূর্তে স্প্রিঙের মত লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বুঝতে পারছে, শরীরে প্রচণ্ড শক্তি ধরে লোকটা। গায়ের জোরে নয়, তাকে হারাতে হবে গতি এবং ক্ষিপ্রতা দিয়ে। সমস্ত ব্যথা ভুলে থাকার চেষ্টা করল ও, ছুটে গেল ইটালিয়ানকে লক্ষ্য করে। নীচ থেকে উপরদিকে ঘুসি চালিয়ে ব্যাটার চিবুকে লাগাতে পারল, দেখতে পেল থেঁতলানো মাংস থেকে রক্ত বেরিয়ে আসছে। ঘুসিটা প্রচণ্ড ছিল, অন্য কোনও লোক হলে সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারাত। কিন্তু ইটালিয়ান দৈত্য অন্য ধাতে গড়া। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে রক্ত মুছল নির্বিকারভাবে, তারপর দু'হাত মুঠো পাকিয়ে রানার দিকে এগোল... বক্সারের মত মাথা নিচু করে। নিজের উপর প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাস—খালি হাতেই পুঁচকে লোকটাকে খতম করতে পারবে বলে ভাবছে, তাই পিস্তল বের করছে না।

পা বাড়িয়ে মাথাটা নিচু করে নিল রানা, ইটালিয়ানের চালানো ঘুসি এড়িয়ে আবার তাকে আঘাত করল পেটের নীচের দিকে। অনুভব করল ওর মুঠো মাংসের ভিতর ঢুকে হাড়ে ধাক্কা খেলো। পরমুহূর্তে ছিটকে পিছন দিকে পড়ল রানা, লোকটার দ্বিতীয় ঘুসিটা বুকে লেগেছে। ওর মনে হলো, বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা ছাতু হয়ে গেছে। এত জোরাল ঘুসি আগে বোধহয় কখনও খায়নি।

কয়েক মুহূর্ত পড়ে থাকল রানা, ব্যথায় চোখে অন্ধকার

দেখছে। যেন কুয়াশার ভেতর রয়েছে ও, অনেক কষ্টে হাঁটুর উপর সিধে হলো। টলতে টলতে দাঁড়াতেও পারল, শেষ একবার চেষ্টা করে দেখতে চায়।

পা বাড়িয়ে সামনে চলে এল ইটালিয়ান। প্রথম দুটো ঘুসি ঝট করে মাথা সরিয়ে নিয়ে এড়িয়ে যেতে পারল রানা। তৃতীয় ঘুসিটা এক পা পিছিয়ে দিল ওকে। তবে পড়ে যায়নি, থামেওনি, আঘাত সামলে সামনে বাড়ল। ইটালিয়ান লক্ষ করল, রানা শুধু আক্রমণ ঠেকাচ্ছে, পাল্টা আঘাত করতে চাইছে না। রানার উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে পিছাতে শুরু করল সে।

ভঙ্গিটা রানার আত্মরক্ষার, তবে সামনে বাড়ছে; আর আক্রমণের ভঙ্গি নিয়ে পিছু হটছে ইটালিয়ান। কামরার ভিতরে চক্কর দিচ্ছে ওরা। রানার চেহারায় অতি সতর্ক বা ভয় ভয় ভাব রয়েছে, সেটা দেখে দৈত্য ভাবতেও পারেনি হঠাৎ এমন লাফ দেবে ও। কাজেই তাকে খানিকটা অসতর্ক অবস্থায় পেয়ে গেল রানা; প্রথম লাফেই নাগালের মধ্যে চলে এল তার লম্বা গলাটা। প্রথমেই ডান কনুই ভাঁজ করে কারাতে চপ মারল রানা লোকটার কণ্ঠনালীর উপর, পরমুহূর্তে টিপে ধরল গলটা দুই হাতে। এতক্ষণ পাঁয়তারা কষছিল রানা বক্সারের দুর্বল জায়গাটার নাগাল পেতে।

ধরার পর আর ছাড়ায় কার সাধ্য। গায়ে যতই জোর থাকুক, কনুই চালিয়ে বা ঘুসি মেরে কোনও লাভ হলো না ইটালিয়ানের। রানা যেন প্রতিজ্ঞা করেছে, যত আঘাতই আসুক, গলাটা কোনও অবস্থাতেই ছাড়বে না। দু'হাত দিয়ে শ্বাসনালীটা শক্ত করেই ধরেছে ও, সেই সঙ্গে বাম হাঁটু চালাল দৈত্যের উরুসন্ধি আন্দাজ করে। গুঙিয়ে উঠল লোকটা, ছটফট করছে ব্যথায়। ধীরে ধীরে একটা আতঙ্ক ভর করল ওর চোখে, দুর্বল হাতে এখন গলাটা মুক্ত করতে চাইছে ইটালিয়ান। রানার দুই কবজি ধরে নীচের দিকে টান

দিচ্ছে সে।

সুযোগ পেল রানা লোকটার গলায় চাপ বাড়াবার। এতক্ষণ গলা ধরে ঝুলে ছিল, এবার পায়ের উপর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে, ঘৃণা আর আক্রোশ থেকে উৎসারিত প্রবল আসুরিক শক্তি অনুভব করছে দুই হাতে। ইটালিয়ানের গলা বুজে গেছে, বাতাসের অভাবে হাঁসফাঁস করছে সে। এমন সহজ একটা কৌশলে দুর্বল প্রতিপক্ষ তাকে কাবু করে ফেলছে, এ যেন সে বিশ্বাস করতে পারছে না। শুধু যে আতঙ্কে, তা নয়, বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে তার চোখ জোড়া। দুর্বল হয়ে পিছন দিকে হেলে পড়ছে সে, আর সেটা অনুভব করে রানার হাতে যেন আরও জোর এসে যাচ্ছে। মনে হলো এক সময় কোটর ছেড়ে লোকটার চোখদুটো বেরিয়ে আসবে। শিরদাঁড়া বাঁকা হয়ে যাচ্ছে তার, তারপর শুয়ে পড়ল মেঝেতে। রানা চেপে বসল ওর বুকের উপর।

অক্সিজেনের অভাবে ঝাঁকি খেতে শুরু করল বিশাল শরীরটা। তারপর আস্তে আস্তে স্থির হয়ে গেল। গলাটা ছেড়ে দিল রানা। টলোমলো পায়ে উঠে দাঁড়াল রানা।

মাতালের মত লাগছে রানাকে, ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে, টলতে টলতে এগিয়ে গেল প্রায়-অচেতন সোনিয়ার দিকে। কাঁপা কাঁপা হাতে খুলতে শুরু করল ওর হাত-পায়ের বাঁধন। কী ঘটছে সে সম্পর্কে সচেতন নয় সোনিয়া, দুর্বল ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল, ফিসফিসিয়ে অনুনয় করল ওকে আর ব্যথা না দেবার জন্য। পাঁজাকোলা করে ওকে বিছানায় নিয়ে গেল রানা। চাদর দিয়ে ঢেকে দিল অনাবৃত দেহ। পাশে বসে হাত বুলিয়ে দিল মাথায়।

'কোনও ভয় নেই,' নরম গলায় বলল ও। 'লোকটা আর ক্ষতি করতে পারবে না তোমার।'

আচমকা উঠে বসল সোনিয়া। শক্ত হাতে জড়িয়ে ধরল

রানাকে, মুখ গুঁজল বুকে। হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত কাঁপছে পুরো শরীর। কাঁদছে একই সঙ্গে। বিড়বিড় করে বলল, 'আমাকে বাঁচাও, রানা। এই দুঃস্বপ্নের হাত থেকে মুক্তি দাও আমাকে!'

অনেককিছুই জানার আছে ওর কাছ থেকে, বুঝতে পারছে রানা। কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের সময় নেই এখন। আগে মেয়েটার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। ব্যবস্থা করতে হবে মেঝেতে পড়ে থাকা লাশটারও। এখুনি বেরিয়ে পড়তে হবে রুমিং হাউস থেকে... নতুন কোনও শত্রু উদয় হবার আগে। একটু ভেবে দেখল রানা—উপায় নেই, রানা এজেন্সির রোম শাখার সাহায্য এ-মুহূর্তে নিতেই হবে ওকে। শাখাপ্রধান ভূষণের মাধ্যমে ডেডবডি সরাতে হবে, এজেন্সির নিজস্ব ডাক্তারের কাছেও নেয়া যাবে সোনিয়াকে।

মেয়েটার বাহুবন্ধন থেকে সাবধানে নিজেকে ছাড়িয়ে নিল রানা।

বিশ

এগজামিনেশন রুম থেকে বেরিয়ে এসে দরজা টেনে দিলেন ড. রতন চক্রবর্তী। কোলকাতায় আদি বাড়ি, বয়স ষাট পেরিয়ে গেছে, ত্রিশ বছর ধরে ইটালিতে প্রবাসজীবন কাটাচ্ছেন। শুরু থেকে রানা এজেন্সির রোম শাখার সঙ্গে জড়িত, অপারেটরদের মেডিক্যাল সাপোর্ট দিচ্ছেন। রানা অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে তাঁকে। এমনিতে হাসিখুশি স্বভাবের মানুষ, কিন্তু এ-মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে আছেন।

রানার দিকে না তাকিয়েই বললেন, 'মাইল্ড-সিডেটিভ দিয়েছি মেয়েটাকে, আমার বউ আপাতত সঙ্গে আছে ওর। জ্ঞান ফিরবে খুব শীঘ্রি। তখন দেখা করতে পারবে ওর সঙ্গে।'

'কেমন আছে মেয়েটা?' উদ্বিগ্ন গলায় জানতে চাইল রানা।

'ব্যথায় কাতর, তবে সেটা বেশি ভোগাবে না। মলম লাগিয়ে দিয়েছি পোড়া জায়গাগুলোতে, ওটা লোকাল অ্যানাস্থেটিক হিসেবে কাজ করবে। শুকিয়ে গেলে আবার লাগাতে হবে... কয়েকটা টিউব দিয়ে দিচ্ছি।' একটা সিগারেট ধরালেন ড. চক্রবর্তী, কথা শেষ হয়নি তাঁর। 'মুখের কন্টিউশনগুলোয় বরফ ঘষে দিচ্ছি, ফোলা কমে যাবে রাতের ভিতর। কাটাছেঁড়াগুলোও সিরিয়াস কিছু নয়, সেলাইয়ের প্রয়োজন নেই।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল রানা। 'যাক, ভয় তা হলে কাটল আমার।'

'ব্যাপারটা এত সহজ নয়, রানা।' গম্ভীর ভঙ্গিতে ধোঁয়ার একটা রিং ছাড়লেন ড. চক্রবর্তী। 'মেডিক্যালি হয়তো সিরিয়াস নয় ও, সামান্য মেকাপ আর বড় সানগ্লাসের সাহায্যে ঢেকে দেয়া যাবে সব আঘাতের চিহ্ন... কিন্তু তাই বলে পুরোপুরি সুস্থ বলব না ওকে।'

'কী বলতে চান?' ভুরু কোঁচকাল রানা।

জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়লেন চক্রবর্তী। 'কতটা জানো ওর সম্পর্কে?'

'বলতে গেলে কিছুই না। মাত্র কয়েকদিনের পরিচয়। কেন?'

'তোমার জেনে রাখা দরকার, আজ যা ঘটেছে, সেটাই ওর প্রথম অভিজ্ঞতা নয়। পুরনো অত্যাচারের চিহ্ন দেখেছি আমি... কিছু কিছু অত্যন্ত সিভিয়ার।'

'কী ধরনের চিহ্ন?'

'সিগারেটের ছ্যাঁকা তো আছেই... আরও আছে বেশ কিছু কাটা

দাগ—ওগুলোর প্রত্যেকটাই করা হয়েছে মেডিক্যাল ইকুইপমেন্টের সাহায্যে, খুবই পেশাদার ভঙ্গিতে, অল্প চেষ্টায় সর্বোচ্চ কষ্ট দেবার জন্য।'

'কতদিনের পুরনো বলে মনে হয় আপনার?'

'এক-দেড় বছর... তার বেশি না। কয়েক জায়গার টিস্যু এখনও নরম।'

'কেন এসব করা হয়েছে, কিছু আন্দাজ করতে পারেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

সিগারেটে টান দেবার জন্য একটু বিরতি নিলেন চক্রবর্তী। তারপর বললেন, 'এ-ধরনের পরিস্থিতিতে প্রলাপ বকে রোগী, মেয়েটার বেলাতেও তা-ই ঘটেছে। সেখান থেকেই কিছুটা আইডিয়া করেছি। বিপ্লব, আনুগত্য, আত্মত্যাগ... এসব হাবিজাবি বকছিল। আমার ধারণা, খুবই পরিকল্পিতভাবে ব্রেইনওয়াশ করা হয়েছে এর... কিংবা করার চেষ্টা চালানো হয়েছে।'

চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল রানার। 'ব্রিগাতিস্তি-রা তা হলে ব্রেইনওয়াশে বিশ্বাসী?'

কপালে ভাঁজ পড়ল ড. চক্রবর্তীর। 'ব্রিগাতিস্তি? মানে রেড ব্রিগেডের সদস্যদের কথা বলছ?'

'সরি, মনের কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। ভুলে যান কী বলেছি, তাতে আপনারই মঙ্গল হবে।'

'আমি নাহয় ভুলে গেলাম। কিন্তু তোমার বান্ধবীকে এসব ভোলানো খুব কঠিন হবে। ওর মাথাভর্তি জঞ্জাল গিজগিজ করছে।'

'যতটা হোপলেস ভাবছেন, ততটা হয়তো নয়,' বলল রানা। 'ব্রিগেড ছেড়ে পালিয়ে এসেছে ও।'

'পুরোপুরি সুস্থভাবে?' জানতে চাইলেন চক্রবর্তী।

'শারীরিকভাবে যতটা সম্ভব আর কী।'

'তা হলে ও একটা ব্যতিক্রম।'

'ব্যতিক্রম হলেই ভাল। কারণ জ্ঞান ফেরার সঙ্গে সঙ্গে ওর সাথে কথা বলতে চাই আমি... খোলসের ভিতরে ফের ঢুকে পড়ার আগে। কিছু একটা লুকাচ্ছে ও, সেটা জানতে হবে আমাকে।'

'আই সি,' বললেন ড. চক্রবর্তী। 'কিন্তু তোমাকে সতর্ক করে দেয়া দরকার, সাইকোলজিক্যালি অত্যন্ত নাজুক অবস্থাতে আছে মেয়েটা। দীর্ঘদিন টরচার চালানো হয়েছে ওর উপর, সেটা ভুলে যেয়ো না।'

'অস্বীকার করছি না। কিন্তু ওর মুখ খোলানোর জন্য এর কোনও বিকল্প নেই আমার হাতে। আমার ধারণা, মেয়েটার দাদীও ঠিক একই জিনিস চেয়েছিলেন। সেজন্যেই ওকে তুলে দিয়েছেন আমার হাতে...' বলতে বলতে থেমে গেল রানা। ড. চক্রবর্তী ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে আছেন ওর দিকে, কথাগুলোর অর্থ বুঝতে পারছেন না। পারার কথাও নয়। 'সরি, আপনাকে সবকিছু জানানো সম্ভব নয় এ-মুহূর্তে,' লজ্জিত গলায় বলল ও।

'ইটস্ ওকে,' মাছি তাড়ানোর ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন চক্রবর্তী। 'মেডিক্যাল বিষয় ছাড়া অন্য কিছুতে আগ্রহ নেই আমার।'

এগজামিনেশন রুমের দরজা ফাঁক করে উঁকি দিলেন মিসেস চক্রবর্তী। জানালেন, 'মেয়েটার জ্ঞান ফিরছে।'

'যাও,' রানাকে বললেন ডাক্তার। 'বেশি চাপ দিয়ো না, এটুকুই আমার পরামর্শ।'

আলতো হাতে সোনিয়ার গাল স্পর্শ করল রানা। ছোঁয়া পেতেই বালিশের উপর মাথা কাত করল মেয়েটা, ঠোঁটদুটো ফাঁক হলো, বেরিয়ে এল মৃদু গোঙানি। দীর্ঘশ্বাস ফেলল রানা। সোনিয়া মায়োলা নামের এই অদ্ভুত তরুণীর রহস্য ধীরে ধীরে পরিষ্কার হতে

শুরু করেছে। শুরু থেকে দুর্ভেদ্য এক দেয়াল খাড়া করে রেখেছিল ও রানা-কুয়াশার সামনে, সেটা ভেদ করে উঁকি দেয়া যাচ্ছিল না। পাহাড়ের মাঝে অস্ত্রহাতে দাঁড়িয়ে থাকা সেই নির্ভীক মেয়ে, যার মধ্যে বিন্দুমাত্র রস-কষ লক্ষ্য করেনি; অথচ ট্রলারে উঠে সে-ই পরিণত হয়েছিল প্রাণচঞ্চল এক মানুষে। ইটালির মাটিতে পা দেবার পর আবার হারিয়ে গিয়েছিল চাঞ্চল্য। মেলানো যাচ্ছিল না এই আচরণের পার্থক্য। এখন বুঝতে পারছে, সাগরের বুকের ওই ট্রলার ছিল মেয়েটির জন্য একটা অভয়াশ্রয়, ওখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ মনে হয়েছিল ওর নিজেকে, তাই মেতে উঠেছিল হাসি-ঠাট্টায়। ঠিক যেমন কারাগারের চার দেয়ালের মাঝে বন্দি কয়েদি উপভোগ করার চেষ্টা করে মুক্ত বাতাসকে।

ক্ষত-বিক্ষত মনের মানুষ এভাবেই আচরণ করে। ক্ষতের স্বরূপ জানবার পরে আস্তে আস্তে সবই অনুধাবন করতে পারছে রানা। আর কী-ই বা আশা করা যায় সোনিয়ার কাছ থেকে। জীবনের সবচেয়ে নিচুস্তরে দীর্ঘ একটা সময় কাটিয়েছে বেচারি, পাগল যে হয়ে যায়নি, তা-ই ঢের।

ধীরে ধীরে চোখ খুলল সোনিয়া। ভয়ার্ত ভঙ্গিতে চোখের পাতা পিটপিট করল কয়েকবার, ঠোঁট কাঁপল। কয়েক মুহূর্ত পর যেন চিনতে পারল রানাকে। ভয় মিলিয়ে গেল দৃষ্টি থেকে, আশ্বাস দেবার ভঙ্গিতে ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিল রানা।

'গ্রাৎসি!' ফিসফিসাল সোনিয়া। 'ধন্যবাদ, মসিয়ো রানা। ধন্যবাদ...'

ওর ঠোঁটের উপর একটা আঙুল রাখল রানা। নরম সুরে বলল, 'ধন্যবাদ দেবার প্রয়োজন নেই। কী ধরনের অত্যাচার সয়েছ তুমি, তা শুনেছি আমি ডাক্তারের কাছে। এখন বাকিটা বলো। মার্সেইয়ে কী ঘটেছিল?

দু'চোখে অশ্রু জমল সোনিয়ার। কেঁপে উঠল আবার। 'না! ওসব জিজ্ঞেস কোরো না!'

'প্লিজ... আমাকে সব জানতে হবে। ভয় নেই তোমার। আর কোনোদিন তোমাকে ছুঁতে পারবে না ওরা... আমি কথা দিচ্ছি।'

'কী করে ওরা, তা তো দেখেছ। ওফ্, সেই কষ্ট...'

'...আর কোনোদিন পেতে হবে না তোমাকে,' সোনিয়ার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল রানা। রুমাল দিয়ে মুছে দিল চোখের পানি। 'শোনো, তোমার অবস্থা আমি বুঝতে পেরেছি। কেন পালিয়ে গিয়েছিলে, কেন নিজেকে সভ্যজগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিলে... সেসব জেনে গেছি। কিন্তু তুমি বুঝতে পারছ না, ওটা কোনও সমাধান নয়। পালিয়ে, স্বেচ্ছাবন্দির মত বেঁচে থেকে লাভ নেই কোনও। ওটাকে জীবন বলে না। তাই অনুরোধ করছি, সাহায্য করো আমাকে, যাতে ওই পিশাচদের ধ্বংস করে দিতে পারি। আর কিছুর জন্য না হোক, অন্তত প্রতিশোধের জন্য! যা করেছে ওরা তোমার সঙ্গে, তার শাস্তি দেবার জন্য হলেও জ্বলে ওঠো!'

রানার চোখে চোখ রেখে কয়েক মুহূর্ত নীরব রইল সোনিয়া, যেন বোঝার চেষ্টা করল ওকে। হঠাৎই সে টের পেল, সামনের এই যুবকটিকে বিশ্বাস করা যায়। চোখের মণিতে বাসা বেঁধেছে মায়া-মমতা আর আশ্বাস। মনের ভিতর অনুভব করল, এর উপর আস্থা রাখলে কখনও ঠকতে হবে না। অদ্ভুত এক প্রেরণা অনুভব করল বুকের ভিতর।

লম্বা করে শ্বাস ফেলল ও। বিছানায় উঠে বসে নিচু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'কী জানতে চাও?'

'মার্সেইয়ের ঘটনা,' বলল রানা। 'ওই ব্রিগাতিস্তি কীসের কথা বলছিল?'

কথা গুছিয়ে নেবার জন্য একটু অপেক্ষা করল সোনিয়া।

তারপর বলতে শুরু করল, 'ড্রাগ চোরাচালানের কাজে নিয়োগ করা হয়েছিল আমাকে। কুরিয়ারের সঙ্গে যাবার কথা ছিল—তার হয়ে চারদিকে নজর রাখা, সেইসঙ্গে বেশ্যার মত লোকটার মনোরঞ্জন করার জন্য পাঠানো হয়েছিল আমাকে।' একটু কেঁপে উঠল। 'চোরাচালানের সময় এ-ধরনের মেয়েদের গুরুত্ব অনেক। দরকার হলে সরকারি লোকজনের কাছে ঘুষ হিসেবে পাঠানো যায় এদেরকে, ডিকয় হিসেবে ব্যবহার করা যায়... নজরদারির জন্যও এরা আদর্শ; কেউ সন্দেহ করতে পারে না। এসব কাজে ট্রেইনিং দেয়া হয়েছিল আমাকে। মুখ বুজে সব সহ্য করেছি; ব্রিগেডকে ভাবতে দিয়েছি, আমার মধ্যে কোনও ধরনের প্রতিরোধ অবশিষ্ট নেই। তাই শেষ পর্যন্ত ফিল্ডে পাঠানো হয় আমাকে। কুরিয়ার লোকটা ছিল এক জানোয়ার, আমাকে বিছানায় নেবার জন্য তর সইছিল না যেন তার। ল্যা স্পেজিয়ার বন্দরে যাই আমরা, একটা ফ্রেইটারে চড়ি। ওটাতে করে মার্সেইয়ে যাবার কথা ছিল। জাহাজের নীচদিকের একটা স্টোরেজ রুমে থাকতে দেয়া হয় আমাদেরকে।

'ওখানে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল কুরিয়ার। জাহাজ ছাড়তে তখনও এক ঘণ্টা বাকি, ওকে অনুরোধ করলাম ততক্ষণ অপেক্ষা করতে; কিন্তু কে শোনে কার কথা। জামা-কাপড় ছিঁড়ে আমাকে উদোম করে ফেলল শয়তানটা, রেপ করার চেষ্টা করল। এমনিতেই তার সঙ্গে শুতাম, কিন্তু লোকটা ছিল স্যাডিস্ট, জোর খাটানো ছাড়া মজা পায় না। মেঝের উপর আমাকে ছুঁড়ে ফেলে চড়ে বসল আমার গায়ের উপর, শুরু করল চড়-থাপ্পড় আর ঘুসি। কী যে হয়ে গেল আমার ভিতর... বাধা দিলাম ওকে, তাতে আরও যেন খেপে গেল বদমাশটা। চালাল অকথ্য অত্যাচার। মনে হচ্ছিল বুঝি খুন করে ফেলবে আমাকে। মরিয়ার মত মেঝে হাতড়ালাম, হাতে পেয়ে গেলাম একটা ভাঙা

কাঁচের টুকরো। লোকটা আমার শরীরের উপর উপুড় হতেই সেটা ঢুকিয়ে দিলাম তার পিঠে। চিৎকার দিয়ে আমার উপর থেকে সরে গেল সে। ততক্ষণে মাথা খারাপের মত হয়ে গেছে আমার, এলোপাতাড়ি কোপাতে শুরু করলাম ব্যাটাকে। যখন সংবিৎ ফিরল, তখন সর্বনাশ হয়ে গেছে। মরে গেছে লোকটা, তার রক্তে ভেসে যাচ্ছে মেঝে... মানুষ খুন করেছি আমি...'

ফুঁপিয়ে উঠল সোনিয়া। তাড়াতাড়ি ওকে জড়িয়ে ধরল রানা। বলল, 'শান্ত হও। যা করেছ, তা আত্মরক্ষার জন্য করেছ। মৃত্যুই প্রাপ্য ছিল লোকটার।'

'আ... আমি কোনও অন্যায় করিনি?'

'না, একটুও না। আত্মগ্লানি থেকে বাঁচতে চাইলে এটাই প্রথমে বিশ্বাস করতে হবে তোমাকে। একজন মানুষের প্রাণ নিয়েছ তুমি, তবে সেটা নিতান্তই নিজের প্রাণ বাঁচানোর স্বার্থে। এটা একটা যুদ্ধ, সোনিয়া। হয় মারো, নয় মরো—এটাই যুদ্ধের নিয়ম।'

ওর দিকে মুখ তুলে তাকাল সোনিয়া। 'তুমি এক অদ্ভুত মানুষ, রানা। অকাট্য যুক্তি দেখাচ্ছ... মনে হচ্ছে নিজের বেলাতেও খাটাও এই যুক্তি; কিন্তু গলার স্বর বলছে, যুক্তিটা সবসময় মানতে পারো না।'

চুপ করে রইল রানা। কিন্তু মনে মনে স্বীকার করল, ভুল বলেনি মেয়েটা। বহু মানুষ মারা পড়েছে ওর হাতে, তাদের সবাই ছিল মন্দলোক, হত্যাগুলোও করতে হয়েছে পরিস্থিতির তাগিদে। কিন্তু মানুষের রক্তে হাত রাঙানোর গ্লানি কি দূর হয়েছে ওই যুক্তি দেখিয়ে? না, হয়নি। প্রায়ই দুঃস্বপ্ন দেখে ও, মনকে পীড়া দেয় সেসব স্মৃতি। তবে তা সোনিয়াকে বলা চলে না।

'আমার কথা বাদ দাও,' বলল রানা। 'এরপর কী ঘটল? কুরিয়ারকে খুন করার পরে?'

'না। তোমাকে ধর্ষণ করতে আসা একটা পশুকে খুন করার পরে।'

কৃতজ্ঞতা ফুটল সোনিয়ার চোখে। বলল, 'বুদ্ধি খাটালাম আমি। লোকটার পোশাক চড়ালাম নিজের গায়ে—ট্রাউজারের পা গুটিয়ে নিলাম, কোটের ভিতরে ভরে নিলাম নিজের জামা, চুল ঢাকলাম ওর টুপির ভিতরে। তখন রাত নেমে এসেছে, অন্ধকারে কেউ চিনতে পারল না আমাকে। বন্দরের শ্রমিকরা ফ্রেইটারে মালামাল ওঠাচ্ছিল, তাদের সঙ্গে মিশে নেমে গেলাম ডকে।'

'চমৎকার!' প্রশংসা করল রানা।

'কাজটা কঠিন ছিল না,' বলল সোনিয়া। 'কঠিন ছিল ডকে পা ফেলার পরের মুহূর্তটা।'

'কেন? কী ঘটেছিল?'

'চিৎকার করতে ইচ্ছে হচ্ছিল। চেঁচিয়ে সবাইকে জানাতে ইচ্ছে করছিল—আমি মুক্ত! খুব কষ্ট করে ঠেকিয়েছি নিজেকে। এরপরের অংশটা ছিল আরও সহজ। কুরিয়ারের কোটের পকেটে নগদ টাকা ছিল। বাসে চেপে চলে গিয়েছিলাম জেনোয়ায়। নতুন পোশাক আর বিমানের টিকেট কেটে পরদিন দুপুরেই পৌঁছে গিয়েছিলাম বাস্তিয়ায়... মানে কর্সিকায়।'

'ওখান থেকে পোর্তো ভেচিয়োয় চলে গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার দাদী জানতেন এসব ঘটনা?'

'কিছুটা। খারাপ অংশগুলো বলিনি ওঁকে। তবে সম্ভবত আন্দাজ করতে পেরেছিলেন। আমি অবশ্য ওসব নিয়ে মাথা ঘামাইনি। মুক্তি পেয়েছিলাম, সেটাই ছিল আনন্দের ব্যাপার।'

'ওটাকে মুক্তি বলে না, সোনিয়া। সত্যি বলতে কী, নতুন একটা কারাগারে ঢুকেছিলে তুমি। চারপাশের পাহাড় ছিল সেই

কারাগারের দেয়াল।'

মুখ ঘোরাল সোনিয়া। 'তাতে কিছু যায়-আসে না। ওভাবে বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে পারতাম আমি। ছোটবেলা থেকে ওই পাহাড় আর উপত্যকাকে ভালবেসেছি আমি।'

'স্মৃতিগুলোই ধরে রাখো,' রানা বলল। 'আর কখনও ফিরে যেয়ো না ওখানে।'

ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকাল সোনিয়া। 'তুমি তো বলেছিলে, একসময় ওখানে ফিরতে পারব আমি... যখন দাদীর খুনিরা শাস্তি পাবে!'

'হয়তো। কিন্তু কবে নাগাদ তা ঘটবে, তার কোনও নিশ্চয়তা নেই। তার আগে ওখানে ফেরা উচিত হবে না তোমার। সবচেয়ে ভাল হয় যদি কখনোই না ফেরো।'

একটু থামল রানা। ভাবছে। রহস্য এখনও পুরোপুরি পরিষ্কার হয়নি। সোনিয়ার অতীত ইতিহাস সম্পর্কে জানা গেছে, কিন্তু তাতে বিশেষ লাভ হচ্ছে না ওর। মারিয়া মাযোলা নিশ্চয়ই আরও কিছু জানতেন... এমন কিছু, যা ওর তদন্তে সহায়ক হবে। সে-কারণেই সোনিয়াকে পাঠিয়েছেন ওর সঙ্গে। কী সেটা? মেয়েটাকে আরেকটু জিজ্ঞাসাবাদ করবে বলে ঠিক করল।

'কিছু মনে কোরো না, আরও কিছু প্রশ্ন আছে আমার,' বলল ও। 'ড্রাগের চোরাচালান... ওটা ঠিক কীভাবে করা হয়? কুরিয়ারের কথা শুনলাম, সঙ্গে একটা মেয়ে থাকে... ওরা কি কোনও কণ্ট্যাক্টের সঙ্গে দেখা করে?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল সোনিয়া। 'জায়গা আর সময় ঠিক করা থাকে। নির্দিষ্ট একটা পোশাকে মেয়েটাকে থাকতে হয় সেখানে। কণ্ট্যাক্ট তার সঙ্গে দেখা করে। কুরিয়ার থাকে পিছনে, মেয়েটার দালাল সেজে। পুলিশ ধরলে এই কাভারই ব্যবহার করা হয়।'

'তারমানে মেয়েটার মাধ্যমে যোগাযোগ রাখে কন্ট্যাক্ট আর কুরিয়ার। ড্রাগের ডেলিভারিও কি ওভাবেই সারা হয়?'

'মনে হয় না। আমি তো সত্যিকারভাবে একবারও কাজটা করিনি, তবে যদ্দূর জানি—কন্ট্যাক্ট শুধু ডিস্ট্রিবিউশনের শিডিউল ঠিক করে। তার নির্দেশ অনুসারে সরবরাহকারীর কাছে যেতে হয় কুরিয়ারকে। এক্ষেত্রেও সঙ্গের মেয়েটাকে কাজে লাগানো হয়।'

'তারমানে যদি কেউ গ্রেফতার হয়, বা ধরা পড়ে... সেটা হবে ওই মেয়ে?'

'হুঁ। পতিতা নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায় না পুলিশ। ধরা পড়লেও সহজেই তাকে ছাড়িয়ে আনা যায়।'

'ভাল বুদ্ধি,' মাথা দোলাল রানা। 'মেয়েটা ধরা পড়লেও কুরিয়ার নিরাপদ থাকছে। সরবরাহকারীর কাছে সে নিজেই যেতে পারবে।'

একটু ভাবল ও। দেয়ালের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করল, কৌশলটার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু আছে কি না।

'বেশিরভাগ ঝুঁকিই কমিয়ে আনা হয়,' যোগ করল সোনিয়া। 'ড্রাগ আনা-নেয়ার প্রতিটা ধাপেই নিরাপত্তা বজায় রাখে ওরা... মানে, অমনটাই শুনেছি আমার সঙ্গের মেয়েদের মুখে।'

'ঝুঁকি কমিয়ে আনা হয়?' ভুরু কোঁচকাল রানা।

'হ্যাঁ। প্রতিটা ধাপেই ফেইল-সেফ সিস্টেম আছে... দরকার হলে মাল ফেলে দেয়া হবে, তাও আসল লোককে কিছুতেই ধরা পড়তে দেয়া হবে না। খুবই অর্গানাইজড ওরা।'

একটু চমকে উঠল রানা। ধরতে পেরেছে রহস্য। ঝুঁকি কম, লাভ বেশি! এটাই একটা প্যাটার্ন। এই কৌশলেই কাজ করে ফেনিস!

'সোনিয়া,' জিজ্ঞেস করল ও, 'এই কন্ট্যাক্টরা কোত্থেকে আসে?

কীভাবে ব্রিগেডের সঙ্গে যোগাযোগ করে ওরা?'

'তা আমার জানা নেই। তবে ড্রাগের ব্যবসা থেকে প্রচুর আয় করে ব্রিগেড। ওটাই ওদের আয়ের মূল উৎস। পুরো সংগঠন চলে ড্রাগ চোরাচালানের টাকা দিয়ে।'

'শুরুতে নিশ্চয়ই এমন ছিল না? কবে থেকে শুরু হয়েছে এসব, তা বলতে পারো?'

'কয়েক বছর আগে থেকে। ব্রিগেড যখন নতুন করে বিস্তার শুরু করল।'

'বিস্তারটা সম্ভবত ওই ড্রাগের টাকা থেকে হয়েছে। কিন্তু সেটার শুরুটা কীভাবে হয়েছে?'

'শোনা কথাই শুধু বলতে পারি তোমাকে। ইটালিয়ান জেলে বন্দি ছিল রেড ব্রিগেডের কিছু নেতা। তাদের সঙ্গে নাকি রহস্যময় এক লোক দেখা করে, প্রস্তাব দেয় ড্রাগের ব্যবসায় যোগ দেবার। যুক্তি দেখিয়েছিল, এতে ঝুঁকি কম... অন্তত কিডন্যাপিং আর চুরি-ডাকাতির চেয়ে কম তো বটেই। কিন্তু আয় অনেক।'

'সোজা কথায়,' বলল রানা, সশব্দে চিন্তা করছে, 'ওদেরকে সহজ কায়দায় বড় ধরনের ফাইনান্স করতে চেয়েছে সে। দু'চারজন মানুষকে কাজে লাগালেই চোরাই ড্রাগ থেকে লাখ লাখ লিরা কামাই করা সম্ভব। ঝুঁকি কম, লাভ বেশি। খুব বেশি লোকবলেরও প্রয়োজন নেই।'

'ঠিক ধরেছ,' সোনিয়া বলল। 'যতটুকু জানি, ড্রাগ জোগাড়ের সমস্ত কন্ট্যাক্ট ওই লোকের মাধ্যমেই আসে। ওর কারণেই কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা পাচ্ছে রেড ব্রিগেড।'

'আর সে-টাকায় নিজেদের আসল উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে পারছে ওরা,' চেহারায় কিছুটা রুক্ষতা ভর করল রানার। 'প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে ভেঙে দেয়ার আন্দোলন—সোজা কথায়

টেরোরিজম!' বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ও। 'ওই লোকটা... ব্রিগেডের নেতাদের সঙ্গে যে দেখা করেছিল... সে কি এখনও যোগাযোগ রাখছে?'

কাঁধ ঝাঁকাল সোনিয়া। 'এবারও শোনা কথাই বলতে হবে। মাত্র দু'বার তাকে সামনাসামনি দেখেছে নেতারা, এরপর থেকে পালাক্রমে তার প্রতিনিধিরা যোগাযোগ রাখছে। তারাও কিছুদিন পর পর বদলে যায়।'

'অবাক হচ্ছি না। অনুসরণ করবার মত নির্দিষ্ট কোনও সূত্র রাখা হচ্ছে না। এভাবেই কাজ করে ওরা।'

'কারা?'

'ফেনিস।'

বিস্মিত চোখে রানার দিকে তাকাল সোনিয়া। 'এ-কথা কেন বলছ?'

'কারণ এটাই একমাত্র ব্যাখ্যা। সত্যিকার নারকোটিক্স ডিলার-রা কখনও রেড ব্রিগেডের মত উন্মাদদের সঙ্গে নিজেকে জড়াবে না। পুরোটাই আসলে একটা কন্ট্রোলড্ সিচুয়েশন, টেরোরিজমকে ফাইনান্স করার জন্য এক উপলক্ষ্য মাত্র। ইটালিতে রেড ব্রিগেড, জার্মানিতে বাদের-মেইনহফ, মধ্যপ্রাচ্যে আল-কায়েদা... একেক জায়গায় একেক পদ্ধতিতে টাকা জোগানো হচ্ছে, গোপনভাবে। এরা নিজেরাও সম্ভবত জানে না, দুনিয়ায় অরাজকতা ছড়ানোর জন্য ফেনিস ওদেরকে দাবার গুটির মত ব্যবহার করছে। যত দিন যাচ্ছে, ততই শক্তিশালী হচ্ছে সন্ত্রাসবাদীরা; তত বেশি ক্ষয়ক্ষতি মুক্ত পৃথিবীর।'

রানার হাত আঁকড়ে ধরল সোনিয়া। 'মানে কী এর?'

'পরিকল্পনা অনুসারে এগোচ্ছে ফেনিস, সনাতন সমাজ-ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে শুরু করেছে ধাপে ধাপে। কীভাবে

সেটা করা হচ্ছে, তার একটা অংশ আমাকে দেখিয়ে দিয়েছ তুমি। বাকিটা আন্দাজ করতে কষ্ট হচ্ছে না। গেরিলা যুদ্ধের কৌশল নিয়েছে ওরা। পুরো পৃথিবীকে ভাগ করেছে ছোট ছোট যুদ্ধক্ষেত্রে, একটা করে অপরাধী-দল সেসব যুদ্ধক্ষেত্রকে ধ্বংস করছে চোরাগোপ্তা হামলার মাধ্যমে। অবিশ্বাস্য!'

'এ তো নতুন কিছু নয়,' বলল সোনিয়া। 'ইন্টেলিজেন্সের সঙ্গে জড়িত তুমি। দুনিয়াজুড়ে সন্ত্রাসের ব্যাপারে আগে থেকেই নিশ্চয়ই আইডিয়া আছে তোমার?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা, 'কিন্তু সেসব যে এক সুতোয় গাঁথা, তা জানা ছিল না। পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর, সোনিয়া। সাধারণ কোনও অপরাধীর মোকাবেলা করছি না আমরা। এরা বিবেকহীন... সুসংগঠিত। কাজে লাগাচ্ছে ফ্যানাটিক আর উন্মাদদেরকে। যুক্তি মানবে না ওরা, কোনও প্রলোভনে কাজ হবে না! উদ্দেশ্য সফল না হওয়া পর্যন্ত থামবেও না কিছুতেই!'

এটুকু বলে থেমে গেল রানা। অন্ধকারে আলোর রেখা দেখতে পেয়েছে, আস্তে আস্তে পরিষ্কার হয়ে আসছে ফেনিসের ষড়যন্ত্রের স্বরূপ। কেন একই সঙ্গে অপরাধী-চক্র এবং সরকারি লোকজনকে হাতে রাখছে ওরা, তা বুঝতে পেরেছে। সন্ত্রাসী আর অপরাধীদের মাধ্যমে অরাজকতা সৃষ্টি করা হবে, বিপদে ফেলা হবে বিভিন্ন দেশের সরকারকে। শাসনযন্ত্রের শীর্ষপদে থাকা রাষ্ট্রনায়করা যখন অসহায় হয়ে পড়বেন, যখন ক্ষমতার পালাবদলের জন্য মুখর হয়ে উঠবে জনতা... তখুনি ত্রাতা হিসেবে আবির্ভূত হবে ফেনিস কাউন্সিলের সদস্যরা। কাজটাতে তাদেরকে সাহায্য করবে সরকারি লোকেরাই। এভাবেই পৃথিবীর মালিক হবে তথাকথিত নীল রক্তধারী ফিনিক্স-রা—রাজনীতির লেবাস পরে!

সঙ্গিনীর দিকে ফিরল রানা। বলল, 'আমি মত পাল্টেছি,

সোনিয়া। তোমার সাহায্য চেয়েছিলাম আগে, কিন্তু এখন আর চাই না। অনেক ঝড়-ঝাপটা সয়েছ তুমি, এরপর তোমাকে আর বিপদের মাঝে টেনে আনা উচিত হবে না...'

'তা-ই?' একটা ভুরু একটু উঁচু করল সোনিয়া। 'ব্যাপারটা এত সহজ? চাইলে... আর বাদ দিয়ে দিলে?'

'কেন, তোমার পছন্দ হচ্ছে না সেটা?'

'তোমার মত মানুষ আমি আগে কখনও দেখিনি, রানা,' থমথমে গলায় বলল সোনিয়া। একটু যেন রেগে গেছে, দ্রুত ওঠানামা করছে চাদরে ঢাকা সুগঠিত বুক। 'মরা একটা মানুষের মাঝে প্রাণ ফিরিয়ে দিলে... তার বুকের ভিতর জাগিয়ে তুললে প্রতিশোধস্পৃহা; অথচ তারপরেই তাকে আবার বলছ সরে দাঁড়াতে!'

'তোমার মঙ্গলের জন্য বলছি...' বলার চেষ্টা করল রানা।

'মঙ্গল!' ওর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সোনিয়া। 'আবার গা-ঢাকা দিতে হবে আমাকে। ফিরে যেতে হবে আতঙ্কের সেই জীবনে, প্রতিমুহূর্তে আঁতকে উঠতে হবে... এই বুঝি আমার নাগাল পেয়ে গেল খুনিরা! একে তুমি মঙ্গল বলছ? গতকাল তুমিই আমাকে কথা দিয়েছিলে, এসবের ইতি ঘটাবে; আজ সে-কথা ফিরিয়ে নিচ্ছ?'

'না,' রানা বলল। 'তোমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা অবশ্যই করব আমি। টাকা-পয়সা, লুকানোর জায়গা... সবই ঠিক করে দেব। ব্রিগাতিস্তিরা কোনোদিনই আর খোঁজ পাবে না তোমার।'

'তারপরেও সেটাকে মুক্তি বলা চলে না, রানা। না... যাব না আমি! খেয়ালখুশিমত আমাকে তাড়িয়ে দিতে পারো না তুমি—নিজের সুবিধের জন্য, কিংবা আমাকে করুণা দেখানোর জন্য!' সোনিয়ার কর্সিকান চোখদুটো জ্বলছে। 'কী অধিকার আছে

তোমার? কোথায় ছিলে তুমি, যখন দিনের পর দিন অকথ্য অত্যাচার চালানো হয়েছিল আমার উপর? ওসব আমি সয়েছি, তুমি নও। কাজেই প্রতিশোধ নেয়ার অধিকার আছে আমার। কেউ তাতে বাধা দিতে পারবে না। যদি দিতেই চাও, আমাকে খুন করতে হবে তোমাকে; কারণ কিছুই আর ঠেকাতে পারবে না আমাকে।'

'এসব স্রেফ জেদের কথা, সোনিয়া,' বোঝানোর চেষ্টা করল রানা। 'বোকামি কোরো না, তুমি এখন মুক্ত। নিজেকে আবার জড়িয়ো না এসবের সঙ্গে।'

'বোকামি আমি করছি না, করছ তুমি! বহুদিন ছিলাম আমি ব্রিগেডের সঙ্গে, তোমাকে সাহায্য করবার মত যোগ্যতা আছে আমার। হতে পারো তুমি বিরাট কিছু, কিন্তু এদেশি সন্ত্রাসীরা কীভাবে কাজ করে, সে-ব্যাপারে আমার মত ইন-ডেপথ নলেজ তোমার নেই।'

'আমি সরাসরি ব্রিগেডের পিছনে লাগতে যাচ্ছি না, সোনিয়া। ওদের কাজের ধারা জানবার কোনও প্রয়োজন নেই আমার।'

'তবু আমি তোমার সঙ্গে থাকব। তার মূল্য চুকানোর জন্য যদি শরীর দিতে হয়, তাও দেব!'

থমকে গেল রানা। মেয়েটার কী মাথাই খারাপ হয়ে গেল? শান্ত গলায় ও জিজ্ঞেস করল, 'তুমি এত খেপেছ কেন, বলো তো?'

'তুমিই আমাকে খেপিয়েছ, রানা। ভীরুর মত বেঁচেছি আমি এতদিন, কিন্তু তুমি আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছ, এভাবে বাঁচা অর্থহীন। অত্যাচারিত যদি মুখ বুজে থাকে, তা হলে আরও শক্তিশালী হতে থাকে অত্যাচারীরা।'

'মনে হচ্ছে বড্ড ভুল করে ফেলেছি,' বিড়বিড় করল রানা।

'আরেকটা কারণ আছে,' না শোনার ভান করে বলে চলল সোনিয়া। 'আমাদের বিপ্লবকে তুমি ছোট করে দেখেছ, সেটাও

মেনে নেয়া যায় না। কমিউনিজমের আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত সবাই মন্দ মানুষ নয়, রানা। পৃথিবীকে বদলে দিয়ে সত্যিকার অর্থে একটা সুন্দর সমাজ গড়তে চায়, এমন আদর্শবাদীর অভাব নেই বিপ্লবীদের মাঝে। ওদেরকে ম্যানিপুলেট করছে একদল ক্ষমতাবান মানুষ, ঠেলে দিচ্ছে সন্ত্রাসের পথে, সারা দুনিয়ার সামনে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছে খুনি-উগ্রবাদী হিসেবে। তোমার ভাষায় ওরা ফেনিস কাউন্সিল, আর আমি বলব এটা পুঁজিবাদের আরেক শাখা ছাড়া আর কিছু নয়। সত্যিকার বিপ্লবী হিসেবে ওদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামার অধিকার আমার আছে!'

শান্তভাবে মেয়েটার মুখের ভাব যাচাই করল রানা, কোনও কৃত্রিমতা নেই তাতে। শব্দ করে শ্বাস ফেলে বলল, 'তোমরা সবাই একরকম! ভাষণ দেয়ায় ওস্তাদ!'

হাসল সোনিয়া, শুকনো হাসি। 'ভাষণ ছাড়া আর কোনও হাতিয়ার তো নেই আমাদের হাতে।' হাসিটা মুছে গেল, সেখানে ভর করল অদ্ভুত এক বেদনার ছাপ। 'একটা ব্যাপার লক্ষ করেছি আমি,' বলল ও।

'কী?'

'তোমাকে। অনেক দুঃখ জমা আছে তোমার ভিতরে, সেটা মুখ দেখলেই বোঝা যায়। কারণ কী? নিজের পেশা... জীবন... এসব নিয়ে কি সুখী নও তুমি?'

'এ-প্রশ্নের জবাব দেয়ার কোনও প্রয়োজন দেখছি না।'

'প্রয়োজন আছে, রানা। হয়তো তোমার জন্য নেই, কিন্তু আমার জন্য আছে।'

'কেন?'

'শুধু আমার প্রাণ বাঁচাওনি তুমি, বেঁচে থাকার লক্ষ্যও ফিরিয়ে দিয়েছ। বিশ্বাস করবে কি না জানি না, কিন্তু সুখ অনুভব করছি

আমি। জীবনটাকে আর মূল্যহীন বলে মনে হচ্ছে না। যে-মানুষ আমাকে এই অনুভূতি এনে দিল, তাকে আমি অসুখী দেখতে চাই না। আমারও একটা দায়িত্ব আছে তার প্রতি।'

'ভুলে যাও ওসব। কঠিন এই জীবন... কঠিন এ পেশা আমি স্বেচ্ছায় বেছে নিয়েছি। এর জন্য যত দুঃখ-কষ্ট আসুক, তার দায় আমার... শুধুই আমার।'

'কিন্তু আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই!'

'প্রেম দিয়ে? ভালবাসা দিয়ে? তার কোনও দরকার নেই, সোনিয়া। সাহায্য যদি করতেই চাও, তা হলে ফেনিসকে ঠেকানোর কাজে সাহায্য করো।'

'তারমানে আমাকে সঙ্গে রাখছ তুমি?'

হাসল রানা। 'উপায় কী? নিজেই তো বললে, প্রাণ থাকতে কিছুতেই পিছু হটবে না তুমি। তা ছাড়া... যে-কাজে নামছি, তাতে সঙ্গে একজন মেয়ে থাকলে মন্দ হয় না। জুটি হিসেবে কাভার মেইনটেন করা যাবে।'

খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল সোনিয়ার মুখ। 'এখন কি তা হলে প্ল্যানটা খুলে বলা যায় আমাকে? রোমে কেন এসেছ তুমি? কী কাজ এখানে?'

'কেন নয়?' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'বিয়াঞ্চি নামে একটা পরিবারকে খুঁজছি আমি।'

'দাদীর দেয়া তালিকায় পেয়েছ এই নাম?'

'হুঁ। প্রথমটাই। সে-আমলে রোমে ছিল পরিবারটা।'

'এখনও আছে,' বলল সোনিয়া, 'ঠিক রোমে নয়, তবে রোমের খুব কাছে থাকে ওই পরিবারের অন্তত একটা অংশ।'

বিস্মিত হলো রানা। 'তুমি কী করে জানো?'

'রেড ব্রিগেডের কল্যাণে। বিয়াঞ্চি-পাভারোনি পরিবারের

একটা ছেলেকে কিডন্যাপ করেছিল ওরা তিভোলির এক এস্টেট থেকে। ওর তর্জনী কেটে পাঠানো হয়েছিল মুক্তিপণের দাবির সঙ্গে। এই তো... খুব বেশি হলে বছরদুয়েক আগেকার কথা।'

আবছা আবছা মনে পড়ল রানার—পেপারে পড়েছিল এই ঘটনা। ইটালির এক ধনী পরিবারের ছেলেকে অপহরণ করেছিল দুষ্কৃতকারীরা, তবে শেষ পর্যন্ত মুক্তিপণ দেয়া হয়নি। টাকাপয়সা ছাড়াই তাকে ছেড়ে দিয়েছিল কিডন্যাপাররা। ব্যাপারটা বেশ রহস্যময় মনে হয়েছিল বলে এখনও ভুলে যায়নি। এরপর বেশ কিছুদিনের জন্য খুনখারাপি বেড়ে গিয়েছিল ইটালির আণ্ডারওয়ার্ল্ডে। বেশ কিছু ব্রিগাতিস্তি মারা পড়েছিল চোরাগোপ্তা হামলায়, সেই রহস্য ভেদ করতে সক্ষম হয়নি পুলিশ। তবে কি প্রতিশোধ নিয়েছিল ফেনিস? কাউন্সিল-সদস্যের আত্মীয়কে অপহরণ করায় খুন করেছিল ব্রিগেডের সদস্যদেরকে?

যত ভাবল, ততই বদ্ধমূল হলো ধারণাটা। হ্যাঁ, রেড ব্রিগেডের কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল ফেনিসের সঙ্গে। তার মূল্যও চুকাতে হয়েছে চরমভাবে। ওদেরকে কঠিন শিক্ষা দেয়া হয়েছে!

সোনিয়ার দিকে চোখ ফেরাল রানা। 'ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিলে তুমি?'

'উঁহুঁ, আমি তখন মেডিসিনার ক্যাম্পে ছিলাম।'

'আসলে কী ঘটেছিল, সে-ব্যাপারে কিছু শোনোনি?'

'কানাঘুষো ছাড়া আর কিছু না। সবাই বলাবলি করছিল, ব্রিগেডের ভিতরে বেঈমানী করেছে কারা যেন। খুব শীঘ্রি তাদেরকে কঠিন সাজা দেয়া হবে, যাতে ভবিষ্যতে অমন দুঃসাহস না দেখায় কেউ। বিয়াঞ্চি-পাভারোনি কিডন্যাপিং নিয়ে খুব বিচলিত মনে হয়েছিল ওখানকার নেতাদেরকে। ওদেরকে বলতে শুনেছি, কাজটা নাকি আসলে ফ্যাসিস্টদের মদদে ঘটেছে।'

'ফ্যাসিস্ট মানে?'

'পুরনো এক ব্যাংকার... এককালে বিয়াঞ্চিদের হয়ে কাজ করত। লোকটা সম্ভবত জার্মান।'

'ব্রিগেডের নাগাল পেল কীভাবে?'

'টাকা থাকলে সবই সম্ভব।'

উঠে পড়ল রানা। বলল, 'যত শীঘ্রি সম্ভব, কাজে নামতে হবে আমাদেরকে। তুমি কি এখন যেতে পারবে আমার সঙ্গে?'

'নিশ্চয়ই,' বলে বিছানা থেকে পা নামাল সোনিয়া। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। তাড়াতাড়ি ওকে ধরে ফেলল রানা। সময় দিল ব্যথাটা সয়ে নেবার জন্য। 'ধন্যবাদ,' মৃদু কণ্ঠে বলল মেয়েটা।

ওকে আস্তে আস্তে দাঁড় করাল রানা। উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'অসুবিধে হচ্ছে না তো? আরেকটু বিশ্রাম নেবে?'

জবাব না দিয়ে হাসল সোনিয়া। 'অত দুশ্চিন্তা না করলেও চলবে। তোমার বন্ধুর কথা ভাবো। আমাকে কাজে লাগাতে চাইছ, সেটা ও কীভাবে নেবে?'

'ভালভাবেই নেবে। বিশেষ করে তোমার কাছ থেকে যা যা জানতে পেরেছি, সেগুলো যখন শুনবে। এর মধ্যে হেলসিঙ্কিতে পৌঁছে যাবার কথা কুয়াশার। খুব শীঘ্রি ওর সঙ্গে কথা বলব আমি। এখন এসো, আমি তোমাকে পোশাক পরতে সাহায্য করছি।'

'গতকাল যদি এ-কথা বলতে, কিছুতেই রাজি হতাম না আমি।'

'আর এখন?'

'হেল্প মি, রানা।'

(আগামী খণ্ডে সমাপ্য)